বাংলা ছন্দের মূলসূত্র

কলিকাতা আশুতোষ কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, পি-আর্‌-এস্‌

প্রণীত

পরিবর্দ্ধিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৪০

সূচীপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বর্ত্তমান সংস্করণে অনেকগুলি নূতন অধ্যায়ের যোজনা করা হইয়াছে, এবং স্থলে স্থলে কিছু কিছু পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। ইহাতে আমার বক্তব্যের মর্ম্মগ্রহণ করার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা ছন্দ এবং আমার মতবাদ লইয়া অনেক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক সেই আলোচনার ফলে আমার মূল সিদ্ধান্তগুলির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস। অনেক পাঠ্যপুস্তকেই আমার মতবাদ ও সূত্রাদি গ্রহণ করা হইয়াছে। যে সমস্ত সমালোচক আমার গ্রন্থের দোষ ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ, তাঁহাদের সমালোচনার সহায়তা পাইয়া আমি অনেক স্থলে সংশোধনের নির্দ্দেশ পাইয়াছি।

বাধ্য হইয়া অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। ছেদ ও যতি, হ্রস্ব ও লঘু, দীর্ঘ ও গুরু—এই কয়টী শব্দ আমি প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করি নাই, একটু বিশিষ্ট ও সূক্ষ্মতর অর্থে তাহাদের প্রয়োগ করিয়াছি।

এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানা সাময়িক পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাকারে রচিত হওয়ায় স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। আশা করি তজ্জন্য পাঠকবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

যাহারা বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল পোষণ করেন, তাহারা এই গ্রন্থের সহিত মৎপ্রণীত Studies in Rabindranath's Prosody (Journal of the Deptt. of Letters, Cal. Univ. Vol. XXXI) এবং Studies in the Rhythm of Bengali Prose and Prose-verse (Journal of the Deptt. of Letters, Cal. Univ. Vol. XXXII) পাঠ করিতে পারেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই সংস্করণ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি একান্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ পোষ্ট্-গ্রাজুয়েট বিভাগের অধিনায়ক ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলর্ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয় ব্যক্তিগত ভাবে এই

বিষয়ে যেরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট একান্ত ঋণী। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যত্ন ও সহায়তা ব্যতিরেকে এই গ্রন্থের না ও প্রকাশ সম্ভব হইত না, তাঁহার নিকট আমি অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি।

এই সংস্করণ প্রকাশের জন্য অন্যান্য যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীবিভাস রায় চৌধুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ও নানা উপদেশ দিয়া বিশেষরূপে আমার সহায়তা করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কলিকাতা
১৩৪৬

বিনীত
গ্রন্থকার

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে কোন প্রণালীবদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। প্রাচীন ধরণের বাংলা ব্যাকরণের শেষে ছন্দ সম্বন্ধে একটা প্রকরণ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কয়েকটি প্রচলিত ছন্দের নাম ও উদাহরণ ছাড়া বেশী কিছু থাকে না। বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বা তাহার মূল তথ্য সম্বন্ধে কোনরূপ পরিচয় তাহাতে পাওয়া যায় না। সম্প্রতি বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারাও ছন্দ লইয়া তেমন উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা প্রকাশ করেন নাই। সাময়িক পত্রিকায় বাংলা ছন্দ সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্তু কয়েকটি ছাড়া আর প্রায় সবগুলিই নিতান্ত নগণ্য ও ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের নানা সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি প্রণালীবদ্ধভাবে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় অগ্রসর হন নাই। স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি প্রবন্ধে এতৎসম্পর্কে অনেক চিন্তনীয় তথ্যের নির্দ্দেশ আছে, কিন্তু তাহাও ঠিক উপযুক্ত ও সর্ব্বাংশে সূক্ষ্ম আলোচনা নহে। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন কয়েকটি প্রবন্ধে ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি লেখকগণের মতানুযায়ী কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বাংলা ছন্দের বিভাগ করিয়া তাহাদের লক্ষণ নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মত ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিলে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

* * * * *

উপযুক্ত নীতিতে বাংলা ছন্দের আলোচনা করিতে গেলে বাংলা কবিতার প্রাচীন ও নবীন সর্ব্বপ্রকার দৃষ্টান্ত ও প্রাগ্‌-বঙ্গীয় বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় কাব্য ছন্দের রীতি আলোচনা করা আবশ্যক। কিরূপে বাংলা ছন্দের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ হইল, ভারতীয় অন্যান্য ভাষার ছন্দের সহিত বাংলা ছন্দের কি সম্পর্ক, বাংলা ছন্দের ইতিহাসের মধ্যে যোগসূত্র কি—ইত্যাদি তথ্যের আলোচনাও অত্যাবশ্যক। তজ্জন্য বাংলার ভাষাতত্ত্ব, বাঙালীর ইতিহাস, বাঙ্গালীর দৈহিক ও মানসিক বিশেষত্ব ইত্যাদির চর্চ্চা আবশ্যক। ছন্দোবিজ্ঞান,

ভাষাবিজ্ঞান ও সঙ্গীতের মূল তথ্যগুলি জানা চাই। বাংলা ছাড়া অপর দুই একটি ভাষায় কাব্য ও ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় থাকা চাই। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ছন্দোবোধের সূক্ষ্মতাও আবশ্যক। এই ভাবে আলোচনা করিলে তবে বাংলা ছন্দের যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়িবে এবং বাংলা ছন্দের প্রকৃতি ও শক্তি সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট হইবে। নতুবা, বাংলা ছন্দের মূল প্রকৃতি কি, প্রচলিত বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে মূলীভূত ঐক্য কোথায়, তাহাদের শ্রেণী-বিভাগ ও জাতিবিচার কি ভাবে করা যাইতে পারে, বিদেশী ছন্দের অনুকরণ বাংলায় সম্ভব কি না—ইত্যাদি প্রশ্নের যথার্থ সমাধান পাওয়া যাইবে না।

* * * *

যে কয়েকটি সূত্রে এখানে বাংলা ছন্দের বিশিষ্ট রীতি নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সমস্ত বাংলা কবিতাতেই খাটে। এতদ্দ্বারা সমগ্র বাংলা কাব্যের ছন্দের একটি ঐক্যসূত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ সূত্রগুলি বাংলা ভাষার প্রকৃতি, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে, ভারতীয় সঙ্গীতের ন্যায় বাংলা প্রভৃতি ভাষায় ছন্দের ভিত্তি Bar ও Beat, এই জন্য এই সূত্র পরম্পরাকে সংক্ষেপে the Beat and Bar Theory বা 'পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদ' বলা যাইতে পারে।

* * * * *

বিজ্ঞানসম্মত, প্রণালীবদ্ধভাবে বাংলা ছন্দের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার বোধ হয় এই প্রথম প্রয়াস। আশা করি, সুধীবৃন্দ ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

কারমাইকেল কলেজ,
রঙ্গপুর
২০ শ্রাবণ, ১৩৩৯

বিনীত
গ্রন্থকার

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র

উপক্রমণিকা *

আজ প্রায় হাজার বছর ধ'রে বাংলা কাব্য রচনা চলে আসছে, কিন্তু বাংলা ছন্দের উপযুক্ত আলোচনা আগে তেমন হয় নি। অবশ্য এই হাজার বছরের মধ্যে বাংলা উচ্চারণের ধারাও অনেকটা বদলেছে, শব্দের রূপ-ও কতকটা বদল হয়েছে। প্রথম কয়েক শতাব্দী ধরে এই পরিবর্ত্তনটা চলতে থাকে, তারপর ভারতচন্দ্রের সময় বা তার কিছু আগে থেকে মনে হয় যে বাংলা উচ্চারণের একটা নিজস্ব রীতি দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলা ভাষা ও কাব্য পণ্ডিতমহলে আগে অনাদৃত-ই ছিল, কাজেই এর ছন্দের মূল তাৎপর্য্য কি তা' নিয়ে তখনকার সুধীমহলে কেউ মাথা ঘামান নি। অবশ্য জনসাধারণের এবং কাব্যরচয়িতাদের একটা স্বাভাবিক ছন্দোবোধ ছিল, নইলে কাব্যরচনাই সম্ভব হ'ত না, কিন্তু এই বোধ-কে স্পষ্ট একটা ব্যাকরণের রূপ দিতে কেউ চেষ্টা করেন নি। ছন্দরচনার জন্য তারিফ্ অবশ্য কেউ কেউ পেতেন, কিন্তু তাঁদের কৌশলের কি তাৎপর্য্য সে বিষয়ে কেউ কিছু ব্যাখ্যার প্রয়াস কর্ত্তেন না।

কালক্রমে যখন বাংলা ছন্দের পরিচয় দেবার চেষ্টা পণ্ডিতেরা কর্লেন, তখন তাঁরা প্রচলিত বাংলা কাব্যের একটা বাহ্য লক্ষণ দেখে স্থির কর্লেন যে, প্রতি চরণের হরফের সংখ্যাই হ'ল বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়। তাঁরা অবশ্য অক্ষর কথাটাই ব্যবহার কর্ত্তেন, কিন্তু অক্ষর ব'ল্তে লেখার এক একটি হরফ্ ধর্ত্তেন। সংস্কৃতে অক্ষর মানে syllable, কিন্তু সংস্কৃতে সন্ধি চল্‌তি থাকায় সংস্কৃতে শ্লোকের হরফ আর syllableর সংখ্যা একই সাধারণতঃ হয়ে দাঁড়াত। কাজে

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গসাহিত্যসমিতির অধিবেশনে ৬ই ফাল্গুন ১৩৪৪ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা (ঈষৎ পরিবর্ত্তিত)

কাজেই হরফ্ আর অক্ষর একার্থক ব'লে ধরে নেওয়াটা বিস্ময়কর নয়। তা ছাড়া তখনকার দিনে যে রকম ঢঙে বাংলা ছন্দ রচনা হ'ত, তাতে হরফের সংখ্যা আর মাত্রা-সংখ্যা একই হ'য়ে দাঁড়াত। কাজেই হরফ্ বা তথাকথিত 'অক্ষর' গুণে গুণে বাংলায় ছন্দ রচনা হয়, এই ভ্রান্ত ধারণা খুব চলিত হয়ে গেল। এ ধারণাটা এখনও একেবারে যায় নি, এখনও অনেক বাংলা কবিতাতে হরফ্ গুণেই মাত্রার হিসাব মোটামুটি করা যায়, যদিও তাতে মাঝে মাঝে হিসাবের গোলমাল দেখা যেতে পারে। কিন্তু একটা লেখার কৌশলের উপর ছন্দের ভিত্তি হ'তেই পারে না, ধারণাটা একেবারে অমূলক। ছন্দের তত্ত্ব খুঁজতে হবে অন্যত্র।

এর পর নানা ধরনের বাংলা কবিতা যখন রচনা হ'তে লাগ্‌ল, তখন স্পষ্ট বোঝা গেল যে সব জায়গাতে অক্ষর গুণে ছন্দ বিচার করা যায় না। তখন অনেকে বল্‌তে লাগ্‌লেন যে বাংলায় নানাজাতীয় ছন্দ আছে। প্রত্যেক ছন্দেই হিসাবের রীতি ভিন্ন। কোন কবিতায় হরফ্, কোন কবিতায় স্বর, কোন কবিতায় বা একটা নিজস্ব বাংলা রীতিতে মাত্রা গুণে ছন্দের হিসাব কর্ত্তে হয়। কিন্তু এতে-ও নানা গণ্ডগোল আছে। অনেক কবিতার মধ্যে দেখা যায় যে খানিকটা এক জাতির, খানিকটা অন্য জাতির লক্ষণ রয়েছে, দো-আঁশলা তে-আঁশলা ছন্দ ঢের রয়েছে। জায়গায় জায়গায় আবার দেখা যায় যে কোন জাতির লক্ষণই ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না। তা' ছাড়া, বাংলার যেটা সব চেয়ে প্রধান ছন্দ তার কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা হচ্ছে না, সেই হরফ্‌কেই বাহন স্বীকার কর্ত্তে হয়। তা' ছাড়া কি সূত্র ধ'রে কবিতার জাতিবিভাগ হবে, কেন স্থানে স্থানে নিয়ম লঙ্ঘন করেও ছন্দ বেশ বজায় থাক্‌ছে, তারও কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মোটের উপর, এই রকম জাতি-বিচার একটা হাতগড়া বিভাগ মাত্র; বাংলা ছন্দের মূল তত্ত্বের বিশেষ কোন পরিচয় এতে পাওয়া যায় না।

পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গবাদ (The Beat and Bar Theory) নাম দিয়ে আমি বাংলা ছন্দঃশাস্ত্র যে ভাবে প্রণয়ন করার চেষ্টা করেছি, তাতে এই সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়েছে বলে দাবি করা যায়। তা' ছাড়া এই মতবাদ সম্পূর্ণ ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত, এবং যে ছন্দোবোধ আমাদের সঙ্গীত ও কাব্য উভয়েরই মূলীভূত, তারই উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

কয়েকটী পারিভাষিক শব্দ

আমার প্রধান অসুবিধা হয়েছে পরিভাষা নিয়ে। আমি যে ভাবে ছন্দোবিচার করেছি তাতে প্রাচীন ছন্দঃশাস্ত্রের ব্যবহৃত পরিভাষা যথেষ্ট নয়, আমার বিচারপদ্ধতি আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের অনুযায়ী। কিন্তু এ বিষয়ে উপযুক্ত শব্দ ও পরিভাষা বাংলায় তেমন চল্‌তি নেই, কারণ বাংলা ভাষার সাহায্যে এর তেমন চর্চ্চা পূর্ব্বে হয় নি। নূতন পরিভাষা তৈরি করার সময় আমি স্বভাবতঃ সংস্কৃত থেকেই শব্দ নেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে সমস্ত শব্দ অনেক সময় অপ্রচলিত, কিম্বা বিকৃত অর্থে চলিত। কিন্তু একেবারে হতাশ হয়ে বাংলায় ছন্দোবিজ্ঞানের বই লেখার প্রয়াস বাদ না দিয়ে, আমি আমার বিচারমত উপযুক্ত শব্দ নির্ব্বাচন ক'রে তাকে বাংলায় চালাবার দুঃসাহস করেছি এই ভরসায়, যে কালক্রমে তা' বাংলায় চলে যাবে। প্রথম যখন আমরা জ্যামিতি পড়ি তখন বিষম কোণ ও সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ প্রভৃতি কথা নিরর্থক ও কটমট মনে হয়; কিন্তু পরে যখন ঐ শাস্ত্রের নিত্য আলোচনা ও চর্চ্চায় আমরা অভ্যস্ত হই, তখন আর সে সব কথা কানকে বা মনকে পীড়া দেয় না। পারিভাষিক শব্দগুলি ব্যবহারের পূর্ব্বে আমি কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমোদন নিয়েছিলেম, কাজেই আমার ভরসা হয়েছিল যে ঐ পারিভাষিক শব্দগুলির ব্যবহার বিদ্বন্মণ্ডলীর কাছেও অনুমোদন লাভ কর্ব্বে।

গোল বাধে অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দের যথার্থ তাৎপর্য্য নিয়ে। প্রথম, ছন্দ। ছন্দ মানে কখনও কখনও rhythm; যেমন "ছন্দে উঠিছে তারকা, ছন্দে কনক রবি উদিছে, ছন্দে জগন্মণ্ডল চলিছে" (বাল্মীকি-প্রতিভা); কখনও metre, যেমন 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' 'বাংলায় ইংরেজী ছন্দ'; কখন, শুধু একটা ঢঙ্ বা ভঙ্গী (style), যেমন তথাকথিত স্বরবৃত্ত বা স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ; কখনও বা, কোন বিশিষ্ট সূত্র অনুসারে চরণ গঠনের রীতি, যেমন 'পয়ার ছন্দ' বা 'ত্রিপদী ছন্দ'। এই এক একটি প্রত্যয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ থাকলে বোধ হয় ভাল হ'ত, কিন্তু ছন্দ আর ছন্দোবন্ধ ভিন্ন আর কোন শব্দের ব্যবহার নেই। তবে ব্যবহারের সময় প্রসঙ্গের দিকে একটু নজর রাখলেই ঠিক কি অর্থে 'ছন্দ' কথাটা ব্যবহার হয়েছে তা' বোধ হয় ধরা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, অক্ষর। এই কথাটাকে আমি সর্ব্বত্র Syllable অর্থেই ব্যবহার করেছি এবং সংস্কৃতে syllableর প্রতিশব্দই 'অক্ষর'। ক্রমশঃ একটু বোঝার গোলমালের জন্য বাংলায় শুধু হরফ্ অর্থে অক্ষর কথাটার ব্যবহার চলে গেছে (যেমন, 'অক্ষর-পরিচয়')। অক্ষর বল্‌লে বুঝতে হবে বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উৎপন্ন ধ্বনি ; এতে মাত্র একটি স্বরধ্বনি থাক্‌বে, ব্যঞ্জনবর্ণ এর সঙ্গে জড়িত থেকে অবশ্য সেই স্বরধ্বনিকে রূপায়িত কর্ত্তে পারে। এইজন্য 'অক্ষরবৃত্ত প্রভৃতি কথার ব্যবহারে আমার আপত্তি আছে। তথাকথিত অক্ষর বা হরফ্ একটা লেখার কৌশল মাত্র, তার সঙ্গে ধ্বনির, সুতরাং ছন্দের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। সুবিধামত আর কি শব্দ হয় জানি না। 'ধ্বনি' নিশ্চয়ই ঠিক্ নয়। 'শব্দ-পাপ্‌ড়ি' একটা উৎপ্রেক্ষা মাত্র ; ইহা অচলিত, এবং ব্যাকরণের অসম্মত। যোগ্য শব্দ থাকতে অযোগ্য শব্দের দরকার কি ?

তৃতীয়তঃ, মাত্রা। মাত্রা মানে আমি ধরেছি quantity, যার হিসাবে অক্ষর হ্রস্ব, দীর্ঘ বা প্লুত—এক মাত্রার, দুই মাত্রার, বা তিন মাত্রার বলে ধরা হয়। ব্যুৎপত্তি হিসাবে এই অর্থই বোধ হয় ঠিক, 'যেন মীয়তে ইতি মাত্রা'। 'মাত্রা' শব্দের ধাতু 'মা' মানে 'মাপা', তাই থেকে 'মান', 'পরিমাণ', 'পরিমিত'। কিন্তু সংস্কৃত উচ্চারণ ও বাংলা উচ্চারণ এক নয়, সংস্কৃত ও বাংলায় মাত্রা-বিচারের পদ্ধতি-ও এক নয়, এটা মনে রাখা উচিত। কেউ কেউ এর বদলে ব্যষ্টি (unit) কথাটি ব্যবহার কর্ত্তে চান। কিন্তু তার কোন দরকার নেই। মাত্রা কথাটি সুপরিচিত ও চলিত। সংস্কৃতে 'মাত্রাসমকানি' বলে যে শ্রেণীর ছন্দের কথা বলা হয়েছে, বাংলা ছন্দ বাস্তবিকই সেই জাতীয়, এবং বাংলা ছন্দগুলি সেই সমস্ত ছন্দ হতেই উৎপন্ন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। 'মাত্রা' বল্‌তে আসলে সংস্কৃতে যে প্রত্যয়টি নির্দ্দেশ হয়েছে, ঠিক্ সেই প্রত্যয় নিয়েই আমি বাংলায় 'মাত্রা' পদটি ব্যবহার করেছি। এইজন্য 'মাত্রাবৃত্ত' শব্দ দিয়ে কোন একটা বিশেষ ঢঙের ছন্দোবন্ধকে নির্দ্দেশ করার আমি অপক্ষপাতী। আমার মতে বাংলা ছন্দ সর্ব্বদাই মাত্রাসমকত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সমস্ত বাংলা ছন্দই মাত্রাবৃত্ত। যদি 'মাত্রা' মানে সংস্কৃত বিচারানুযায়ী মাত্রা ধরা হয়, তা' হ'লে তথাকথিত মাত্রাবৃত্ত-ও 'মাত্রা'র উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কারণ সংস্কৃতে যা দীর্ঘ স্বর তা' বাংলা তথাকথিত মাত্রাবৃত্তে দীর্ঘ নয়। কিন্তু তা' যে দীর্ঘ হয় না, এমন কথাও নেই। আসলে

এ সব বিষয়ে বাংলার একটা স্বতন্ত্র রীতি আছে। তার কথা পরে বল্‌ব। সুতরাং ঠিক সংস্কৃত হিসাবে মাত্রার ব্যবহার বাংলায় বাস্তবিক কোথাও নেই।

ছেদ ও যতি—এই যে দুটি কথা আমি ব্যবহার করেছি সে সম্বন্ধেও পার্থক্যটা ঠিক্ অনুধাবন করা সহসা একটু শক্ত হ'তে পারে। এ বিষয়ে আমি বোধ হয় সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রের রচয়িতাদের একটু অতিক্রম করে যেতে বাধ্য হয়েছি। আমি বলেছি যে যতি মানে হ'ল এক এক বারের impulse, প্রয়াস বা ঝোঁকের পর জিহ্বার যেটা বিরামস্থল; আর ছেদ মানে হল উচ্চারণের সাময়িক স্তব্ধতা, শ্বাসযন্ত্র থেকে ধ্বনি উৎপাদনের বিরতি। "যতিজিহ্বেষ্টবিরামস্থানং" ও "যতিবিচ্ছেদঃ" এই দুই সংজ্ঞাই সংস্কৃতের ছন্দোগ্রন্থে পাওয়া যায়। মনে হয় যতি ও ছেদ, উভয়কে তাঁরা অভিন্ন মনে কর্ত্তেন। কিন্তু বাংলা ছন্দ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতের অনুসারী নয়। সংস্কৃত ছন্দের সমস্ত লক্ষণ ও গুণ যেমন বাংলায় আনা সম্ভব নয়, তেমনি আবার বাংলা ছন্দের এমন কতকগুলি ধর্ম্ম ও বিশেষত্ব আছে যার জন্য তার শক্তি সংস্কৃতের চেয়ে বেশী। যে ধরণের blank verse কবি Milton লিখে গেছেন, তার অনুকরণ বাংলায় সম্ভব হয়েছে, কিন্তু সংস্কৃতে সম্ভব হ'ত বলে আমার মনে হয় না। তার প্রধান কারণ মনে হয় এই যে, বাংলায় যে ভাবে ছেদ ও যতি পরস্পর থেকে বিযুক্ত হতে পারে, সংস্কৃতে তা' হয় না। সংস্কৃতে ছন্দের প্রতি পদে পদে একটা বৈচিত্র্য আছে, তার কারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের নানা জটিল সমাবেশ। এই ধ্বনিতরঙ্গকে ছন্দের বাঁধন বা ঐক্যের মধ্যে আন্‌তে গেলে ছন্দের বৃহত্তর বিভাগ অর্থাৎ পদ বা চরণের গঠন ইত্যাদির মধ্যে আর নতুন করে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব নয়, কর্ত্তে গেলে ছন্দের ভরাডুবি হবে। ছন্দের মূল কথা হচ্ছে ঐক্য ও বৈচিত্র্যের সমাবেশ, বৈচিত্র্যকে ঐক্যের সূত্রে বেঁধে আনা। যা হোক্, এই সমস্ত কারণে বোধ হয় কোন কালেই সংস্কৃতে "বিচ্ছেদ" এবং "জিহ্বেষ্টবিরামস্থানং" যে পরস্পর সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে পড়তে পারে তা' ঠিক স্বীকৃত হয় নি। কিন্তু মধুসূদনের প্রতিভা বাংলা ছন্দের ইতিহাসে একটা যুগান্তর আন্‌ল, দেখিয়ে দিল যে, বাংলা ছন্দের ধ্বনি প্রবাহের মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য আনার সুবিধা না থাকলেও, এই ছেদ আর যতির বিচ্ছেদ করে কি ভাবে মহিমময় ছন্দ-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হ'তে পারে।

ঐক্যের সূত্রের সঙ্গে বৈচিত্র্যের সূত্র দিয়ে যে অপরূপ ধূপছায়া রঙের ছন্দ মধুসূদনের কাব্যে সৃষ্টি হয়েছে, বাংলা ছন্দের ইতিহাসে তার গৌরব চিরদিন থাক্‌বে।

এই যতির কথাটা ঠিক বুঝ্‌তে পার্লেই বাংলা ছন্দের যেটা মূল উপকরণ অর্থাৎ পর্ব্ব সেটাকে বুঝ্‌তে দেরি হবে না।

পর্ব্ব কথাটা সংস্কৃত পর্ব্বন্‌ থেকে নেওয়া। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে অবশ্য এ কথাটার বিশেষ চলন নেই, কারণ সংস্কৃত ছন্দের মূল তত্ত্বটা ও তার ভিত্তিস্থানীয় তথ্য ও উচ্চারণ-পদ্ধতি ঠিক বাংলার অনুরূপ নয়। কিন্তু আমার আগে থেকেই বাংলায় ছন্দোবিৎগণ এ কথাটা চালিয়েছেন, এবং এটা বেশ উপযুক্ত বলেই মনে হয়।

এক যতি থেকে আর এক যতি পর্য্যন্ত যে অংশ, তাকেই বলা হয় পর্ব্ব। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত জিহ্বার এক এক বারের পূর্ণ প্রয়াসের শেষ না হয়, একটা impulse বা ঝোঁকের পরিসমাপ্তি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একই পর্ব্ব চল্‌বে। এই পর্ব্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ। পর্ব্বের মধ্যে মধ্যে ছেদ থাক্‌তে পারে, কিন্তু তাতে পর্ব্বের সমাস ক্ষুণ্ণ হয় না।

ফুলের মালা বা তোড়া আমরা নানা ভাবে, নানা কায়দায়, নানা pattern বা নক্সা ধ'রে তৈরি করতে পারি, কিন্তু মূল উপকরণ হচ্ছে এক একটি ফুল, তারাই হ'ল আসল উপকরণ। তেমনি নানা কায়দায় নানা নক্সায়—আমরা পর্ব্বের সঙ্গে পর্ব্ব সাজিয়ে নানা বিচিত্র চরণ ও স্তবক বা কলি তৈরি করতে পারি, কিন্তু ইমারতের মধ্যে ইঁটের মতন উপকরণ হিসাবে রয়ে গেছে পর্ব্ব। অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে চরণের শেষ পর্ব্বটি অনেক সময় ছোট হয়। ছন্দের মূল ভিত্তি হচ্ছে একটা ঐক্য—সেই ঐক্যের পরিচয় আমরা পাই পর্ব্বের ব্যবহারে। যে কোন পদ্য রচনা পরীক্ষা কর্লেই দেখা যাবে যে, তাঁর ছন্দ দাঁড়িয়ে আছে বাস্তবিকভাবে নিয়মিতভাবে পর্ব্বের ব্যবহারের উপর। প্রায় স্থানেই দেখা যায় যে মাত্র কোন এক প্রকারের পর্ব্ব ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার কোন কোন স্থানে দেখা যায় অবশ্য যে একাধিক প্রকারের পর্ব্ব ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু তাদের সমাবেশ বা সংযোজন একটা সুস্পষ্ট নিয়ম অনুসারে চলেছে। যদি সেই সুস্পষ্ট নিয়মটা না থাকে, তা' হ'লে দেখা যায় যে পদ্য ছন্দের স্বরূপ আর রক্ষা করা যাচ্ছে না। জিনিষটায় হয়ত

একেবারে ছন্দের লক্ষণ নেই, কিম্বা অন্য কোন আদর্শের ছন্দ—যেমন—গদ্য-ছন্দের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। (এই ধরণের ছন্দ—যা পদ্যছন্দের সমধর্মী নয়—তার সম্বন্ধে কোন আলোচনা বিশেষ কেউ করেছেন বলে জানি না। Studies in the rhythm of Bengali prose and prose-verse ব'লে একটি প্রবন্ধে আমি সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি।)

এর পরে হল পর্ব্বাঙ্গের কথা। আমি যে ভাবে বাংলা ছন্দের বিচার করেছি, তাতে পর্ব্বাঙ্গের বিবেচনা বাংলা ছন্দ বোঝার পক্ষে একান্ত দরকার। এই বিবেচনার উপরই বাংলা ছন্দের মাত্রা পদ্ধতির স্বরূপ-বোধ সম্পূর্ণ নির্ভর কর্চ্ছে। আমার মনে হয় যে এই পর্ব্বাঙ্গের বিচার ও তার গুরুত্বের দিকে সকলে বিশেষ মনোযোগ দেন নি। পর্ব্বাঙ্গের অর্থ হচ্ছে পর্ব্বের উপাদানীভূত এক একটি অঙ্গ। যেমন 'একথা জানিতে তুমি' এই পর্ব্বটির মধ্যে আছে তিনটি অঙ্গ, 'একথা', 'জানিতে', 'তুমি', এবং এদের মাত্রা সংখ্যা বা, ছন্দের ভাষায়, দৈর্ঘ্য হচ্ছে যথাক্রমে ৩, ৩, ২। এর আগে পর্ব্বকে ফুলের মালার এক একটি ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছি। পর্ব্বাঙ্গ যেন ফুলের এক একটি পাপড়ি, বা দল। বোধ হয় পদার্থবিজ্ঞান থেকে একটা উপমা দিলে এর স্বরূপটা আরও ভাল ক'রে বোঝা যাবে। পর্ব্ব যদি ছন্দের অণু (molecule) হয়, তবে পর্ব্বাঙ্গ হচ্ছে ছন্দের পরমাণু বা atom. যেমন এক একটা অণুর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ওজনের পরমাণু বিভিন্ন সংখ্যায় থাকে এবং তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও অনুপাতের উপর সেই পদার্থের প্রকৃতি নির্ভর করে, সেই রকম এক একটা পর্ব্বের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের পর্ব্বাঙ্গ বিভিন্ন সংখ্যায় ও বিভিন্ন সমাবেশে থাকে, এবং তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও অনুপাতের উপর পর্ব্বের প্রকৃতি নির্ভর করে। 'একথা জানিতে তুমি' এই পর্ব্বটিতে ঠিক যে পারম্পর্য্যে পর্ব্বাঙ্গগুলি আছে তা' যদি একটু বদলে লিখি 'একথা তুমি জানিতে' তা' হ'লে সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দঃপতন হ'য়ে যাবে। তাদের মাত্রা ও সমাবেশের রীতির উপরই ছন্দের মূল লক্ষণটি নির্ভর কর্চ্ছে। আমি বিবেচনা করে দেখেছি যে প্রত্যেক পর্ব্বে হয় দুইটি, নয় তিনটি ক'রে পর্ব্বাঙ্গ থাকবে, নইলে পর্ব্বের ছন্দত্বই সম্ভব নয়। কিন্তু শুধু দুই আর তিন কেন? এ প্রশ্নটা অনেকের মনে আস্‌তে পারে। এর উত্তর দিতে গেলে বোধ হয় গণিতের দার্শনিক তত্ত্ব বা বিশ্বরহস্যের সঙ্কেত হিসাবে গণিতের মূল্য ইত্যাদি বড় বড় কথা তুলতে

হয়। আমাদের পক্ষে শুধু এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে গণিতে ২ আর ৩কে প্রাথমিক জোড় ও বিজোড় সংখ্যা বলা হয় এবং তাদের থেকেই যে সমস্ত সংখ্যার উৎপত্তি তা' স্বীকার করা হয়। এই ধরণের কোন গভীর দার্শনিক তত্ত্ব থেকে ছন্দোবিজ্ঞানে দুই আর তিনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা যায়। তারপরে আবার এই সমস্ত পর্ব্বাঙ্গগুলিকে পর্ব্বের মধ্যে সাজাবার একটা কায়দা আছে, যা হোক্ করে এলোমেলো ভাবে বসালেই হয় না। নিয়ম হচ্ছে যে, **হয়, পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গগুলি পরস্পর সমান হবে, না হয়, তাদের সংখ্যার ক্রম অনুসারে অর্থাৎ ক্রমশঃ ছোট থেকে বড়, বা বড় থেকে ছোট, এই রকমভাবে সাজাতে হবে**। গণিতের ভাষায় বল্‌তে গেলে, পর্ব্বাঙ্গের পারম্পর্য্যের মধ্যে একটা সরল গতি থাকবে যাকে রৈখিক সমীকরণ (linear equation) দিয়ে প্রকাশ করা যায়। এইজন্যে ৩+৩+২ এ রকম সঙ্কেতে পর্ব্বাঙ্গ সাজিয়ে পর্ব্ব গঠন করা যায়। কিন্তু ৩+২+৩ এ সঙ্কেতে করা চল্‌বে না।

এই যে গতি বা স্পন্দন—এইখানেই পর্ব্বের প্রাণ, পর্ব্বের ছন্দত্ব। দুই পর্ব্বাঙ্গের মাঝে যতি থাকে না, তবে কখন কখন ছেদ থাকতে পারে; কিন্তু, পর্ব্বাঙ্গের বিভাগ বোঝা যায় স্বরের ওঠা নামা থেকে; প্রত্যেক পর্ব্বাঙ্গের গোড়ায় স্বরের গাম্ভীর্য্য একটু বেড়ে যায় এবং শেষে কমে যায়, আবার পরবর্ত্তী পর্ব্বাঙ্গের সূচনায় ফের বাড়ে। এই উত্থান পতনের জন্যই যে একটা ধ্বনি-তরঙ্গ বা স্পন্দন সৃষ্টি হয় সেইটেই ছন্দের আসল জিনিষ।

পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ ধর্‌তে অনেকে মাঝে মাঝে গোলমাল করেন। কয়েকটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখলে এ বিষয়ে ভুলের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, পর্ব্বাঙ্গ সাধারণতঃ এক একটা ছোট গোটা মূল শব্দ, পর্ব্বাঙ্গের মাত্রাসংখ্যা হয় ২, ৩ বা ৪, কখন ১; কিন্তু পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা বেশী—৪ থেকে ১০ পর্য্যন্ত দেখা যায়। পর্ব্বের বিশ্লেষণ করে দুটো বা তিনটে পর্ব্বাঙ্গ পাওয়া যাবেই, তার মধ্যে একটা গতির তরঙ্গ থাকে। পর্ব্বাঙ্গ কিন্তু ছন্দের ধ্বনির দিক্ দিয়ে একেবারে পরমাণুর মত, তার নিজের মধ্যে কোন তরঙ্গ নেই, কিন্তু তাকে অপরের পাশে বসালে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যাই সাধারণতঃ পদ্যছন্দের ঐক্যের বন্ধন, কিন্তু সমমাত্রিক দুই পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গের সংস্থান একরূপ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

বাংলা ছন্দের গোড়ার কথা

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা কর্‌লে Aristotleর মত বল্‌তে ইচ্ছে করে, 'All things are determined by numbers'—সবই সংখ্যার উপর নির্ভর করে। বাংলা ছন্দ আসলে quantitative বা মাত্রাগত, একমাত্রা বা দুই মাত্রার অক্ষরের সংযোগে গড়ে উঠ্‌ছে পর্ব্বাঙ্গ, তাই থেকে পর্ব্ব, পর্ব্ব থেকে চরণ, চরণ থেকে স্তবক। অক্ষরের আরও অনেক গুণ বা ধর্ম্ম আছে, যেমন accent বা ধ্বনি-গৌরব; সে সব বাংলা ছন্দে যে নেই তা' নয়, কিন্তু সেগুলো হলো গৌণ লক্ষণ মাত্র। Qualitative জাতীয় ছন্দ থেকে বাংলা ছন্দ ভিন্ন জাতীয়। তারপর এক মাত্রা ও দুই মাত্রার, হ্রস্ব ও দীর্ঘ দু'রকমের অক্ষরের বাংলা ছন্দে ব্যবহার থাকলেও, এদের ধ্বনিগত পার্থক্য বা পারম্পর্য্যের সঙ্গে বাংলা ছন্দের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। যেখানে একটা দীর্ঘ অক্ষর আছে সেখানে দুটো হ্রস্ব অক্ষর বসালে বাংলা ছন্দে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু সংস্কৃতে ছন্দঃ-পতন হবেই। **বাংলায় আসল কথা হ'ল—quantitative equivalence বা মাত্রাসমকত্ব। পর্ব্বে পর্ব্বে মাত্রা সমান রইল কিনা, পর্ব্বাঙ্গে ঠিক উচিত সংখ্যার মাত্রা ব্যবহার হল কিনা**—এইটিই হ'ল বাংলা ছন্দের বিচারের মুখ্য লক্ষ্য।

আর একটা প্রধান তত্ত্ব হচ্ছে—বাংলা উচ্চারণের, সুতরাং **বাংলা অক্ষরের মাত্রার স্থিতি-স্থাপকত্ব**। অন্যান্য অনেক ভাষায় উচ্চারণের রীতি বাঁধা আছে, অক্ষরের দৈর্ঘ্যও পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু বাংলায় একই অক্ষর স্থানবিশেষে কখন হ্রস্ব, কখন দীর্ঘ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এ যেন বাঙালী মেয়েদের চুলের মত, কখন আঁট করে খোপা বাঁধা থাকে আবার কখন এলায়িত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে। **এই হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব প্রধানতঃ নির্ভর করে ছন্দের একটা ছাঁচ, রূপকল্প, আদর্শ বা patternর উপর।** এই ছাঁচটা বুঝতে পার্লেই বাংলা ছন্দের যথাযথ উচ্চারণ কি হবে তা ধরা যায়। এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। প্রথম, **এক একটা গোটা মূল শব্দকে যতদূর সম্ভব না ভেঙেই পর্ব্বের বিভাগ কর্ত্তে হয়। পর্ব্বাঙ্গের বিভাগের সময়ও যতটা সম্ভব ঐ রকম করা দরকার।** দ্বিতীয়তঃ, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০ প্রভৃতি মাত্রার ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বের একটা ভিন্ন

ভিন্ন ছন্দোগুণ আছে। প্রত্যেকের মধ্যে আবার **পর্ব্বাঙ্গ সাজান-র একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। তার কিছুতেই ব্যত্যয় করা যায় না। সুতরাং যদি মূলীভূত পর্ব্বের সংখ্যাটি ধরা যায়, তবে সহজেই মাত্রা নির্ণয় করা যায়।** স্বরান্ত অক্ষর সাধারণতঃ হ্রস্ব, তবে কখন কখন ছন্দের খাতিরে দীর্ঘ হয়। তবে একই পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে এরকম খাতির দুবার চলে না। হলন্ত অক্ষর শব্দের অন্ত্য অক্ষর হ'লে দীর্ঘ, তবে প্রবল স্বরাঘাত পড়লে হ্রস্ব হয়; কিন্তু স্বরাঘাতও একই পর্ব্বাঙ্গে দু'বার পড়বে না। অন্যত্র, হলন্ত অক্ষর হ্রস্ব বলে ধরা হয়, তবে ইচ্ছামত দীর্ঘ কর্ত্তে আপত্তি নেই।—এই হ'ল মোটামুটি মাত্রা নির্ণয়ের কথা, তবে ছন্দের সৌষম্য (balance) রাখার জন্য আরও দু'একটি রীতি আছে, সে কথা পরে বলা হবে।

বাংলায় তিনটি এবং মাত্র তিনটি বিভিন্ন জাতীয় ছন্দ প্রচলিত আছে এবং প্রত্যেকের এক একটা বিভিন্ন মাত্রা নির্ণয়ের রীতি আছে, তা' আমি স্বীকার করি না। এ বিষয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি। তবে কবিতা বিশেষে স্বরাঘাতের বাহুল্য বা হলন্ত দীর্ঘ অক্ষরের বাহুল্য—ইত্যাদি কারণে এক একটা ঢঙ্ দেখা যেতে পারে; গানেও এরকম নানা ঢঙ্ আছে। এ রকম ঢঙ্ অন্ততঃ চার পাঁচ রকমের চল্‌তি আছে, কোন প্রতিভাবান্ কবি নূতন ঢঙের উদ্ভব কর্ত্তেও পারেন।

বাংলা ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলা ছন্দের যে কয়টি মূল লক্ষণের কথা বলা হ'ল সেগুলো বাংলা কাব্য-সাহিত্যের গোড়া থেকেই দেখা যায়। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে যে সমস্ত ছন্দ প্রচলিত ছিল, সেগুলো হ'ল মোটামুটি বৃত্ত জাতীয়। তাতে প্রত্যেক প্রকারের ছন্দোবন্ধের একটা শক্ত কাঠাম ছিল, একটা কঠোর নিয়ম অনুসারে সুনির্দ্দিষ্ট পারম্পর্য্য অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষর বসাতে হ'ত। মোট মাত্রাসংখ্যার জন্য কোন ভাবনা ছিল না, গানে যেমন সুরের পারম্পর্য্যটা মুখ্য সব বৃত্ত ছন্দেও তাই। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের শেষের যুগে ও অনেক প্রাকৃত ছন্দে দেখতে পাওয়া যায় যে অন্য রকমের একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সমস্ত পদকে কয়েকটি সমমাত্রিক ভাগে ফেলা যাচ্ছে, কখন বা একই রকমের

গণের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। আসল কথা, মাত্রা-সমকত্বের নীতি ভারতীয় ছন্দে প্রবেশ লাভ কর্চ্ছে। এই সময়েই গীতি আর্য্যা, জাতি ছন্দ, মাত্রাচ্ছন্দ প্রভৃতি শ্রেণীর ছন্দ পাওয়া যায়। কি করে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হ'ল তা' এখন বলা প্রায় অসম্ভব। তবে আমার কল্পনা এই যে, বৈদিক ছন্দের সঙ্গে আদিম ভারতীয় ছন্দের সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে এরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের শেষের যুগে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার বহু অনার্য্যসম্ভূত লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সব অনার্য্যদের বোধ হয় মজ্জাগত একটা প্রবৃত্তি ছিল—মাত্রাসমকত্বের দিকে। তাতেই বোধ হয় এই পরিবর্ত্তন। যাই হোক্, জয়দেবের লেখায় দেখি যে প্রাচীন বৃত্ত ছন্দের মূল প্রকৃতি ছেড়ে অনেক দূর এসে পড়া গেছে। কিন্তু তাতেও একটা জিনিষ বজায় আছে দেখা যায়—অর্থাৎ সংস্কৃত অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘের প্রভেদ। কিন্তু "বৌদ্ধগান ও দোহা"য় দেখি, তাও গেছে। বাংলা ছন্দের যে মূল লক্ষণগুলি সংস্কৃত ছন্দ থেকে তার প্রভেদ নির্দ্দেশ করে,—অর্থাৎ সমমাত্রার দু' তিনটি পর্ব্ব নিয়ে এক একটি চরণ গঠন এবং পর্ব্বাঙ্গ সংযোজনের আবশ্যকতা অনুসারে অক্ষরের দৈর্ঘ্য নির্ণয়, তা' 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র মধ্যেই পাওয়া যায়। অন্য কোন প্রমাণ না থাকলেও, শুধু ছন্দের প্রমাণ থেকেই বলা যায় যে, 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'তে আমরা প্রাকৃত প্রভৃতির যুগ ছাড়িয়ে এসেছি; নূতন ভাষার উদ্ভব হয়েছে।

যেমন,—

সংস্কৃত রীতি		আধুনিক রীতি
– – • • • • – • • – •	।	ᴗ – ᴗ – • • – • • • •
কাহ্না তরুবর | পঞ্চ বি ডাল	।	ধামার্থে চাটিল | সাঙ্কম গ ঢ ই
– • • – – • • – – •	।	ᴗ • ᴗ • – – – • • • •
চঞ্চল চীএ | পইঠো কাল	।	পার গামি লোঅ | নিভর তরই

বাংলার আদিতম ও প্রধানতম দুটি ছন্দোবন্ধ—যাকে পরে নাম দেওয়া হয় পয়ার ও লাচাড়ি—তাদেরও এখানে প্রথম পরিচয় পাই। পয়ার সম্ভবতঃ পদ-কার কথা থেকে এসেছে, যাঁরা গান ও দোহা ইত্যাদির পদ রচনা করেছিলেন তাঁরা এই ছন্দোবন্ধে রচনা কর্ত্তেন। প্রাচীন পয়ারের সঙ্গে সংস্কৃত পাদাকুলক ছন্দের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়, বোধ হয় পাদাকুলক নামটার সঙ্গেও পদ ইত্যাদি কথার সম্বন্ধ থাকতে পারে। অবশ্য এ সম্বন্ধে আমি জোর ক'রে কিছু

বলতে চাই না, সবটাই হ'ল আন্দাজ। লাচাড়ি—যার নাম পরে হয়েছিল ত্রিপদী—যে লাচ বা নাচ থেকে উদ্ভূত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, নৃত্যকলার এক-দুই-তিন এই সঙ্কেতের সঙ্গে লাচাড়ির বা ত্রিপদীর স্পষ্ট মিল রয়েছে। গোড়ায় এই পয়ার ও ত্রিপদী এখনকার চেয়ে একটু লম্বা ও টানা ছিল, পয়ার ছিল ৮+৮, আর ত্রিপদী ছিল ৮+৮+১২।

এর পরের যুগে একটা নূতন রকমের স্রোত দেখ্‌তে পাই। মধ্যযুগের বাংলায় দেখি ক্রমশঃ যেন দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার কমে আসছে। তার ফলে যে সমস্ত পদ্য রচনা আগে হয়ত ৮+৮ এই সঙ্কেতে পড়া হত, সেগুলো পড়া হ'তে লাগল ৮+৭এ এবং ক্রমে সেগুলো পড়া হ'তে লাগল ৮+৬এ, তাই হয়ে পড়ল শেষটা পয়ারের বাঁধা নিয়ম। লাচাড়ীও সেই ৮+৮+১২ থেকে খাট হ'তে হ'তে হয়ে পড়ল ৮+৮+১০। এই যে একটা প্রবৃত্তি, যার জন্যে ক্রমশঃ প্রাচীন উচ্চারণের বাঁধা মাত্রা পদ্ধতি উঠে গেল, এবং ক্রমে বল্‌তে গেলে দীর্ঘস্বরের ব্যবহারই চলে গেল, এর মধ্যে আমাদের ভাষার ও সমাজের একটা বড় তথ্য লুক্কায়িত রয়েছে ব'লে মনে করি, সম্ভবতঃ এর রহস্য এখন পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়নি।

মধ্য যুগের বাংলায় এবং তারও কিছু পর পর্য্যন্ত পয়ার ও ত্রিপদীই বাংলা ছন্দের বাহন ছিল। মধ্যযুগ থেকে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মনে হয় যেন বাংলা ছন্দ প্রাচীন রীতির নিশ্চয়তার ঘাট থেকে ছাড়া পেয়ে অনিশ্চয়তার স্রোতে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তার পরে যেন ভারতচন্দ্রের যুগে আর একটা নিশ্চয়তার ঘাটে এসে ভিড়ল। ততদিনে আবার একটা যেন নূতন পদ্ধতি সৃষ্টি হয়েছে, এই রীতিতে সমস্ত অক্ষরই হ্রস্ব, কেবল শব্দের অন্তঃস্থ হলন্ত অক্ষর হ'ল দীর্ঘ। ছন্দের ভিত্তি হ'ল পর্ব্ব, এবং সাধারণতঃ সেই পর্ব্ব হবে আট মাত্রার। বাংলা হস্তলিপির কায়দা অনুসারে হ'য়ে পড়ল মাত্রাসংখ্যার আর হরফের সংখ্যার মিল। তাতেই লোকে মনে ভাবতে লাগল যে ছন্দ নির্ণয় হয় হরফ বা তথাকথিত অক্ষর গুণে গুণে। এই ভুলের জন্য অবশ্য মাঝে মাঝে একটু আধটু অসুবিধাও হত, তা' ছাড়া চরণ যে ছন্দের মূল উপকরণ নয় এইটা না বোঝার জন্য কখন কখন ৭+৭কে ৮+৬র সমান ক'রে চালান হ'ত।

আগে বলেছি যে ধ্বনির ঐক্যের সাথে বৈচিত্র্যের সমাবেশেই ছন্দ। ঐক্য তাকে দেয় প্রাণ, বৈচিত্র্য তাকে দেয় রূপ। ঐক্যসূত্র না থাকলে পদ্যের ছন্দ

হয় না, কিন্তু শুধু একটা ঐক্যসূত্র থাকাই ছন্দের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাতে ছন্দ হয় একঘেয়ে ও প্রাণহীন। ছন্দের যে বিচিত্র ব্যঞ্জনাশক্তি, প্রাণের রসকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা, কাব্যের বাণীকে কাণের ভিতর দিয়ে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে,—সেটা নির্ভর করে বৈচিত্র্যের উপযুক্ত সমাবেশের উপর। ঐক্য হ'ল ছন্দের তাল, বৈচিত্র্য হ'ল ছন্দের সুর। আধুনিক বাংলা ছন্দের একটা স্পষ্ট রীতি গড়ে ওঠার আগে ঐক্যের সূত্রটাই ভাল নির্দ্দিষ্ট ছিল না, সুতরাং তখনকার দিনে পদ্যরচনায় বৈচিত্র্য আনবার কোন বিশেষ প্রয়াস দেখা যায় না। কি করে ঐক্য, সৌষম্য বজায় থাকে সেই দিকেই কবিকুলের একান্ত প্রয়াস ছিল। যখন তথাকথিত বর্ণমাত্রিক বা হরফ্-গোনা ছন্দোবন্ধের রীতিটা স্পষ্ট হ'ল, তখন একটা নির্ভরযোগ্য ঐক্যসূত্র পেয়েক বাংলার কবিকুল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এই যে কয়েক শতাব্দী ধরে বাংলা ছন্দ যেন পথ হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছিল, তার সেই প্রয়াসের চরম পরিণতি ও সার্থকতা দেখি ভারতচন্দ্রের কাব্যে।

ভারতচন্দ্রের একটা সদাজাগ্রত ছন্দোবোধ ছিল ব'লে শুধু ছন্দের মধ্যে ঐক্যসাধন করেই তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত হতে পারেন নি। তিনি ছন্দে মনোহারিত্ব বা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টাও করেছিলেন। একটু নূতন সঙ্কেতে চরণ গঠন করার চেষ্টা, নূতন সংখ্যক মাত্রা দিয়ে পর্ব্ব তৈরি করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন এবং কৃতকার্য্যও হয়েছিলেন। লঘু ত্রিপদী তাঁর সময় থেকেই খুব বেশী ভাবে চল্ হয়ে গেছে। কিন্তু এদিক্ দিয়ে যে ছন্দস্পন্দনের বৈচিত্র্য আনার বিষয়ে খুব সুবিধা হবে না, তা' তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সেইজন্য তিনি একেবারেই পর্ব্বের ভেতরে ধ্বনির স্পন্দন আনবার চেষ্টা করেন। তিনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, সুকৌশলে তিনি সংস্কৃতের অনুযায়ী দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ বাংলায় আনার চেষ্টা করেন, এবং অনেক স্থলে যে রকম সাফল্য লাভ করেছেন তাতে তাঁর গভীর ছন্দোবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সব জায়গাতেই যে কৃতকার্য্য হয়েছেন তা' বলা যায় না। সুতরাং এই কারণে, হয়ত, বহুল পরিমাণে এ চেষ্টা তিনি করেন নি। আর একটা নূতন ঢঙের ছন্দ তিনি বাংলা সাহিত্যে ঢোকান—বাংলা গ্রাম্য ছড়ার ছন্দ থেকে। এর বিশেষত্ব হচ্ছে যে, এতে প্রবল স্বরাঘাত থাকে, তজ্জন্য একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য দোলা অনুভব করা যায়। এর প্রতি পর্ব্বে চার মাত্রা, ও দুই পর্ব্বাঙ্গ। এর

ইতিহাস সম্ভবতঃ ছন্দের সনাতন ধারার সঙ্গে সংস্রবহীন, অনার্য্যদের নাচ ও গানের তালের সঙ্গে এর খুব মিল দেখা যায়, এবং বাঙালীর ছন্দোবোধের সঙ্গে এ বেশ খাপ খেয়ে যায়। আজও ঢাকের বাদ্যে এর প্রভাব দেখা যায়। ভারতচন্দ্র কিন্তু এই রীতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি, বোধ হয় এর প্রাকৃত ও গ্রাম্য সংস্রবের জন্য তিনি সাহিত্যে এর ব্যবহারে সঙ্কুচিত ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষা দীক্ষার প্রবল প্রভাবে বাংলা ছন্দেও একটা তোলপাড় লেগে গেল। ঈশ্বরগুপ্ত ভারতচন্দ্রেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে গেলেন, যদিও ছড়ার ছন্দকে সাহিত্যে কতকটা জাতে তোলার কাজ তিনি করে গেছেন। তার পরে এলো বৈচিত্র্যের সন্ধানের যুগ। বাংলা ছন্দের স্বপ্নভঙ্গ হ'ল, নির্ঝরের মত সে বেরিয়ে পড়ল।

প্রথম কিছুদিন সংস্কৃত ছন্দ চালাবার একটু চেষ্টা হয়েছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি একটু আধটু কৃতকার্য্য হলেও ও ধরণের উচ্চারণ যে বাংলায় চলবে না তা' বেশ বোঝা গেল। তখন খুব বেশী করে ঝোঁক পড়ল নতুন নতুন সঙ্কেতে চরণ গঠন করা এবং নানা বিচিত্র নক্সায় স্তবক গড়ে তোলার চেষ্টা। সে চেষ্টার বোধ হয় চরম পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। আমার 'Rabindranath's Prosody' প্রবন্ধে তাঁর বিচিত্র চরণ ও স্তবকের কথা বলেছি। এই চরণ ও স্তবকের গঠনবৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের অনুভূতির ব্যঞ্জনা হয়েছে। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনার বেদনা, আত্মবিলাপের বিষাদ, হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীতের উদ্দীপনা থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথের 'পুরবী'র আহ্বান পর্য্যন্ত এই বৈচিত্র্যে ধ্বনিত হয়েছে।

বৈচিত্র্য আধুনিক ছন্দে আনা হয়েছে আরও দু' এক দিক্ দিয়ে। হলন্ত অক্ষর বাংলায় দীর্ঘ হ'তে পারে, রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলে ধরার একটা প্রথা চালিয়েছেন। তার ফলে আধুনিক বাংলায় একটা বিশিষ্ট মাত্রাচ্ছন্দ চল্‌তি হয়েছে। এতে পদ্য লেখা অনেকের পক্ষে সহজ হয়েছে, এবং যুক্তবর্ণ যেখানেই আছে সেখানেই একটা দোলা বা তরঙ্গের সৃষ্টি হয় ব'লে পর্ব্বের মধ্যেই একটা বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এ ছন্দে লয় পরিবর্ত্তন নেই, এতে গাম্ভীর্য্য বা উদাত্ত ভাব নেই, এতে অমিতাক্ষর ছন্দও রচনা করা যায় না, কোন রকম মুক্ত ছন্দও হয় না। এটা গীতিকবিতার পক্ষে খুব উপযোগী।

তা' ছাড়া ছড়ার ছন্দ আজকাল উচুদরের সাহিত্যে বেশ চলেছে। এর স্বরাঘাতের পৌনঃপুনিকতার জন্য ছন্দে বেশ একটা আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়। এটা সাহিত্যে বহুল প্রচলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট গৌরব আছে। 'পলাতকার' কবিতায়, 'শিশু'র অনেক কবিতায় এই ধরণের ছন্দোবন্ধ আছে।

কিন্তু সব চেয়ে বড় যুগান্তর আনলেন মধুসূদন তাঁর অমিতাক্ষরে। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে বাংলায় ছেদের যতির অনুগামী হওয়ার কোন আবশ্যিকতা নেই। এইটিই হল তাঁর অমিতাক্ষরের এবং মধুসূদনের গুরু Miltonএর blank verseর আসল কথা। এই জন্য আমি তাঁর blank verseকে বলি অমিত্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর—কারণ ঠিক্ কটা মাত্রা বা অক্ষরের পর ছেদ আস্‌বে সে বিষয়ে কোন নিয়ম নেই। এইখানে বাংলা ছন্দ প্রথম পেল স্বেচ্ছাবিহারের ও মুক্তির স্বাদ। যতির নিয়মানুসারিতার জন্য অবশ্য একটা ঐক্যসূত্র রয়ে গেল, কিন্তু ঐক্যের রঙকে ছাপিয়ে উঠল বৈচিত্র্যের জৌলুষ।

এই যে সন্ধান মধুসূদন দিয়ে গেলেন তার এখনও শেষ হয় নি। আধুনিক বাংলা ছন্দ চেষ্টা কর্চ্ছে একটা নিয়মের শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বেচ্ছাকৃত বৈচিত্র্যের ভেতরে অনুভূতির স্পন্দনকে প্রকাশ কর্ত্তে। কিন্তু প্রথমতঃ মধুসূদনের অমিতাক্ষর যেন ঐক্যকে বড় বেশী বাদ দিয়েছে এই রকম অনেকে মনে কর্ত্তেন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র অনেকটা একে নরম করার চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আবার অমিতাক্ষরের সঙ্গে মিত্রাক্ষর রেখে এক অপরূপ ছন্দ চালিয়েছেন, তাতে অমিতাক্ষরের বৈচিত্র্যও আছে অথচ মিত্রাক্ষরের দরুন ঐক্যটাও বেশ কানে ধরা দেয়। এটা এখন বেশ চল্‌তি। মধুসূদন ছেদ ও যতিকে বিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু যতির দিক দিয়ে একটা বাঁধা ছাঁচ রেখেছিলেন। অনেকে এই দোরোখা ছন্দ তত পছন্দ করেন না। সেইজন্য গিরিশচন্দ্র আর একটু অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন মাত্রার পর্ব্ব দিয়ে চরণ গঠন করতে লাগলেন, তবে প্রত্যেক চরণে প্রায়ই সমসংখ্যক পর্ব্ব রেখে একটা কাঠামো কতকটা বজায় রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলাকার ছন্দে আর এক দিক দিয়ে গেছেন। তিনি ৮+১০ এই আঠার মাত্রার চরণকে ভিত্তি করে মাঝে মাঝে অপূর্ণ বা খণ্ডিত পর্ব্ব যথেচ্ছা বসিয়ে গেছেন, আবার কখন অতিরিক্ত শব্দ ঢুকিয়ে ছন্দের প্রবাহ ক্ষিপ্র করে তুলেছেন, কিন্তু এতে ছন্দের বন্ধন একেবারে ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে মনে করে সুকৌশলে মিল ঢুকিয়ে

চরণ পরম্পরার মধ্যে একটা বাঁধন রেখেছেন। ভাববৈচিত্র্য প্রকাশের পক্ষে এটা খুব উপযোগী হয়েছে।

কিন্তু এ সমস্ততেই পদ্যের নিয়মানুসারী একটা কিছু ঐক্য রাখার চেষ্টা হয়েছে। যদি একেবারে ঐক্যকে বাদ দেওয়া যায় তবে হবে free verse বা মুক্তবন্ধ ছন্দ। সেটা বাংলায় চলেনি। বোধ হয় সে জিনিষটা আমাদের রুচিসঙ্গত হবে না। কেউ কেউ ভুল ক'রে 'পলাতকা'র ছন্দকে মুক্তবন্ধ বলেন। সে কথাটা ঠিক নয়, কারণ 'পলাতকা'য় বরাবর সমমাত্রার (চার মাত্রার) পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু পদ্যের বিশিষ্ট রীতিতে গঠিত পর্ব্ব এবং পদ্যছন্দের রূপকল্প উপরের সব রকম লেখাতেই পাই। তা' ছাড়া আবার গদ্যের ছন্দ আছে। তার এক একটি পর্ব্ব হ'ল বাক্যাংশ, তাদের গঠনরীতি ভিন্ন, তাদের সমাবেশের রূপকল্পও অন্যরকম। সে কথা আলোচনার সময় এখন আর নেই। তবে কি ভাবে এই গদ্যছন্দে পদ্যের রূপকল্প আনা যায় তার উদাহরণ পাওয়া যায়,—রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'য়।

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র*

[১] যে ভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দঃ বলে।

ব্যাপক অর্থে ধরিলে ছন্দঃ সর্ব্ববিধ সুকুমার কলার লক্ষণ। সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সমস্ত সুকুমার কলাতেই দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ রীতি অবলম্বন করিয়া উপকরণগুলির সমাবেশ না করিলে মনে কোনরূপ রসের সঞ্চার হয় না। এই রীতিকেই rhythm বা ছন্দঃ বলা যায়। মানুষের বাক্যও বহুল পরিমাণে ছন্দোলক্ষণযুক্ত। সাধারণ কথাবার্ত্তাতেও অনেক সময় অল্পাধিক পরিমাণে ছন্দোলক্ষণ দেখা যায়। কখন কখন সুলেখকগণের গদ্য-রচনাতে সুস্পষ্ট ছন্দোলক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পদ্যেই ছন্দের লক্ষণগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে ও স্পষ্টভাবে বর্ত্তমান থাকে। বলিতে গেলে ছন্দই কাব্যের প্রাণ। ছন্দোযুক্ত বাক্য বা পদ্যই কাব্যের বাহন।

এই গ্রন্থে বাংলা পদ্যছন্দের উপাদান ও তাঁহার রীতির আলোচনা করা হইবে। ছন্দঃ বলিতে এখানে metre বা পদ্যছন্দঃ বুঝিতে হইবে।

[২] যদি ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়া বিভিন্ন বাক্যাংশ কোন সুস্পষ্ট সুন্দর আদর্শ† অনুসারে যোজনা করা হয়, তবে সেখানে ছন্দঃ আছে, বলা যাইতে পারে।

---

* এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব' শীর্ষক অধ্যায়ে ইহাদের অনেকগুলি সূত্রের বিস্তৃততর ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

† আদর্শ কথাটি এখানে Pattern অর্থে ব্যবহৃত হইল। নক্সা, ছাঁচ ইত্যাদি কথাও প্রায় ঐ ভাব প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ 'রূপকল্প' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

সঙ্গীতে অনেক সময় সাধারণ উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যত্যয় করিয়া তাল ঠিক রাখা হয়, অর্থাৎ ছন্দঃ বজায় রাখা হয়। 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল' এই বাক্যটি লইয়াও গানের কলি রচিত হইয়াছে। কবিতায় এরূপ স্বাধীনতা চলে না।

কোন একটি বিশেষ pattern বা আদর্শ অনুসারে উপকরণগুলি সংযোজিত না হইলে ছন্দোবোধ আসে না। সমস্ত শিল্পসৃষ্টিতেই আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। ঐ আদর্শই আমাদের রসানুভূতির symbol বা বাহ্য প্রতীক। আমাদের সর্ব্altবিধ কার্য্যের মধ্যে কোন না কোন এক প্রকার আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। জোড়ায় জোড়ায় জিনিস রাখা বা ব্যবহার করা, দুই দিক্ সমান করিয়া কোন কিছু তৈয়ার করা—এ সমস্তই আমাদের আদর্শানুকরণের পরিচয় প্রদান করে। এরূপ না করিলে সমস্ত ব্যাপারটা খাপছাড়া ও বিশ্রী বলিয়া বোধ হয়।

উপরে অতি সরল দুই-এক প্রকার আদর্শের উদাহরণ মাত্র দেওয়া হইল। নানারূপ জটিল রসানুভূতির জন্য নানারূপ জটিল আদর্শেরও ব্যবহার হইয়া থাকে।

আদর্শের পৌনঃপুনিকতা হইতে ছন্দের উপকরণগুলির মধ্যে এক প্রকার ঐক্য অনুভূত হয় এবং সে জন্য তাহাদের ছন্দোবদ্ধ বলা হয়। এই ঐক্যবোধ ছন্দোবোধের ভিত্তিস্থানীয়।

[৩] বাংলা পদ্যে পরিমিত কালানন্তরে সমধর্ম্মী বাক্যাংশের যোজনা হইতেই ছন্দোবোধ জন্মে।

নানা ভাষায় নানা প্রকৃতির ছন্দ আছে। বাক্যের ধর্ম্ম নানাবিধ। প্রত্যেক ভাষাতেই দেখা যায় যে, জাতির প্রকৃতি ও উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে এক এক জাতির ছন্দ-বাক্যের এক একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে।

বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃতে দেখিতে পাই যে অক্ষরের দৈর্ঘ্যই ছন্দের ভিত্তি-স্থানীয়, এবং একটা বিশেষ আদর্শ অনুসারে হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাবেশ অবলম্বন করিয়াই ছন্দ রচিত হয়।

ইংরাজিতে অক্ষরের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য বা accentই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়। প্রতি চরণে কয়টি accent, চরণের মধ্যে accented ও unaccented অক্ষরের পারম্পর্য্য, ইহার উপরই ছন্দের ভিত্তি।

অর্ব্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অনেক ছন্দে এবং বাংলা ছন্দে দেখিতে পাওয়া যায় যে জিহ্বার সাময়িক বিরতি বা যতিই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়। ঠিক কতক্ষণ পরে পরে যতির আবির্ভাব হইবে, তাহাই এখানে মুখ্য তথ্য। দুই যতির মধ্যে কালপরিমাণই বাংলা ছন্দের প্রধান বিচার্য্য বিষয়।

অক্ষর (Syllable)

[৪] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা syllable। (চলিত বাংলায় অনেক সময় অক্ষর বলিতে এক একটি লিখিত হরফ্ মাত্র বুঝায়। কিন্তু ব্যুৎপত্তি হিসাবে অক্ষরের অর্থ syllable, এবং এই অর্থেই ইহা সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। বাংলাতেও এই অর্থে ইহাকে ব্যবহার করা উচিত।)

অক্ষরকে বিশ্লেষ করিলে এক একটী বিশিষ্ট ধ্বনি (sound, phone) পাওয়া যায়, এই ধ্বনিকে বাক্যের 'পরমাণু' বলা যাইতে পারে। যথা—'কা', 'এক্', 'ক্রী', 'প্লু', 'গৌ', 'চল্'—অক্ষর ; 'ক্', 'আ', 'এ', 'র্', 'ঈ', 'প্', 'ল্', 'উ', 'গ', 'ঔ', 'চ', 'অ'—ধ্বনি।

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাহাই অক্ষর। প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বরধ্বনি থাকিবেই ; তদ্ভিন্ন স্বরের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি ব্যঞ্জনবর্ণও উচ্চারিত হইতে পারে। স্বরবর্ণের বিনা সাহায্যে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় না।*

অক্ষর দুই প্রকার—**স্বরান্ত** (open), ও **হলন্ত** (closed) ; স্বরান্ত অক্ষর, যথা—'না', 'যা', 'দে', 'সে' ইত্যাদি ; হলন্ত অক্ষর, যথা—'জল্', 'হাত', 'বাঃ' ইত্যাদি।

[৫] **ছন্দের আলোচনার সময় উচ্চারণের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে।** লিখিত হরফ্ বা বর্ণ এবং অক্ষর এক নহে। তদ্ভিন্ন ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংলার প্রচলিত বর্ণমালা হইতে এই ভাষার সব কয়টি প্রধান ধ্বনির (phoneme-এর) পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক

---

* Semivowel-জাতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণের বিনা সহায়তায় উচ্চারিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তখন এই প্রকারের ব্যঞ্জনবর্ণ syllabic অর্থাৎ অক্ষর-সাধক ও স্বরবর্ণের সামিল হয়।

সময় দুইটি লিখিত স্বরবর্ণ জড়াইয়া মাত্র একটি স্বরের ধ্বনি পাওয়া যায়। 'বেরিয়ে যাও' এই বাক্যের শেষ শব্দ 'যাও' বাস্তবিক একাক্ষর, শেষের 'ও' ভিন্নরূপে উচ্চারিত হয় না, পূর্ব্ববর্ত্তী 'আ' ধ্বনির সহিত জড়াইয়া থাকে। কিন্তু 'আমাদের বাড়ী যেও'—এই বাক্যের শেষ শব্দটি দুইটি অক্ষরযুক্ত, কারণ শেষের 'ও' ভিন্নরূপে স্পষ্ট উচ্চারিত হইতেছে।

তদ্ভিন্ন কখন কখন এক একটি স্বর লেখার সময় ব্যবহৃত হইলেও পড়ার সময় বাস্তবিক বাদ যায়। যেমন কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ-রীতি অনুসারে 'লাফিয়ে' এই শব্দটীর উচ্চারণ হয় যেন 'লাফ ই য়ে' = 'লাফো', ; 'তুই বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখিস্'—ইহার উচ্চারণ হয়, 'তুই বুঝি লুকো লুকো দেখিস্' *।

অধিকন্তু স্বরবর্ণের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা বিবেচনার সময়ও উচ্চারণরীতি স্মরণ রাখিতে হইবে। 'হেমেন' বলিতে গেলে 'হে' অক্ষরটির 'এ' হ্রস্বভাবে উচ্চারিত হয়; কিন্তু কাহাকেও কিছু দূর হইতে ডাকিতে গেলে যখন 'ওহে রমেন' বলিয়া ডাকি, তখন 'ওহে' শব্দের 'হে' দীর্ঘস্বরান্ত হয়।

তদ্ভিন্ন, স্বরবর্ণের মধ্যে **মৌলিক** ও **যৌগিক** (diphthong) ভেদে দুই জাতি। 'অ, আ, ই (ঈ), উ (ঊ), এ, ও, ॻ' প্রভৃতি মৌলিক স্বর; 'ঐ' যৌগিক-স্বর, কারণ ইহা বাস্তবিক 'ও'+'ই' এই দুইটি স্বরের সংযোগে রচিত। তদ্রূপ 'ঔ', 'অাই', 'আও' ইত্যাদি যৌগিক স্বর।

যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে হলন্ত অক্ষরেরই সামিল।

[৬] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চারিটি ধর্ম্ম—[১] তীব্রতা (pitch) —শ্বাস বহির্গত হইবার সময় কণ্ঠস্থ বাক্‌তন্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই অনুসারে তাহাদের দ্রুত বা মৃদু কম্পন সুরু হয়। যত বেশী টান পড়িবে, ততই দ্রুত কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়া বা তীব্র হইবে; [২] গাম্ভীর্য্য (intensity বা loudness)—অক্ষরের উচ্চারণের সময় যত বেশী পরিমাণে শ্বাসবায়ু একযোগে বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর হইবে এবং তত দূর হইতেও স্পষ্টরূপে স্বর শ্রুতিগোচর হইবে; [৩] স্বরের দৈর্ঘ্য বা কালপরিমাণ (length বা duration)—যতক্ষণ ধরিয়া বাগ্‌যন্ত্র কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে; [৪] স্বরের

---

* সধবার একাদশী—দীনবন্ধু মিত্র।

'রঙ্' (tone-colour)—শুদ্ধ স্বরমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, স্বরের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধ্বনিরও সৃষ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও স্বর মিষ্ট, কাহারও স্বর কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে ; ইহাকেই বলা যায় 'স্বরের রঙ্'।

এই চারিটি ধর্ম্মের মধ্যে **দৈর্ঘ্য ও গাম্ভীর্য্য এই দুইটি লইয়াই বাংলা ছন্দের কারবার।** অবশ্য, কথা বলিবার সময় নানা লক্ষণাক্রান্ত অক্ষর-সমষ্টির পরম্পরায় উচ্চারণ হইতে থাকে। কিন্তু ছন্দবোধ, বাক্যের অন্যান্য লক্ষণকে উপেক্ষা করিয়া দুই একটি বিশেষ লক্ষণকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এ সম্বন্ধে রীতি বিভিন্ন।

ছেদ, যতি ও পর্ব্ব

[৭] কথা বলার সময় আমরা অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি না ; ফুস্‌ফুসের বাতাস কমিয়া গেলেই ফুস্‌ফুসের সঙ্কোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে সেই সঙ্কোচের জন্য কম বা বেশী আয়াস বোধ হয়। সেইজন্য কিছু সময় পরেই ফুস্‌ফুসের আরামের জন্য এবং মাঝে মাঝে তৎসঙ্গে পুনশ্চ নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য বলার বিরতি আবশ্যক হইয়া পড়ে। নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় শব্দোচ্চারণ করা যায় না।

এই রকমের বিরতির নাম, 'বিচ্ছেদ-যতি', বা শুধু **ছেদ** (breath-pause)। খানিকটা উক্তি অথবা লেখা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ থাকার জন্য তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। এইরূপ প্রত্যেকটি অংশ এক একটি breath-group বা **শ্বাস-বিভাগ**, কারণ তাহা একবার বিরতির পর হইতে পুনরায় বিরতি পর্য্যন্ত এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত ধ্বনির সমষ্টি। এইরূপ বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া ধ্বনির বিচ্ছেদ-স্থল বা 'ছেদ' আছে। ব্যাকরণ-অনুযায়ী প্রত্যেক sentence বা বাক্যই পূর্ণ একটি শ্বাস-বিভাগ বা কয়েকটি শ্বাস-বিভাগের সমষ্টি। কখন কখন একটি clause বা খণ্ড-বাক্যে পূর্ণ শ্বাস-বিভাগ হয়।

বাক্যের শেষের ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, সে জন্য ইহাকে **পূর্ণচ্ছেদ** (major breath-pause) বলা যাইতে পারে। বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন phrase বা

অর্থবাচক শব্দ-সমষ্টির মধ্যে সামান্য একটু ছেদ থাকে, তাহাকে **উপচ্ছেদ** (minor breath-pause) বলা যায়। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ অনুসারে বৃহত্তর শ্বাস-বিভাগ (major breath-group) ও ক্ষুদ্রতর শ্বাস-বিভাগ (minor breath-group) গঠিত হয়।

ছেদ বা বিচ্ছেদ যতিকে 'ভাব-যতি'-(sense-pause)-ও বলা যাইতে পারে। উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, সেখানে অর্থবাচক শব্দসমষ্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; উপচ্ছেদ থাকার দরুন বাক্যের অন্বয় কিরূপে করিতে হইবে, তাহা বুঝা যায়—একটি বাক্য অর্থবাচক নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়। যেখানে পূর্ণচ্ছেদ থাকে, সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা ঘটে ও বাক্যের শেষ হয়। এ জন্য phrase ও sentence-কে 'অর্থ-বিভাগ' (sense-group) বলা যাইতে পারে।

লিখন-রীতি অনুসারে যেখানে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্ন বসান হয়, সেখানে প্রায়ই কোন এক প্রকার ছেদ থাকে—হয় পূর্ণচ্ছেদ, না হয় উপচ্ছেদ। ব্যাকরণের নিয়মে যেখানে full-stop বা পূর্ণচ্ছেদ পড়ে, ছন্দের নিয়মে সেখানেও major breath-pause বা পূর্ণচ্ছেদ পড়িবে। কিন্তু যেখানে কমা, সেমিকোলন আদি পড়ে না, এমন স্থলেও উপচ্ছেদ পড়ে, এবং যেখানে syntax-এর (অর্থাৎ বাক্যরীতিগত) পূর্ণচ্ছেদ নাই, সেখানেও ছন্দের পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্ :—

রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত * প্রাচীন ভারতবর্ষের * যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া * মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে * জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, * * সেখান হইতে * কেবল বর্ষাকাল নহে, * চিরকালের মতো * আমরা নির্বাসিত হইয়াছি * *। (মেঘদূত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

উপরের বাক্যটিতে যেখানে একটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, পড়িবার সময় সেইখানেই একটু থামিতে হয়, সেখানেই একটি উপচ্ছেদ পড়িয়াছে ; এইটুকু না থামিলে কোন্ শব্দের সহিত কোন্ শব্দের অন্বয়, ঠিক বুঝা যায় না ; এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই বাক্যটি অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। যেখানে দুইটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ বুঝিতে হইবে। সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা ও বাক্যের শেষ হইয়াছে ; সেখানে উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং সম্পূর্ণ প্রশ্বাস-ত্যাগের পর নূতন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করা হয়।

[৮] যেখানে ছেদ থাকে, সেখানে সব কয়টি বাগ্‌যন্ত্রই বিরাম পায়। এক ছেদ হইতে অপর ছেদ পর্য্যন্ত এক একটি শ্বাস-বিভাগের মধ্যে এক রকম অনর্গল বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া চলিতে থাকে। তজ্জন্য বাগ্‌যন্ত্রের ক্লান্তি ঘটে এবং পুনশ্চ শক্তিসঞ্চারের আবশ্যক হয়। ছেদের সময় অবশ্য সমস্ত বাগ্‌যন্ত্রই নূতন করিয়া শক্তি সঞ্চারের অবসর পায়। কিন্তু ছেদ ভাবের অনুযায়ী বলিয়া সব সময় নিয়মিত ভাবে বা তত শীঘ্র পড়ে না—পূর্ব্ব হইতেই জিহ্বার ক্লান্তি ঘটিতে পারে, এবং বিরামের আবশ্যকতা আসিয়া পড়ে। এক এক বারের ঝোঁকে কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তিসংগ্রহের জন্য জিহ্বা এই বিরামের আবশ্যকতা বোধ করে। বিরামের পর আবার এক ঝোঁকে পুনশ্চ কয়েকটি অক্ষরের উচ্চারণ করে। এই বিরামস্থলকে **বিরাম-যতি** বা **শুধু যতি** নাম দেওয়া যাইতে পারে। যেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি impulse বা ঝোঁকের শেষ; এবং তাহার পরে আর একটি ঝোঁকের আরম্ভ।

অবশ্য অনেক সময়ই ছেদ ও যতি এক সঙ্গে পড়ে। কিন্তু সর্ব্বদাই এরূপ হয় না। যখন যতির সহিত ছেদের সংযোগ না হয়, তখন যতি-পতনের সময় ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে; শুধু জিহ্বার ক্রিয়া থাকে না, এবং স্বর একটা drawl বা দীর্ঘ টানে পর্য্যবসিত হয়। আবার জিহ্বা যখন impulse বা ঝোঁকের বেগে চলিতে থাকে, তখনও সহসা ছেদ পড়িয়া থাকে; তখন মুহূর্ত্তের জন্য ধ্বনি স্তব্ধ হয়, কিন্তু জিহ্বা বিশ্রাম গ্রহণ করে না, ঝোঁকেরও শেষ হয় না, এবং ছেদের পর যখন ধ্বনিপ্রবাহ চলে, তখন আবার নূতন ঝোঁকের আরম্ভ হয় না।

[৯] **যতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের ঐক্যবোধ জন্মে।** পরিমিত কালান্তরে কোন আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই। ছেদ sense বা অর্থ অনুসারে পড়ে; সুতরাং ইহার দ্বারা পদ্য অর্থানুযায়ী অংশে বিভক্ত হয়। জিহ্বার সামর্থ্যানুসারে যতি পড়ে। ইহার দ্বারা পদ্য পরিমিত ছন্দোবিভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক ছন্দোবিভাগ বাগ্‌যন্ত্রের এক এক বারের ঝোঁকের মাত্রানুসারে হইয়া থাকে। এই ঝোঁকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের ঐক্যের লক্ষণ।

বাংলা পদ্যে এক একটি ছন্দোবিভাগের নাম **পর্ব্ব** (measure বা bar)। পরিমিত মাত্রার পর্ব্ব দিয়াই বাংলা ছন্দ গঠিত হয়। **এক এক বারের**

ঝোঁকে ক্লান্তিবোধ বা বিরামের আবশ্যকতা বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত যতটা উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম পর্ব্ব। পর্ব্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ।

পর্ব্বের সহিত পর্ব্ব গ্রথিত করিয়াই ছন্দের মাল্য রচনা করা হয়। পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা হইতেই ছন্দের চাল বোঝা যায়। পর্ব্বের দৈর্ঘ্য (অর্থাৎ মাত্রা-সংখ্যা) ঠিক রাখিয়া নানাভাবে চরণ ও স্তবক (stanza) গঠন করিলেও ছন্দের ঐক্য বজায় থাকে, কিন্তু যদি পর্ব্বের দৈর্ঘ্যের হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের দৈর্ঘ্য বা স্তবক-গঠনের রীতির দ্বারাই ছন্দের ঐক্য বজায় রাখা যাইবে না।

তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি—

এই চরণটিতে মোট সতের মাত্রা।

সকালবেলা কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায়—

এই চরণটিতেও সতের মাত্রা। কিন্তু এই দুইটি চরণে মোট মাত্রাসংখ্যা সমান হইলেও তাহাদিগকে এক গোত্রে ফেলা যাইবে না, এই দুইটি চরণ একই স্তবকে স্থান পাইবে না। কারণ, ইহাদের চাল ভিন্ন। এই পার্থক্যের স্বরূপ বোঝা যায় চরণের উপকরণস্থানীয় পর্ব্বের মাত্রা হইতে।

প্রথম চরণটিতে মূল পর্ব্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ—

তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি। (=৬+৬+৫)

দ্বিতীয় চরণটিতে মূল পর্ব্ব পাঁচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ—

সকাল বেলা | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | যায়। (=৫+৫+৫+২)

ছয় মাত্রার ও পাঁচ মাত্রার পর্ব্বের ছন্দোগুণ সম্পূর্ণ পৃথক্। এই পার্থক্যের জন্যই উদ্ধৃত চরণ দুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়।

ছেদ যেমন দুই রকম, যতিও সেইরূপ মাত্রাভেদে দুই রকম—**অর্দ্ধযতি** ও **পূর্ণযতি**। ক্ষুদ্রতর ছন্দোবিভাগ বা পর্ব্বের পরে অর্দ্ধযতি, এবং বৃহত্তর ছন্দো-বিভাগ বা চরণের পরে পূর্ণযতি থাকে।

[১০] বাংলা কবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই উপচ্ছেদ ও অর্দ্ধযতি এবং পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি অবিকল মিলিয়া যায়। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় না। সময়ে

সময়ে ছেদ ছন্দোবিভাগের মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা স্রোতের মধ্যে বিচিত্র আন্দোলন সৃষ্টি করে।

নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ছেদ ও যতির প্রকৃতি প্রতীত হইবে—

([*] ও [* *], এই দুই সঙ্কেতদ্বারা উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং [|] [‖] এই সঙ্কেতদ্বারা অর্দ্ধযতি ও পূর্ণযতি নির্দ্দেশ করিতেছি।)

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল * | ঈশ্বরী পাটনী * * ‖
একা দেখি কুলবধূ * | কে বট আপনি * * ‖ (অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র)

গগন ললাটে * | চূর্ণকায় মেঘ * |
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে * * ‖
কিরণ মাখিয়া * | পবনে উড়িয়া * |
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে * * ‖ (আশাকানন, হেমচন্দ্র)

আমি যদি | জন্ম নিতেম * | কালিদাসের | কালে * * ‖
দৈবে হতেম | দশম রত্ন * | নবরত্নের | মালে * * ‖
(সেকাল, রবীন্দ্রনাথ)

আর—ভাষাটাও তা | ছাড়া * মোটে | বেঁকে না * রয় | খাড়া * * ‖
আর—ভাবের মাথায় | লাঠি মার্‌লেও * | দেয় নাকো সে | সাড়া * * ‖
সে—হাজার-ই পা | দুলাই, * গোঁফে | হাজারি-ই দিই | চাড়া ; * * ‖
(হাসির গান, দ্বিজেন্দ্রলাল)

একাকিনী শোকাকুলা | অশোক কাননে ‖
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা * | আঁধার কুটীরে ‖
নীরবে। * * দুরন্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়িয়া ‖
ফেরে দূরে, * মত্ত সবে | উৎসব কৌতুকে। * * ‖
(মেঘনাদবধ কাব্য, মধুসূদন)

গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা | রটি' গেল ক্রমে * ‖
মৈত্র মহাশয় যাবে | সাগর সঙ্গমে * ‖
তীর্থস্নান লাগি'। * * | সঙ্গীদল গেল জুটি' ‖
কত বালবৃদ্ধ নরনারী, * | নৌকা দুটি ‖
প্রস্তুত হইল ঘাটে। * *

(দেবতার গ্রাস, রবীন্দ্রনাথ)

পর্ব্ব (Bar) ও পর্ব্বাঙ্গ (Beat)

[১১] ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাংলা ছন্দ কয়েকটি পর্ব্ব (অর্থাৎ এক এক ঝোঁকে উচ্চারিত বাক্যাংশ) লইয়া গঠিত হয়। ছন্দোরচনা করিতে হইলে সমান মাপের, বা কোন নিয়ম অনুসারে পরিমিত মাপের, পর্ব্ব ব্যবহার করিতে হইবে। পূর্ব্বের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ দৃষ্টান্তে সমান মাপের পর্ব্বই প্রায় ব্যবহার করা হইয়াছে, কেবল ১ম, ৩য়, ৪র্থ দৃষ্টান্তে প্রতি পংক্তির শেষে যেখানে পূর্ণচ্ছেদ আছে, সেখানে পর্ব্বটি ঈষৎ ছোট হইয়াছে, এবং ২য় দৃষ্টান্তে পূর্ণচ্ছেদের পূর্ব্বের পর্ব্বটি ঈষৎ বড় হইয়াছে।

পর্ব্ব মাত্রেই কয়েকটি শব্দের সমষ্টি। শব্দ বলিতে মূল শব্দ বা বিভক্তি বা উপসর্গ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। এরূপ কয়েকটি শব্দ লইয়া একটি বৃহত্তর পদ রচিত হইলেও, ছন্দের বিভাগের সময় প্রত্যেকটি গোটা শব্দকে বিভিন্ন ধরিতে হইবে। 'গুলি', 'দ্বারা', 'হইতে' ইত্যাদি যে সমস্ত বিভক্তি, মাপে ও ব্যবহারে, শব্দের অনুরূপ তাহাদিগকেও ছন্দের হিসাবে এক একটি শব্দ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই **শব্দই বাংলা উচ্চারণের ভিত্তিস্থানীয়**।

প্রত্যেকটি পর্ব্ব দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি। ১ম দৃষ্টান্তে 'একা দেখি কুলবধূ' এই পর্ব্বটিতে 'একা দেখি' ও 'কুলবধূ' এই দুইটি পর্ব্বাঙ্গ আছে। **এক একটি পর্ব্বাঙ্গও হয় একটি মূল শব্দ, না হয় কয়েকটি মূল শব্দের সমষ্টি**। (পর্ব্বাঙ্গের বিভাগ দেখাইবার জন্য [:] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে।)

[১২] পূর্ব্বে স্বরের গাম্ভীর্য্যের কথা বলা হইয়াছে। কথা বলিবার সময় বরাবর সব কয়টি অক্ষর সমান গাম্ভীর্য্য সহকারে উচ্চারণ করা যায় না। গাম্ভীর্য্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়াই নিয়ম। সাধারণ বাংলা উচ্চারণে প্রতি শব্দের প্রথমে স্বরের গাম্ভীর্য্য কিছু বেশী হয়, শব্দের শেষে কিছু কম হয়। প্রত্যেকটি পর্ব্বাঙ্গের প্রথমেও স্বরগাম্ভীর্য্য বেশী, শেষে কিছু কম। যদি একই পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে একাধিক শব্দ থাকে, তবে প্রথম শব্দ অপেক্ষা পরবর্ত্তী শব্দের গাম্ভীর্য্য কম হয়, পর্ব্বাঙ্গের প্রথম হইতে গাম্ভীর্য্য একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে, পর্ব্বাঙ্গের শেষে সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। পরবর্ত্তী পর্ব্বাঙ্গ আরম্ভ হইবার সময় পুনশ্চ গাম্ভীর্য্য বাড়িয়া যায়। এইরূপে **স্বর-গাম্ভীর্য্যের বৃদ্ধি অনুসারে**

পর্ব্বাঙ্গ বিভাগ করা যায়। 'একা দেখি কুলবধূ' এইটি পড়িতে গেলে 'এ' উচ্চারণের সময় বাগ্‌যন্ত্রের impulse বা ঝোঁকের আরম্ভ হয় এবং পর্ব্বও আরম্ভ হয়। সেই সময়ে স্বরের যেটুকু গাম্ভীর্য্য তাহা ক্রমশঃ কমিতে কমিতে 'খি' উচ্চারণের সময় সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়, তাহার পর 'কু' উচ্চারণের সময় আবার স্বরের গাম্ভীর্য্য বাড়িয়া 'ধূ' উচ্চারণের সময় সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। সেই সময়ে উচ্চারণ-প্রয়াসের কথঞ্চিৎ বিরতি ঘটে, নূতন ঝোঁকের জন্য নূতন করিয়া শক্তিসঞ্চার আবশ্যক হয়। সুতরাং ঐখানে পর্ব্বেরও শেষ হয়।

কিন্তু স্বরাঘাত বা একটা অতিরিক্ত জোর দিয়া যখন কবিতা পাঠ করা যায়, তখন স্বরগাম্ভীর্য্যের বৃদ্ধি শব্দের প্রথমে না হইয়া শেষেও হইতে পারে।

'যেথায় সুখে | তরুণ যুগল | পাগল হ'য়ে | বেড়ায়'

এইটি পাঠ করিতে গেলে দেখা যায় রেফ্‌-চিহ্নিত অক্ষরগুলি শব্দের শেষে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও স্বরাঘাতের প্রভাবে ঐ ঐ অক্ষরে স্বরগাম্ভীর্য্যের হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি হইয়াছে।

দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গ লইয়া একটি পর্ব্ব গঠিত হওয়ায় স্বর-গাম্ভীর্য্যের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য পর্ব্বের মধ্যে একরূপ স্পন্দন অনুভূত হয়। এই স্পন্দনটুকু ছন্দের প্রাণ। এই স্পন্দন থাকার জন্য পর্ব্ব কাব্যের উপকরণ এবং ভাবপ্রকাশের বাহন হইয়াছে, এবং শ্রবণমাত্র মনে আবেগের উৎপাদন ও রসের স্পৃহা আনয়ন করে।

মাত্রা (Mora)

[১৩] **বাংলা ছন্দের সমস্ত হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে। মাত্রার মূল তাৎপর্য্য duration বা কালপরিমাণ।** এক একটি অক্ষরের উচ্চারণে কি পরিমাণ সময় লাগে তদনুসারে মাত্রা স্থির করা হয়। কিন্তু মাত্রার এই মূল তাৎপর্য্য হইলেও সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ববিষয়ে যে শুদ্ধ কাল-পরিমাণ অনুসারে মাত্রার হিসাব করা হয়, তাহা নহে। বাস্তবিক, উচ্চারণের সময় বিভিন্ন অক্ষরের কালপরিমাণের নানারূপ বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ছন্দের মাত্রার হিসাবের সময় প্রতি অক্ষরের কালপরিমাণের সূক্ষ্ম বিচার করা হয় না। সাধারণতঃ হ্রস্ব বা একমাত্রার এবং দীর্ঘ বা দুইমাত্রার—এই দুই শ্রেণীর অক্ষর গণনা করা হয়। কখন কখন তিনমাত্রার অক্ষরও স্বীকার

করা হয়। কিন্তু সব দীর্ঘ বা হ্রস্ব অক্ষরের কালপরিমাণ যে এক, কিম্বা দীর্ঘ অক্ষর মাত্রেরই উচ্চারণে যে হ্রস্ব অক্ষরের ঠিক দ্বিগুণ সময় লাগে, তাহা নহে। নানা কারণে কোন কোন অক্ষরকে অপরাপর অক্ষর অপেক্ষা বড় বলিয়া বোধ হয়; তখন তাহাকে বলা হয় দীর্ঘ, এবং তাহার অনুপাতে অপরাপর অক্ষরকে বলা হয় হ্রস্ব।

সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় কোন্ অক্ষরের কত মাত্রা হইবে, তদ্বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট বিধি আছে। কিন্তু বাংলায় তত বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। অক্ষরের অবস্থান, ছন্দের প্রকৃতি ইত্যাদি অনুসারে অনেক সময় মাত্রা স্থির হয়। যদিও ছন্দে সাধারণ উচ্চারণের রীতির বিশেষ ব্যত্যয় করা চলে না, তত্রাচ ছন্দের খাতিরে একটু আধটু পরিবর্ত্তন করা চলে। আর, **মাত্রার দিক্ দিয়া বাংলা উচ্চারণের রীতিও একেবারে বাঁধা-ধরা নয়**। যাহা হউক, কোনরূপ সন্দেহ বা অনিশ্চিততার ক্ষেত্রে **ছন্দের আদর্শ (pattern) অনুসারেই শেষ পর্য্যন্ত অক্ষরের মাত্রা স্থির করিতে হয়**।

[১৪] মাত্রা বিচারের জন্য বাংলা অক্ষরের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে।
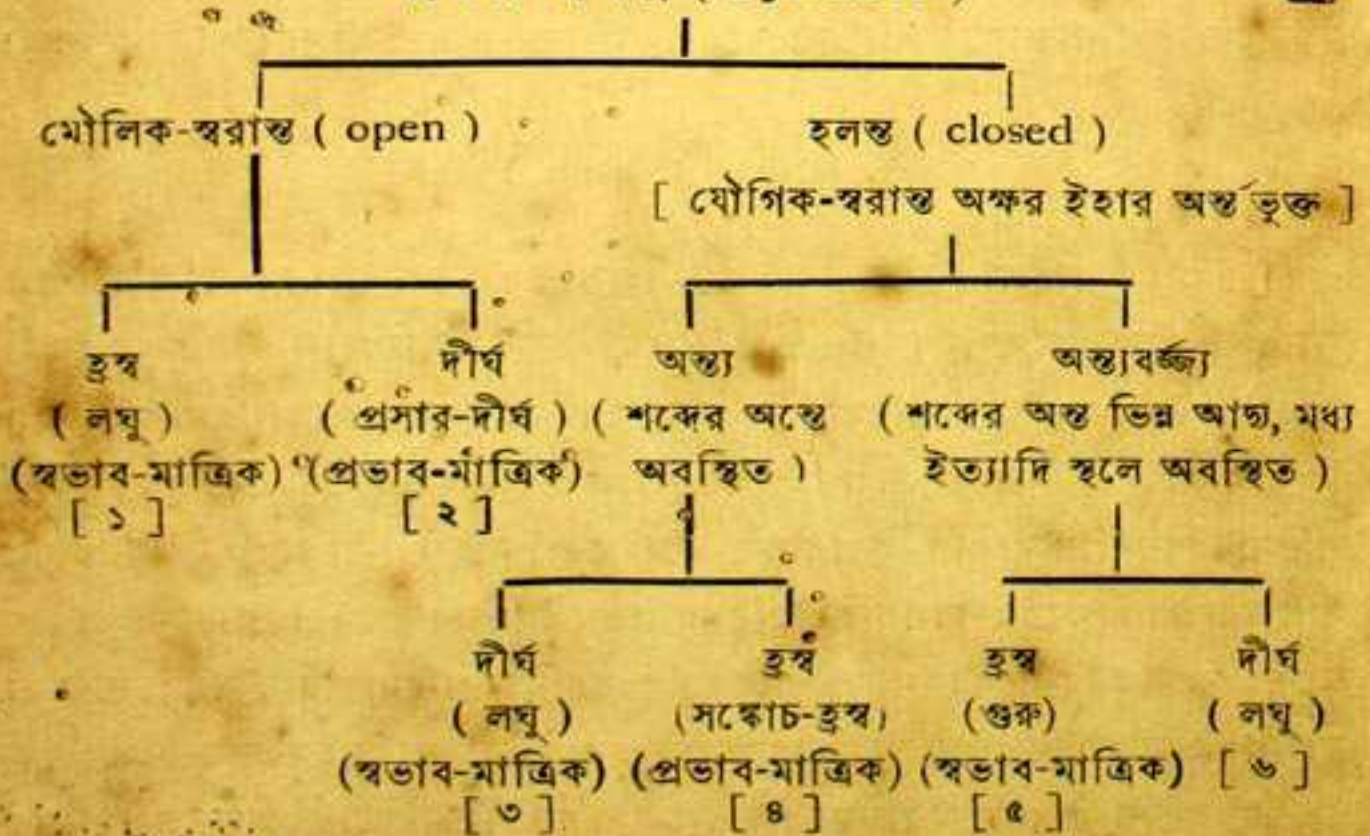
নিম্নে ইহাদের উদাহরণ দেওয়া হইল।

"ঈশানের পুঞ্জমেঘ | অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে।"

এই চরণে 'ঈ' 'শা' 'বে' 'গে' ইত্যাদি (১) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ অক্ষর স্বভাবতঃ হ্রস্ব, সুতরাং ইহাদের স্বভাবমাত্রিক বলা যাইতে পারে। উচ্চারণের সময় বাগ্‌যন্ত্রের বিশেষ কোন প্রয়াস হয় না বলিয়া ইহাদের "লঘু" বলা যাইতে পারে।

ঐ চরণে "নের" "মেঘ" ইত্যাদি (৩) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে ইহারা দীর্ঘ, সুতরাং ইহাদেরও স্বভাবমাত্রিক বলা যায়। এরূপ অক্ষর উচ্চারণের জন্যও বাগ্‌যন্ত্রের কোন বিশেষ প্রয়াস হয় না, সুতরাং ইহাদেরও "লঘু" বলা যায়।

ঐ চরণে 'পুঞ্জ' শব্দের 'পুঞ্', 'অন্ধ' শব্দের 'অন্' (৫) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ উচ্চারণরীতি অনুসারে ইহারা হ্রস্ব। সুতরাং ইহাদেরও স্বভাব-মাত্রিক বলা যায়। কিন্তু ইহাদের উচ্চারণের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের একটু বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক। এজন্য ইহাদের 'গুরু' বলা যাইতে পারে। লঘু অক্ষরের মত ইহাদের যদৃচ্ছ ব্যবহার করা যায় না, কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয় (এই বিধিনিষেধগুলি পরে উল্লেখ করা হইবে)।

"জন-গণ-মন-অধি- | -নায়ক জয় হে | ভারত-ভাগ্য-বি- | -ধাতা"

এই চরণটিতে 'না' 'হে' 'ভা' 'ধা' 'তা'—(২) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ অক্ষর স্বভাবতঃ দীর্ঘ নহে, অতিরিক্ত একটা টানের প্রভাবে ইহারা দীর্ঘ হয়। অক্ষরের স্বাভাবিক মাত্রার প্রসারণ হয় বলিয়া ইহাদের 'প্রসার-দীর্ঘ' বলা যায়। অতিরিক্ত একটা প্রভাবের দ্বারা ইহাদের মাত্রা নিরূপিত হয় বলিয়া ইহাদের 'প্রভাবমাত্রিক' বলা যাইতে পারে।

"এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো কৌতুক- | -ময়ি"

এই চরণটিতে 'কৌ', 'নিত্য' শব্দের 'নিত্' (৬) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরূপ অক্ষরের উচ্চারণ খুব সাধারণতঃ হয় না বটে, কিন্তু বাগ্‌যন্ত্রের কোন আয়াস হয় না বলিয়া এইরূপ উচ্চারণের প্রতি একটা প্রবণতা সর্ব্বদাই থাকে। উচ্চারণের দিক্ দিয়া ইহারাও লঘু।

"দেশে দেশে | খেলে বেড়ায় | কেউ করে না | মানা"

এই চরণটিতে 'ড়ায়্', 'কেউ' (৪) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরূপ অক্ষর স্বভাবতঃ হ্রস্ব নহে, কেবল অতিরিক্ত স্বরাঘাতের প্রভাবে ইহাদের মাত্রার সঙ্কোচন হয়। সুতরাং ইহাদিগকে 'সঙ্কোচ-হ্রস্ব' বলা যায়। একটা বিশেষ প্রভাবের দ্বারা ইহাদের মাত্রা নিরূপিত হয় বলিয়া ইহাদেরও 'প্রভাবমাত্রিক' বলা যাইতে পারে।

বাংলায় যে স্বাভাবিক উচ্চারণরীতি প্রচলিত, সাধারণতঃ গদ্যে আমরা যে রূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি, তদনুসারে (১), (৩) ও (৫) এই কয় শ্রেণীর অক্ষরই পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাদের স্বভাবমাত্রিক বলা হইয়াছে। পয়ারজাতীয় ছন্দোবন্ধে সমস্ত অক্ষরই প্রায়শঃ স্বভাবমাত্রিক হয়। কদাচ অন্যথাও দেখা যায়। উদাহরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে (৫) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ স্বাভাবিক হইলেও একটু আয়াস-সাধ্য বা গুরু।

(১), (৩) ও (৬) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের কোন আয়াস আবশ্যক হয় না। এইরূপ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য সর্ব্বদাই একটা প্রবণতা থাকে। ইহাদের এইজন্য 'লঘু' নাম দেওয়া হইয়াছে।

(২) ও (৪) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ কেবলমাত্র একটা বিশেষ প্রভাবের জন্যই সম্ভব। মাত্রার পার্থক্য থাকিলেও উভয়ই সাধারণ উচ্চারণের ব্যভিচারী বলিয়া তাহাদের 'প্রভাবমাত্রিক' বলিয়া এক বিশিষ্ট শ্রেণীতে ফেলা যায়। ইহাদের ব্যবহার অতি সতর্কতার সহিত করিতে হয়।

[১৫] একটি হ্রস্ব স্বর বা হ্রস্বস্বরান্ত অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাই এক মাত্রার পরিমাণ। এক একটি দীর্ঘ অক্ষরকে দুই মাত্রার সমান বলিয়া ধরা হয়।

সাধারণতঃ হ্রস্বাক্ষর নির্দ্দেশের জন্য অক্ষরের উপর [ᴗ] চিহ্ন, এবং দীর্ঘাক্ষর নির্দ্দেশের জন্য অক্ষরের উপর [—] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে। সময়ে সময়ে বাংলা ছন্দে অক্ষরের বিশেষ প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য অক্ষরের উপর (॰) চিহ্নদ্বারা স্বরান্ত হ্রস্বাক্ষর, (॥) চিহ্নদ্বারা স্বরান্ত দীর্ঘ অক্ষর, (ᴗ) চিহ্নদ্বারা হলন্ত গুরু অক্ষর, (´) চিহ্নদ্বারা স্বরাঘাতযুক্ত অক্ষর, (—) চিহ্নদ্বারা হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর নির্দ্দেশ করা হইবে।

[১৬] বাংলায় সমস্ত মৌলিক স্বরই হ্রস্ব। সুতরাং **মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর মাত্রেই সাধারণতঃ একমাত্রিক বলিয়া গণ্য হয়। স্থান-বিশেষে কিন্তু মৌলিক দীর্ঘস্বরান্ত অক্ষরও দেখা যায়।**

যথা—[ক] অনুকারধ্বনি-সূচক, আবেগ-সূচক বা সম্বোধক একাক্ষর শব্দের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

যেমন—

হী হী শবদে | অটবী পূরিছে (হেমচন্দ্র, ছায়াময়ী)

বল ছিন্ন বীণে | বল উচ্চৈঃস্বরে

না - না - না | মানবের তরে (কামিনী রায়)

রে সতি রে সতি | কাঁদিল পশুপতি (হেমচন্দ্র, দশমহাবিদ্যা)

[খ] যে শব্দের শেষের কোন অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার অন্তে স্বর থাকিলে সেই স্বর দীর্ঘ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

নাচ ত সীতারাম | কাঁকাল বেঁকিয়ে (ছড়া)

[গ] সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কৃত মতে দীর্ঘ, তাহা আবশ্যক মত দীর্ঘ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে—

ভীত-বদনা | পৃথিবী হেরিছে (হেমচন্দ্র)

আসিল যত | বীর-বৃন্দ | আসন তব | ঘেরি (রবীন্দ্রনাথ)

এইরূপ ক্ষেত্রে যে সর্ব্বদাই অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া ধরিতে হইবে, এমন নয়; তবে ইহাদিগকে আবশ্যক-মত দীর্ঘ করা চলে, এবং করা হইয়াও থাকে।

[ঘ] ছন্দের আবশ্যকতা অনুসারে অন্যান্য স্থলেও মৌলিকস্বরান্ত অক্ষর দীর্ঘ ধরা যায়।

[১৬ক] স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ সম্পর্কে কতকগুলি বিধি-নিষেধ আছে।

(অ) কোন পর্ব্বাঙ্গে একাধিক স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ হইবে না।

(২১চ সূত্রের সহিত তুলনীয়)

এরূপ অক্ষর উচ্চারণের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক। ধ্বনি-প্রবাহের ক্ষুদ্রতম তরঙ্গে বা পর্ব্বাঙ্গে গতির সারল্য বজায় রাখিতে হয় বলিয়া একাধিক এরূপ অক্ষরের ব্যবহার হয় না।

নারদ : ঘনঘর | কম্পিত : থরথর | বিশ্ববি- : দারণ | হুঙ্কার : শ্রবণে ||

(হেমচন্দ্র—দশমহাবিদ্যা)

প : ঞ্জাব : সিন্ধু | গুজরাট : মরাঠা | দ্রাবিড় : উৎকল | বঙ্গ

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এই দুইটি চরণে প্রভাবদীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে, এবং তৎসম শব্দেরও যথেষ্ট ব্যবহারের জন্য সংস্কৃতমতে উচ্চারণের প্রবৃত্তি আসিতেছে, কিন্তু কোন পর্ব্বাঙ্গেই একাধিক প্রসারদীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার নাই। সংস্কৃত রীতি অনুসারে 'হুঙ্কারে'র 'কা' দীর্ঘ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাংলা ছন্দের রীতি অনুসারে উহার প্রসারণ হয় নাই। সেইরূপ 'গুজরাটের' 'রা' এবং 'মরাঠা'র 'রা' কাহারও প্রসারণ হয় নাই। যদি দ্বিতীয় পংক্তিটির রূপ

পঞ্জাব সিন্ধু | গারো : ঢাকা | ......

এই ধরণের করার চেষ্টা হইত, তবে দ্বিতীয় পর্ব্বে ছন্দপতন হইত।

এই জন্য গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'যমুনা-লহরী' কবিতাটির

কত শত : সুন্দর, | নগরী : তীরে | রাজিছে : তটযুগ | ভূষি ও

—এই চরণটিতে দ্বিতীয় পর্ব্বটির উচ্চারণ বাংলা ছন্দোরীতির বিরোধী হইয়াছে মনে হয়। কিন্তু—

কত শত : সুন্দর | নগরী : উভতটে | ......

এইরূপ লিখিলে বাংলা ছন্দের রীতির বিরোধী হইত না।

যে সব ক্ষেত্রে মনে হয় যে এই রীতির লঙ্ঘন করিয়াও ছন্দ ঠিক আছে,

সেখানে দেখা যাইবে যে দীর্ঘীকৃত অক্ষর দুইটি দুই বিভিন্ন পর্ব্বাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ; যেমন

তব শুভ : না : মে | জা : গে =(৪+২+২)+(২+২)

তব শুভ : আশীষ | মা : গে =(৪+৪)+(২+২)

গা : হে : তব জয় | গা : থা =(২+২+৪)+(২+২)

(আশীষ শব্দের 'শী' সংস্কৃত মতে দীর্ঘস্বরান্ত হইয়াও যে এখানে হ্রস্ব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ইহা লক্ষণীয়)

'যমুনা লহরী' হইতে যে চরণটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় পর্ব্বটির

"নগরী : তী : রে"

এইরূপ পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগ করিলেও সুশ্রাব্য হয় না। এ ক্ষেত্রে আর একটি নিষেধ স্মরণ রাখিতে হইবে—

(আ) কোন পর্ব্বেই উপর্যুপরি দুইটীর বেশী অক্ষরের প্রসারণ হইবে না।

(স্বরাঘাতও একই পর্ব্বে উপর্য্যুপরি দুইটির বেশী অক্ষরে পড়িতে পারে না) এই জন্য যাঁহারা সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা অনেক সময়ই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ 'পজ্ঝটিকা' ছন্দের কথা বলা যাইতে পারে। ব্যঙ্গোদ্দেশ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল এই ছন্দে 'কর্ণবিমর্দ্দন-কাহিনী' বলিয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহাতেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 'পজ্ঝটিকা' ছন্দ মাত্রাসমকজাতীয় বলিয়া বাংলা ছন্দের পর্ব্বপর্ব্বাঙ্গ বিভাগের সহিত ইহার গঠনের সাদৃশ্য আছে ; সেই কারণে ঐ কবিতাটির কতকগুলি চরণের বাংলা ছন্দের রীতির সহিত বেশ সামঞ্জস্য হইয়াছে ; যথা—

হজুর হজুর বলি | জীবন : মরণে

কর্ণ বি : -মর্দ্দন | মর্ম্ম কি : পূ : চ

ইত্যাদি চরণে স্থানে স্থানে সাধারণ বাংলা উচ্চারণের কিছু ব্যত্যয় হইলেও

বাংলা ছন্দের রীতি বজায় আছে। কিন্তু অপরাপর স্থলে বাংলা ছন্দের রীতির সহিত একান্ত বিরোধ ঘটিয়াছে ; যেমন—

জা নো : না কি ক | দাচন : মূঢ়
এ কে : বা রে | মা থা : ঘো রে

স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ যে কেবলমাত্র তৎসম শব্দে হয় তাহা নহে। ভারতচন্দ্রের—

(কত) নিশান ফরফর | নিনাদ ধরধর | কামান গরগর | গাজে।
(সব) জুবান রজপুত | পাঠান মজবুত | কামান শরযুত | সাজে।

প্রভৃতি চরণ হইতেই তাহা প্রতীত হইবে। এখানে জুবান, পাঠান, কামান, নিশান কোনটিই তৎসম শব্দ নহে।

সংস্কৃতিগন্ধি ছন্দোবন্ধেও সংস্কৃতমতে দীর্ঘ অক্ষরের প্রসারণ পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ গঠনের আবশ্যকতা মতেই হইয়া থাকে। যথা,

তুষ্টি নি : কেতন | রিষ্টি বি : নাশক | সৃষ্টি : পালন : লয় | কারী (ঈশ্বর গুপ্ত)

বাংলা উচ্চারণ ও ছন্দের রীতি অনুসারে 'পা' ও 'রী' সংস্কৃত মতে দীর্ঘ হইয়াও হ্রস্ব উচ্চারিত হইতেছে।

তদ্রূপ,

চীন গগন হতে | পূর্ব্ব গগন স্রোতে | শ্যামল রসধর | পুঞ্জ (রবীন্দ্রনাথ)

শ্বাপদ হৃদি ক্রুর | শার্দ্দূল কুক্কুর | লোল রসনঃ তুলি | সিন্ধুতে ভাসিছে (হেমচন্দ্র)

উদ্ধৃত চরণগুলিতে যে যে অক্ষরের নীচে × চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে সেগুলি সংস্কৃতমতে দীর্ঘ হইয়াও হ্রস্ব উচ্চারিত হইতেছে। অথচ, অনুরূপ অনেক অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণও ঐ ঐ চরণেই হইতেছে।

(ই) কোন পর্ব্বাঙ্গে প্রসারদীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার হইলে, অপরাপর অক্ষরগুলি লঘু হইবে।

পূর্ব্বে যে উদাহরণগুলি দেওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই ইহার যাথার্থ্য প্রতীত হইবে।

(ঈ) কোন পর্ব্বাঙ্গে স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ করিতে হইলে, পর্ব্বাঙ্গের আদ্য অক্ষরকেই, যোগ্য হইলে, সর্ব্বোপযুক্ত স্থল বিবেচনা করিতে হইবে; নতুবা, পর্ব্বাঙ্গের অন্ত্য অক্ষরের এবং তাহাও উপযুক্ত না হইলে, কোন মধ্য অক্ষরের প্রসারণ হইবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে প্রসারদীর্ঘ অক্ষরটি পর্ব্বাঙ্গের আদ্য অক্ষর। (প্রসারণের পক্ষে কোন কোন অক্ষরের যোগ্যতা অধিক তাহা ২৯ সং সূত্রে বলা হইয়াছে)

ভীমা লম্বোদরা | ব্যাঘ্র চর্ম্মপরা | ...... (দশমহাবিদ্যা)

এই চরণের প্রথম পর্ব্বের প্রথম পর্ব্বাঙ্গ 'ভীমা'য় দুইটি অক্ষরই সংস্কৃতমতে দীর্ঘ; কিন্তু দ্বিতীয়টির প্রসারণ না করিয়া প্রথমটিকে করিতে হইবে।

পঞ্জাব সিন্ধু | গুজরাট মরাঠা | ......

এই চরণের দ্বিতীয় পর্ব্বের দ্বিতীয় পর্ব্বাঙ্গে 'রা,' 'ঠা' দুইটি অক্ষরের শেষেই আ-কার আছে; কিন্তু 'রা' অক্ষরটির প্রসারণ না করিয়া 'ঠা' অক্ষরটির প্রসারণ করিতে হইবে।

সুচারু মনোহর | হের নিকটে তার | অন্য ভুবন কিবা | ......(দশমহাবিদ্যা)

এই চরণের প্রথম পর্ব্বের প্রথম পর্ব্বাঙ্গে মধ্যের অক্ষরটির প্রসারণ হইয়াছে, কারণ সংস্কৃতমতে দীর্ঘস্বরান্ত অক্ষর বলিয়া হ্রস্বস্বরান্ত প্রথম ও অন্ত্য অক্ষর (সু, রু) অপেক্ষা ইহার প্রসারণের যোগ্যতা অধিক।

কোন কোন স্থলে কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। **যদি সন্নিহিত কতকগুলি পর্ব্বাঙ্গে বা পর্ব্বে একই স্থলে প্রসারদীর্ঘ অক্ষর থাকে, তবে ছন্দের প্রবাহের গতি সমান রাখার জন্য কখন কখন উল্লিখিত উপযোগিতার ক্রম লঙ্ঘন করা হয়।**

নিশান ফরফর | নিনাদ ধরধর | কামান গরগর | গাজে

জুবান রজপুত | পাঠান মজবুত | কামান শরযুত | সাজে

প্রথম চরণের প্রথম দুই পর্ব্বে দ্বিতীয় অক্ষরের প্রসারণ হইয়াছে বলিয়া, তৃতীয় পর্ব্বে-ও তাহা করা হইয়াছে, যদিও তৃতীয় পর্ব্বের প্রথম অক্ষরের যোগ্যতা কম ছিল না। দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্বেও ঐরূপ হইয়াছে।

[১৭] হলন্ত ও যৌগিকস্বরান্ত অক্ষরের ব্যাপার অন্যবিধ। ইহারা স্বভাবতঃ মৌলিকস্বরান্ত অক্ষর অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ। কারণ হলন্ত অক্ষরের অন্তর্গত স্বরের উচ্চারণের পরও শেষ ব্যঞ্জনবর্ণটি উচ্চারণ করিতে কিছু সময় বেশী লাগে; তেমনি যৌগিক স্বরে একটি প্রধান বা পূর্ণ (syllabic) স্বরের পরে একটি অপ্রধান বা অপূর্ণ স্বর থাকে, এবং সেই অপ্রধান (non-syllabic) স্বরটি উচ্চারণের জন্য কিছু বেশী সময় লাগে। এই জন্য হলন্ত ও যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষরের নাম দেওয়া যাইতে পারে, **যৌগিক অক্ষর। ছন্দের মধ্যে ব্যবহার করিতে গেলে, তাহাদিগকে, হয়, এক মাত্রার, নয়, দুই মাত্রার বলিয়া ধরিতে হইবে**; অর্থাৎ হয়, কিছু দ্রুত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে হ্রস্ব করিয়া লইতে হইবে, না হয়, কিছু বিলম্বিত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে দীর্ঘ করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু **শব্দের অন্ত্য হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরাই সাধারণ রীতি**; যথা—'রাখাল' 'গরুর' 'পাল' এই তিনটি শব্দ যথাক্রমে ৩, ৩ ও ২ মাত্রার বলিয়া গণ্য হয়। কেবল যখন কোন অন্ত্য হলন্ত অক্ষরের উপর প্রবল স্বরাঘাত পড়ে, তখন স্বরাঘাতের প্রভাবে ইহা হ্রস্ব (প্রভাব-হ্রস্ব) হয়।

(১৪ সং ও ২১ সং সূত্র দ্রষ্টব্য)

শব্দের অন্ত ভিন্ন অন্যান্য স্থলে অর্থাৎ শব্দের আদি বা মধ্য প্রভৃতি স্থলে অবস্থিত হলন্ত অক্ষরকে সাধারণতঃ হ্রস্ব উচ্চারণ করা হয়। এরূপ উচ্চারণের জন্য একটু আয়াস হয় বলিয়া ইহাদের "গুরু" অক্ষর বলা যাইতে পারে।

একটু বিলম্বিত লয়ে উচ্চারণ করিলে শব্দের আদি বা মধ্যে অবস্থিত হলন্ত অক্ষরও দীর্ঘ হয়। এরূপ উচ্চারণ খুব অনায়াসসাধ্য এবং ইহার প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। এরূপ উচ্চারণ-স্থলে হলন্ত অক্ষরকে 'লঘু' অক্ষর বলা যাইতে পারে। (১৪ সং সূত্র দ্রষ্টব্য)

[১৮] **কোন পর্ব্বাঙ্গে গুরু অক্ষর (হলন্ত হ্রস্ব অক্ষর) থাকিলে, সেই পর্ব্বাঙ্গের শেষ অক্ষরটি সাধারণতঃ লঘু হয়।**

কখন কখন অবশ্য শেষ অক্ষরটিতে স্বরাঘাত পড়ে, সে ক্ষেত্রে কোন অক্ষরই লঘু না হইতেও পারে।

পূর্ব্বে (১২ সূত্র) বলা হইয়াছে যে স্বরগাম্ভীর্য্যের উত্থান পতন অনুসারে পর্ব্বাঙ্গের বিভাগ বোঝা যায়। সাধারণতঃ পর্ব্বাঙ্গের শেষে স্বরগাম্ভীর্য্যের পতন হয় সুতরাং গুরু অক্ষরের উচ্চারণের জন্য যে প্রয়াস আবশ্যক তাহা সম্ভব হয় না।

কিন্তু পর্ব্বাঙ্গের শেষ অক্ষরটিতে স্বরাঘাত দিয়াও পর্ব্বাঙ্গের বিভাগ সূচিত হইতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে পর্ব্বাঙ্গের শেষে গাম্ভীর্য্যের উত্থান হয়, স্বরাঘাত-যুক্ত অক্ষরটি তীব্রতায় ও গাম্ভীর্য্যে অন্যান্য অক্ষরগুলিকে ছাপাইয়া উঠে। কিন্তু যদি পর্ব্বাঙ্গের শেষে স্বরাঘাতের জন্য ধ্বনির গতির উত্থান না হয়, তবে পতন হইবেই। এই জন্যই পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে সব কয়েকটি অক্ষরই গুরু হয় না।

যে পর্ব্বাঙ্গে গুরু অক্ষরের ব্যবহার আছে তাহার কোন অক্ষরই প্রসারদীর্ঘ হয় না।

উদাহরণ—

সশঙ্ক : লঙ্কেশ : শূর | স্মরিলা : শঙ্করে (মধুসূদন)

দুর্দ্দান্ত : পাণ্ডিত্য : পূর্ণ | দুঃসাধ্য : সিদ্ধান্ত (রবীন্দ্রনাথ)

প্রাতঃস্নাত : স্নিগ্ধচ্ছবি | আর্দ্র : সিক্ত : যূথী (রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু—

ভগ্ন : স্তূপের | জীর্ণ : মঞ্চের | সুপ্ত : ছায়া | জুড়ে (বিজয় মজুমদার)

মায়ের : স্নেহ | অন্তর্ : যামী | তার : কাছে ত | রয় না : কিছুই | ঢাকা (রবীন্দ্রনাথ)

স্বরাঘাত (Stress)

[১৯] পূর্ব্বে স্বর-গাম্ভীর্য্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রত্যেক শব্দের প্রথমে যে স্বরের গাম্ভীর্য্য স্বভাবতঃ কিছু অধিক হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত প্রায়ই দেখা যায় যে, এক একটি বাক্যাংশের কোন একটি বিশেষ অক্ষরের স্বর-গাম্ভীর্য্য পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত অক্ষরকে অতি স্পষ্টরূপে ছাপাইয়া উঠে। এইরূপ স্বর-গাম্ভীর্য্যের বৃদ্ধির নাম **স্বরাঘাত** বা **শ্বাসাঘাত**।

ভারতীয় সঙ্গীতের তালের সম বা আঘাত ইহারই প্রতিরূপ।

সাধারণ উচ্চারণের পদ্ধতির অতিরিক্ত একটা বিশেষ জোর দিয়া উচ্চারণের জন্যই এইরূপ স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত অনুভূত হয়।

/ / / /
"রাত পোহালো | ফর্‌সা হ'ল | ফুট্‌ল কত | ফুল"

/ / / / /
"কোন্ হাটে তুই | বিকোতে চাস্ | ওরে আমার | গান"

প্রভৃতি চরণে যে যে অক্ষরের উপর / চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত পড়িয়াছে। এ ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত অক্ষরকে অতিরিক্ত একটা জোর দিয়া পড়া হইতেছে, সর্ব্বদাই যে ঐরূপ ভাবে পড়া হয় তাহা নয়।

[২০] বাংলা ছন্দে অক্ষরের মাত্রা এবং ছন্দোবন্ধের প্রকৃতি স্বরাঘাতের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। 'পঞ্চনদীর' এই শব্দটির মোট মাত্রাসংখ্যা ৬, কি ৫, কি ৪ হইবে তাহা নির্ভর করে স্বরাঘাতের উপর। রবীন্দ্রনাথের বলাকার 'শঙ্খ' কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক মোটামুটি সাধু ভাষায় রচিত এবং অর্থসম্পদে গুরুগম্ভীর হইলেও স্বরাঘাতের প্রাবল্যের জন্য ইহাতে একটা বিশেষ রকমের ছন্দঃস্পন্দন অনুভূত হয় এবং ভাবের দিক্ দিয়া ইহার আবেদনও অন্যরূপ হয়।

[২০ ক] **স্বরাঘাত পড়িলে বাগ্‌যন্ত্রের গতি ক্ষিপ্র হয়, সুতরাং দ্রুত লয়ে উচ্চারণ করিতে হয়।**

[২০ খ] **স্বরাঘাত হলন্ত বা যৌগিক অক্ষরের (closed syllable) উপরই পড়ে ; স্বরান্ত অক্ষরের (open syllable) উপর**

স্বরাঘাত পড়িলে সেই স্বরটি একটু টানিয়া যৌগিক অক্ষরের সমান করিয়া লইতে হইবে।

রাত পোহালো | ফর্সা হ'ল | ফুটল কত | ফুল (দীনবন্ধু)

সকল তর্ক | হেলায় তুচ্ছ | ক'রে (রবীন্দ্রনাথ—বলাকা—নবীন)

উপরের পংক্তি দুইটিতে যে যে অক্ষরের উপর রেফ্ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানেই স্বরাঘাত পড়িয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে ঐ স্বরাঘাতযুক্ত অক্ষর সবগুলিই যৌগিক (closed)।

খিন্তা খিনা | পাকা নোনা (গ্রাম্য ছড়া)

রঙ্ যে ফুটে | ওঠে কতো
প্রাণের ব্যাকু | লতার মতো (রবীন্দ্রনাথ—খেয়া—ফুল ফোটানো)

এইরূপ ক্ষেত্রে স্বরাঘাতের অনুরোধে 'পাকা' শব্দটিকে 'পাকা-া' এবং 'ওঠে' শব্দটিকে 'ওঠে-ে' এইরূপ উচ্চারণ করিতে হয়।

[২০ গ] **স্বরাঘাতযুক্ত হইলে যে কোন যৌগিক অক্ষরের হ্রস্বীকরণ হয়।** স্বরাঘাতযুক্ত যৌগিক অক্ষর শব্দের অন্ত্য অক্ষর হইলেও তাহার হ্রস্বীকরণ হইবে। স্বরাঘাতের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সঙ্কোচন ও দ্রুতলয়ে উচ্চারণের জন্যই এইরূপ হয়। সুতরাং

সব পেয়েছির্ | দেশে কারো | নাই রে কোঠা | বাড়ি (রবীন্দ্রনাথ)

এই পংক্তিতে রেফ্‌সংযুক্ত প্রত্যেকটি অক্ষরই এক মাত্রার। স্বরাঘাত না থাকিলে এরূপ হওয়া সম্ভব হইত না।

[২০ ঘ] স্বরাঘাতযুক্ত যৌগিক অক্ষরের অব্যবহিত পরের অক্ষরটি যদি মাত্র একটি স্বরবর্ণ দিয়া গঠিত হয়, তবে কখন কখন এই স্বরবর্ণের মাত্রা-লোপ (elision) হয়। স্বরবর্ণটি তখন দ্রুতলয়ে উচ্চারণের জন্য মাত্র একটি স্পর্শ-স্বরে (vowel-glide) পর্য্যবসিত হয়।

যে রক্ত | খেয়েছি আমি | বার বৎসর | আগে (প্রাচীন গীতিকথা)

সাহেবেরা সব | গেরুয়া পর্চ্ছে | বাঙালী নেক্‌টাই | হ্যাট্‌ কোট্‌টা

(দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান)

গাচ্ছে এমনি | তালকানা যে | শুনে ত পীলে | চমকাচ্ছে

(দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান)

এ সমস্ত ক্ষেত্রে—

খেয়েছি আমি = খেয়্‌ + (এ) + ছি আমি

সাহেবেরা সব = সাহেব্‌ + (এ) + রা সব্‌

বাঙালী নেক্‌টাই = বাঙ্‌ + (আ) + লী নেক্‌টাই

শুনে তা পীলে = শুন্‌ + (এ) + তা পীলে

কিন্তু উৎকৃষ্ট ছন্দোবন্ধে এরূপ স্পর্শস্বর ও অস্পষ্ট উচ্চারণ লক্ষিত হয় না।

(২০ ঙ) স্বরাঘাতের প্রভাবে একই পর্ব্বাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত অক্ষরের পরস্পরের মধ্যে ছন্দঃসন্ধি (metrical liasion) ঘটে। এইজন্য

তালপাতার ঐ | পুঁথির ভিতর | ধর্ম্ম আছে | বল্‌লে কে (করুণানিধান—পিতা স্বর্গ)

এক পয়সায় | কিনেছে ও | তালপাতার এক | বাঁশী (রবীন্দ্রনাথ—সুখ দুঃখ)

গঙ্গারাম ত | কেবল ভোগে

পিলের জ্বর আর | পাণ্ডুরোগে (সুকুমার রায়—আবোল্‌ তাবোল্‌)

এই সব ক্ষেত্রে—

তাল পাতার ঐ = তাল্‌ পা : তারৈ

তালপাতার এক = তাল্‌ পা : তারেক্‌

পিলের জ্বর আর = পিলের্‌ : জ্বরার্‌

এই কারণেই—

ডাল ভাতে ভাত | চড়িয়ে দেনা (গ্রাম্য ছড়া)

জীর্ণ জরা | ঝরিয়ে দিয়ে | প্রাণ অফুরান | ছড়িয়ে দেদার | দিবি

(রবীন্দ্রনাথ—বলাকা—নবীন)

এই সব ক্ষেত্রে—চড়িয়ে = চড়্যো ; ঝরিয়ে = ঝর্যো ; ছড়িয়ে = ছড়্যো।

সেইরূপ ২০ (ঘ)র নিম্নের উদাহরণে

গেরুয়া = গের্ + উয়া (উয়া একত্রে একটি যৌগিক স্বর)

(২০ চ) স্বরাঘাতের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের উপর প্রবল চাপ পড়ে বলিয়া একবার স্বরাঘাতের পরই বাগ্‌যন্ত্রের কিছু আরামের আবশ্যকতা হয়। সুতরাং **উপর্যুপরি অক্ষরে কখনও স্বরাঘাত পড়িতে পারে না। স্বরাঘাত-যুক্ত দুইটি অক্ষরের মধ্যে অন্ততঃ একটি যতির (পূর্ণযতি বা অর্দ্ধযতি) ব্যবধান থাকা আবশ্যক। [একই পর্ব্বাঙ্গে একাধিক স্বরাঘাতও পড়িতে পারে না।** কারণ, প্রতি পর্ব্বাঙ্গে স্বরগাম্ভীর্য্যের একটা সুনিরূপিত উত্থান বা পতনের গতি থাকে, এবং সেই গতির প্রারম্ভ বা উপসংহার অনুসারেই পর্ব্বাঙ্গের বিভাগ ও স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি হয়। দুইটি স্বরাঘাত একই পর্ব্বাঙ্গে থাকিলে এই গতির প্রবাহ একমুখী থাকিবে না, স্বরগাম্ভীর্য্যের পতনের পর আবার উত্থান হইবে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পর্ব্বাঙ্গের প্রারম্ভ হইল এইরূপ বোধ হইবে।]

অধিকন্তু, **পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে স্বরাঘাতের পরবর্ত্তী অক্ষরটি লঘু হওয়া আবশ্যক।**

অর্দ্ধযতির ব্যবধান থাকিলেও একটি স্বরাঘাতের পরই আর একটি স্বরাঘাত না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শঙ্খ পরা | গৌর হাতে | ঘৃতের দীপটি | তুলে ধর

এখানে তৃতীয় পর্ব্বটি তত সুশ্রাব্য হয় নাই। 'দীপটি ঘৃতের' লিখিলে ভাল হইত।

(২০ ছ) স্বরাঘাতের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের যে তীব্র আন্দোলন হয় তজ্জন্য স্বরাঘাতের পৌনঃপুনিকতা স্বাভাবিক।

সুতরাং **স্বরাঘাত সন্নিহিত পর্ব্বে বা সন্নিহিত পর্ব্বাঙ্গে অন্ততঃ একাধিক সংখ্যায় পড়িবে।**

(২০ জ) স্বরাঘাতের জন্য অতি দ্রুত লয়ে উচ্চারণ এবং বাগ্‌যন্ত্রের ক্ষিপ্র সঙ্কোচন হয় বলিয়া, বাংলায় **স্বরাঘাত প্রধান ছন্দোবন্ধে হ্রস্বতম পর্ব্ব অর্থাৎ ৪ মাত্রার পর্ব্ব, এবং প্রতি পর্ব্বে ন্যূনতম পর্ব্বাঙ্গ অর্থাৎ ২টি মাত্র পর্ব্বাঙ্গ থাকে।**

এই রীতি অনুসারে স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের নিম্নলিখিত কয়েকটি বোল্ নির্ণয় করা যায়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে বাংলার ও সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলের ছড়ায়, লোকসঙ্গীতের বাদ্যে ও নৃত্যে এই বোলেরই অনুসরণ করা হয়।

/ • • / / • • / / • • / /
(ক) গিজ্ তা : গিজোড়্ | গিজ্ তা : গিজোড়্ | গিজ্ তা : গিজোড়্ | গাঃ

/ • • / / • • / / • • / /
বা লাক্ চ : ড়া চড়্ | লাক চ : ড়া চড়্ | লাক্ চ : ড়া চড়্ | চড়্

/ — / / — / / — / /
(কক) লাক্ চড়্ চড়্ | লাক্ চড়্ চড়্ | লাক্ চড়্ চড়্ | চড়্

• / • / • / • /
(খ) নারদ্ : নারদ্ | নারদ্ : নারদ্

• / • / • / • / • / • / /
বা, দিপির : দিপাং | দিপির : দিপাং | দিপির : দিপাং | তাং

/• /• /• /•
(গ) লক্কা : ফক্কা | লক্কা : ফক্কা

• / /• • / / •
(গগ) গিজোড়্ : গিজ্ তা | গিজোড়্ : গিজ্ তা

এই কয়টি উদাহরণে প্রতি পর্ব্বেই ২টি করিয়া আঘাত পড়িয়াছে। এক পর্ব্বে একটি করিয়া আঘাতও পড়িতে পারে, যথা—

/• •• /• ••
(ঘ) টক্কা : টরে | টক্কা : টরে

/• •• /• ••
বা, লেজ্জা : বাবু | দোদ্দো : আনা | (১ম অক্ষরে আঘাত)

•/ •• •/ •• •/ •• /
(ঙ) তুতুর : তুয়া | তুতুর : তুয়া | তুতুর : তুয়া | তু (২য় অক্ষরে আঘাত)

• • / • • • / • • • • / • • • / •
(চ) তেটে : ধিন্ না | কেটে : ধিন্ ধা ; বা, টরে টক্কা | টরে টক্কা (৩য় অক্ষরে আঘাত)

• • • / • • • /
(ছ) তাতা : তা ধিন্ | ধাধা : তা ধিন্ (৪র্থ অক্ষরে আঘাত)

• • • / • • • /
যথা—কতো : যে ফুল্ | কত : আকুল (রবীন্দ্রনাথ—ক্ষণিকা, কল্যাণী)

বাস্তবিক পক্ষে (চ) ও (ছ) জাতীয় পর্ব্বে দেখা যাইবে যে প্রথম পর্ব্বাঙ্গেও একটি স্বরাঘাত পড়িতেছে। পড়িবার সময়—

কতো-৫ । যে ফুল্ | কতো-৫ । আকুল

এইরূপ পাঠ হইবে।

সুতরাং (ছ) বাস্তবিক (থ), এবং (চ) বাস্তবিক (গগ) জাতীয় পর্ব্ব হইয়া দাঁড়াইবে।

(২০ঝ) স্বরাঘাতের পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরটি গুরু (হলন্ত হ্রস্ব) হইতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে ছন্দ-সৌষম্যের রীতি বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। এইজন্য

মঞ্জীর : বাজে | সোনার : পায়ে

ভাল শুনায় না ; কিন্তু

অনেক : বাক্য | হানা : হানি
তর্জ্জন : গর্জ্জন | অনেক : খানি

চলিতে পারে।

বাংলা ছন্দের সূত্র

[২১] **বাংলা ছন্দের এক একটী পর্ব্বে কয়েকটি গোটা মূল শব্দ থাকা আবশ্যক।** একটি মূল শব্দকে ভাঙিয়া দুইটি পর্ব্বের মধ্যে দেওয়া চলে না। এই জন্য

কত না অর্থ, কত অনর্থ, আবিল করিছে স্বর্গমর্ত্ত্য (নগরসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথ)

এই পংক্তিটি পাঁচ মাত্রার পর্ব্বে রচিত মনে করিয়া

কত না অর্থ, | কত অনর্থ, | আবিল করি | ছে স্বর্গমর্ত্ত্য

এই ভাবে ছন্দোলিপি করা যায় না।

এই কারণেই নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলিতে ছন্দঃপতন হইয়াছে।

পথিমাঝে দুষ্ট যব | নের হাতে পড়িয়া (হেমচন্দ্র—বীরবাহু কাব্য)
বলি বীরবর প্রম | দার কর ধরিল ঐ

কেবল মাত্র দুই একটি স্থলে এই রীতির ব্যত্যয় হইতে পারে—

[ক] যেখানে চরণের শেষ পর্ব্বটি অপূর্ণ (catalectic) এবং উপান্ত পর্ব্বেরই অতিরিক্ত অংশ বলিয়া মনে হয় ;—

ঘুম যাবে সে | দুধের ফেনা | ফুলের বিছা | নায় (কয়াধু, সত্যেন্দ্র দত্ত)

কোথায় শিপ্রা | ভুলেছ' ভায় | মাধবীর সৌ | রভে (দুর্ব্বাসা, কালিদাস রায়)

রেলগাড়ী ধায় ; | হেরিলাম হায় | নামিয়া বর্দ্ধ | মানে

(পুরাতন ভৃত্য, রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু যেখানে সম-মাত্রার পর্ব্ব লইয়া কবিতা রচিত হইয়াছে, সেখানেই মাত্র এরূপ চলিতে পারে ; যেখানে বিভিন্ন মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হয় সেখানে এরূপ চলে না।

ছন্দ স্বরাঘাত-প্রধান হইলে পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা সুনির্দ্দিষ্ট থাকে বলিয়া যে কোন স্থলেই শব্দ ভাঙিয়া পর্ব্বগঠন করা যায় ; যথা—

ঘরেতে দু | রন্ত ছেলে | করে দাপা | দাপি (রবীন্দ্রনাথ)
কালনেমি ক | বন্ধ রাহু | দৈত্য পাষ | ণ্ড (সত্যেন্দ্রনাথ—কয়াধু)

[খ] বাংলা মূল শব্দ সাধারণতঃ এক হইতে তিন মাত্রার হয় ; বিভক্তি ইত্যাদির যোগে ইহা অপেক্ষাকৃত বড় হইয়াও থাকে। সময়ে সময়ে বিদেশী ও তৎসম শব্দ অথবা সমাস ব্যবহারের কারণেও বড় শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সে সব ক্ষেত্রে আবশ্যক হইলে তাঁহাদের ভাঙিয়া দুইটি পর্ব্বের মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে। তবে যতটা সম্ভব শব্দের মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা করিতে হইবে।

সহকারী রাজকৃষ্ণ | কাঞ্চনবরণ,
যার করে জ্বলে টেলি | মেকস রতন।

(প্রজার কলিকাতা দর্শন, দীনবন্ধু মিত্র)

চারি অগ্নি মিশ্রিত | হইয়া এক হৈল।
সমুদ্র হৈতে আচম- | বিতে বাহিরিল॥

(আদিপর্ব্ব, কাশীরাম)

বিষ্ণু পাইলা কমলা | কৌস্তুভ মণি আদি।
হয় উচ্চৈঃশ্রবা ঐরা | বত গজনিধি॥ (ঐ)

এস পুস্তক- | পুষ্প পূজারী | সারদার উপা | সকেরা সবে

(স্বাগত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

ভূদেব রমেশ | দীনবন্ধুর | অর্ঘ্যে পদার | বিন্দে দীপ্তি

(কালিদাস রায়)

[২২] **প্রত্যেক পর্ব্বে দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গ থাকিবে।** অন্ততঃ দুইটি পর্ব্বাঙ্গ না থাকিলে পর্ব্বের মধ্যে কোনরূপ ছন্দের গতি বা তরঙ্গ অনুভূত হয় না।

প্রতি পর্ব্বাঙ্গেও একটি বা ততোধিক গোটা মূলশব্দ রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তবে যে সব ক্ষেত্রে কোন গোটা মূলশব্দ ভাঙিয়া পর্ব্ববিভাগ করা হয়, সে সব ক্ষেত্রে সুতরাং ভাঙ্‌টা শব্দ লইয়াই পর্ব্বের কোন একটি অঙ্গ গঠিত হয়।

বড় (চারি বা ততোধিক মাত্রার) শব্দকে আবশ্যক মত ভাঙিয়া দুইটি পর্ব্বাঙ্গ গঠিত করা যাইতে পারে। তবে মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা করিতে হইবে।

স্বরাঘাত-প্রবল ছন্দে যেখানে পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের মাত্রা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট থাকে, সেখানে যথেচ্ছ ভাবে শব্দের বিভাগ করিয়া পর্ব্বাঙ্গ গঠিত করা যাইতে পারে।

এস : প্রতিভার | রাজ : টীকা ভালে | এসো : ওগো এস | সঙ্গী : রবে
স্বাগত : কাব্য | কোবিদ : হেথায় | উজ্জ্ব : স্নিগ্ধীর | বাজিছে : বাঁশি

(স্বাগত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

যত্নশৈলে : শব্দসিন্ধু | করিয়া : মন্থন
অমিত্রা : ক্ষরের : সুধা | করেছে : অর্পণ

(কলিকাতা-দর্শন, দীনবন্ধু)

কোন্ হা : টে তুই | বিকো : তে চাস | ওরে : আমার | গান

(যথাস্থান, রবীন্দ্রনাথ)

কে ব : লে রূপ | নাই দে : বতার | কে ব : লে তাঁর | মূর্ত্তি : নাহি

(কোজাগরলক্ষ্মী, যতীন্দ্র বাগচী)

[২৩] এক একটি পর্ব্বাঙ্গ সাধারণতঃ দুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়া থাকে। কখন এক মাত্রার পর্ব্বাঙ্গও দেখা যায়। বাংলা শব্দও সাধারণতঃ এক, দুই, তিন বা চার মাত্রার হয়।

পর্ব্বাঙ্গের শেষে স্বরগাম্ভীর্য্যের হ্রাস হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কবি ইচ্ছা করিলে পর্ব্বাঙ্গের পরে সামান্য বা অধিক বিরামস্থল রাখিতে পারেন। সময়ে সময়ে পর্ব্বাঙ্গের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া যায়। কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, পর্ব্বের মধ্যেই পর্ব্বাঙ্গের পরে উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়াছে। কিন্তু পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে কোনরূপ যতি বা ছেদ থাকিতে পারে না।

[২৪] বাংলায় ৪ মাত্রা, ৬ মাত্রা ও ৮ মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহারই বেশী। ১০ মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহারও বর্ত্তমান যুগে যথেষ্ট দেখা যায়। কখন কখন ৫ ও ৭ মাত্রার পর্ব্বেরও ব্যবহার দেখা যায়। ৪ মাত্রা অপেক্ষা ছোট ও ১০ মাত্রা অপেক্ষা বড় পর্ব্বের ব্যবহার হয় না। *

প্রত্যেক প্রকারের পর্ব্বের বিশিষ্ট কোন ছন্দোগুণ আছে। ৪ মাত্রার পর্ব্বের গতি ক্ষিপ্র, ভাব হাল্কা। স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে শুধু ৪ মাত্রার পর্ব্বই ব্যবহৃত হইতে পারে।

জল পড়ে | পাতা নড়ে ॥
কালো জল | লাল ফল ॥
রাত পোহাল' | ফর্‌সা হ'ল | ফুট্‌ল কত | ফুল।

"কে নিবি গো | কিনে আমায়, | কে নিবি গো | কিনে।"
পসরা মোর | হেঁকে হেঁকে | বেড়াই রাতে | দিনে ॥

মা কেঁদে কয় | "মঞ্জুলী মোর | ঐ তো কচি | মেয়ে"

ছয় মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ রকমের পর্ব্বের চাল মাঝারি, সাধারণ কথোপকথনের এক একটি বিভাগের প্রায় সমান। বাংলা লঘুত্রিপদী ছন্দের ভিত্তি ছয় মাত্রার পর্ব্ব।

শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভুঁই | আর সবি গেছে | ঋণে
ওগো কালো মেঘ | বাতাসের বেগে | যেওনা যেওনা | যেওনা চলে
(সেথা) শুষ্ক চপল | বাসনা মানসে, | হন্ত লালসার | উগ্রতা

আট মাত্রার পর্ব্বই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার গতি মন্থর ও সংযত, ভাব গম্ভীর। বাংলা পয়ার, দীর্ঘ-

---

* ৯ মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার বাংলায় বিশেষ দেখা যায় না।

ত্রিপদী প্রভৃতি সনাতন ছন্দ এবং সাধারণ অমিতাক্ষর (অমিত্রাক্ষর) প্রভৃতি ছন্দের ভিত্তি আট মাত্রার পর্ব্ব।

দশ মাত্রার পর্ব্বের বিস্তৃত ব্যবহার শুধু বর্ত্তমান যুগেই দেখা যায়। (পূর্ব্বে কেবল দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের তৃতীয় পর্ব্বরূপে ইহার ব্যবহার দেখা যাইত।) সাধারণতঃ লঘুতর পর্ব্বের সহযোগেই ইহার ব্যবহার হয়।

> অন্ন চাই, প্রাণ চাই, | আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
> চাই বল, চাই স্বাস্থ্য | আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু ॥
>
> ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, | প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ,
> জগৎ আপনা দিয়ে | খুঁজিছে তাহার প্রতিদান ॥
>
> নিস্তব্ধের সে-আহ্বানে, | বাহিয়া জীবন-যাত্রা মম :
> সিন্ধুগামী-তরঙ্গিনী সম ||
> এতোকাল চলেছিনু | তোমারি সুদূর অভিসারে ||
> বঙ্কিম জটিল পথে | সুখে দুঃখে বন্ধুর সংসারে ||
> অনির্দ্দেশ অলক্ষ্যের পানে ||

দীর্ঘতর মাত্রার পর্ব্বগুলি সাধারণতঃ লঘুতর পর্ব্বের সহযোগেই ব্যবহৃত হয়।

পাঁচ মাত্রা ও সাত মাত্রার পর্ব্বের প্রকৃতি অন্যান্য পর্ব্ব হইতে কিছু বিভিন্ন। ইহারা দুইটি বিষম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গে রচিত হয় বলিয়া ইহাদের syncopated বা অপূর্ণ পর্ব্ব বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার উচ্ছল, চপল ভাব অনুভূত হয়।

> সকালবেলা | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | যায়—
> (অপেক্ষা, রবীন্দ্রনাথ)
>
> গোকুলে মধু | ফুরায়ে গেল | আঁধার আজি | কুঞ্জবন
> (শেষ, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য)
>
> ছিলাম নিশিদিন | আশাহীন প্রবাসী
> বিরহ তপোবনে | আনমনে উদাসী
> (বিরহানন্দ, রবীন্দ্রনাথ)
>
> ললাটে জয়টীকা | প্রসূন-হার গলে | চলে রে বীর চলে
> সে কারা নহে কারা | যেখানে ভৈরব | রুদ্র শিখা জ্বলে
> (নজরুল ইসলাম)

[২৫] বাংলা ছন্দের রীতি এই যে, **পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গগুলিকে সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সাজাইতে হইবে; হয়, পর্ব্বাঙ্গগুলি পরস্পর সমান হইবে, না হয়, তাহাদের ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে।** পর পর পর্ব্বাঙ্গগুলি, হয়, ক্রমশঃ হ্রস্বতর, না হয়, দীর্ঘতর হইবে। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ছন্দঃপতন ঘটিবে।

এই নিয়মানুসারে বাংলায় প্রচলিত পর্ব্ব-সমূহ নিম্নলিখিত আদর্শ (pattern বা ছাঁচ) অনুযায়ী বিভক্ত হইয়া থাকে। **এই সঙ্কেতগুলিই বাংলা ছন্দের কাঠাম।**

পর্ব্বের দৈর্ঘ্য— দুইটি পর্ব্বাঙ্গে বিভাগের রীতি— তিনটি পর্ব্বাঙ্গে বিভাগের রীতি

৪ — ২+২

জল : পড়ে | পাতা : নড়ে

দিনের : আলো | নিবে : এল

— ৩+১ *

কিন্তু নাপিত | দাড়ী কামায় | আদ্ধেক : তার | চুল

— ১+৩ *

তিন : কন্যে | দান

রাম : সিংহের | জয়

৫ — ৩+২

পক্ক : শরে | দক্ষ : করে | করেছ : একি | সন্ন্যাসী

— ২+৩

পূর্ণ : চাঁদ | হাসে : আকাশ | কোলে

আলোক : -ছায়া | শিব : -শিবানী | সাগর-জলে | দোলে

৬ — ৩+৩ ২+২+২

ভূতের : মতন | চেহারা : যেমন

কিশোর কুমার | বাধা : বাহু : তার

২+৪

শিখ : গরজয় | গুরুজীর : জয়

৪+২

সপ্তাহ : মাঝে | সাত শত : প্রাণ

পর্ব্বের দৈর্ঘ্য	দুইটি পর্ব্বাঙ্গে বিভাগের রীতি	তিনটি পর্ব্বাঙ্গে বিভাগের রীতি
৭ —	৩+৪ পূরব : মেঘ মুখে | পড়েছে : রবি রেখা ৪+৩ বিরহ : তপোবনে | আনমনে : উদাসী	
৮ —	৪+৪ পাখী সব : করে রব	৩+৩+২ রাখাল : গরুর : পাল যশোর : নগর : ধাম ২+২+৪ চক্রে : পিষ্ট : আঁধারের ৪+২+২ অতীতের : তীর : হতে ২+৩+৩ * সাড়ে : আঠারো : শতক অতি : অল্প : দিনেই গ্রাম : বড় : ফুলিয়া
১০ —		৩+৩+৪ ভারত- : ঈশ্বর : শাজাহান ৪+৩+৩ মহারাজ : বঙ্গজ : কায়স্থ সকরুণ : করুক : আকাশ ৪+৪+২ অশ্রুভরা : আনন্দের : সাজি ২+৪+৪ রথ : চালাইয়া : শীঘ্রগতি দিবা : হয়ে এল : সমাপনি

* তারকা-চিহ্নিত প্রথায় পর্ব্ব-বিভাগ কচিৎ দৃষ্ট হয়।

[২৫ ক] বাংলা ছন্দের পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগের সঙ্কেতগুলি ভারতীয় সঙ্গীতের তাল বিভাগের অনুরূপ। মূলতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের ও বাংলা প্রভৃতি ভাষার ছন্দের প্রকৃতি এক; উভয়েরই আদিম ইতিহাস এক। নিম্নে পর্ব্ব-বিভাগগুলির সহিত তাল-বিভাগের সূত্রের ঐক্য দর্শিত হইল :—

পর্ব্বের মাত্রা	—	পর্ব্বাঙ্গ বিভাগের রীতি	—	অনুরূপ তালের নাম
৪	—	২ + ২	—	ঠুম্‌রী বা খেম্‌টা
৫	—	২ + ৩, ৩ + ২	—	ঝাঁপতাল
৬	—	৩ + ৩	—	দাদ্‌রা, একতালা ইত্যাদি
		২ + ৪, ৪ + ২	—	রূপক
৭	—	৩ + ৪, ৪ + ৩	—	তেওরা
৮	—	৪ + ৪	—	কাবালী ইত্যাদি
		২ + ৩ + ৩, ৩ + ৩ + ২	—	ত্রিপুট তিস্র (দক্ষিণ ভারতীয়)
১০		৪ + ৪ + ২, ২ + ৪ + ৪	—	সুর ফাক্‌তা

[২৬] পরস্পর সমান বা প্রতিসম পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গবিভাগের রীতি একবিধ হওয়ার আবশ্যকতা নাই।*

"•–• : – | ••• : ••• | •• : •–• |
আনন্দে : মোর | দেবতা : জাগিল | জাগে : আনন্দ | ভকত প্রাণে"

এই চরণটিতে প্রথম তিনটি পর্ব্ব পরস্পর সমান, প্রত্যেক পর্ব্বেই ছয় মাত্রা আছে। কিন্তু পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগের রীতি বিভিন্ন।

প্রথম পর্ব্বে ৪ + ২, দ্বিতীয় পর্ব্বে ৩ + ৩, তৃতীয় পর্ব্বে ২ + ৪।

সেইরূপ,

"মৃত্যুর : নিভৃত : স্নিগ্ধ ঘরে | বসে আছ : বাতায়ন : পরে, | জ্বালায়ে : রেখেছো : দীপখানি
| চিরন্তন : আশায় : উজ্জ্বল"

এই চরণটির প্রতি পর্ব্বেই দশ মাত্রা আছে। কিন্তু পর্ব্বাঙ্গ বিভাগের রীতি ৩ + ৩ + ৪, ৪ + ৪ + ২, ৩ + ৩ + ৪, ৪ + ৩ + ৩

* তবে যেখানে পর্ব্বাঙ্গবিভাগের একটি সঙ্কেত-ই বারংবার ব্যবহৃত হয়, এবং সেই সঙ্কেতের অনুযায়ী বিভাগের উপরই কোন বিশেষ ছন্দতরঙ্গের প্রভাব নির্ভর করে, সেখানে প্রত্যেক পর্ব্বেই পর্ব্বাঙ্গবিভাগ একবিধ করার চেষ্টা করা হয়। স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে ইহা কখন কখন দেখা যায়। যেখানে প্রসারদীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার থাকে, সেখানেও এরূপ দেখা যায়।

[২৭] **উচ্চারণের রীতি বজায় রাখিয়া ছন্দের pattern বা আদর্শ অনুসারেই অক্ষরের মাত্রা স্থির হইয়া থাকে।**

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাংলায় কোন কোন শ্রেণীর অক্ষর আবশ্যক-মত দীর্ঘ হইতে পারে। সাধারণ রীতি এই যে, প্রত্যেক অক্ষরই একমাত্রিক বলিয়া গণ্য হইবে, শুধু শব্দের অন্তঃস্থ হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া গণ্য হইবে। ছন্দের খাতিরে **গোটা শব্দ না ভাঙিয়া উপরে লিখিত নিয়মে পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগ করিবার জন্য অক্ষরের দীর্ঘী করণ বা হ্রস্বীকরণ করা হইয়া থাকে।** এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বরাঘাতের প্রভাবে যে কোন হলন্ত অক্ষর হ্রস্ব হইতে পারে। গুরু অক্ষর এবং প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে যে বিধি-নিষেধ আছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। (সূঃ ১৬, ১৮ ও ২০ দ্রষ্টব্য)

এই উপলক্ষে কোন কোন স্থলে গোটা শব্দকে ভাঙিয়া পর্ব্ব বা পর্ব্বাঙ্গ বিভাগ করা যাইতে পারে, তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। (সূঃ ২১ ও ২২)

পাঠকের রুচি-অনুসারে কবিতাপাঠ-কালে পর্ব্বের অন্ত্য অক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া টানিয়া পর্ব্বের দৈর্ঘ্য বাড়াইতে পারা যায়। অবশ্য প্রতিসম পর্ব্বগুলিতে মোট মাত্রা সমান রাখিতে হইবে।

[২৮] ছন্দোলিপি করিবার সময় প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, এক একটি চরণ সমমাত্রিক পর্ব্বের সংযোগে, না, বিভিন্ন মাত্রার পর্ব্বের সংযোগে রচিত হইয়াছে। এইটি বুঝিয়া প্রথমতঃ পর্ব্ব-বিভাগ করিতে হইবে। (শব্দের স্বাভাবিক অন্বয় অনুসারে পাঠ করিলেই সাধারণতঃ পর্ব্ব-বিভাগগুলি অনেক সময় ধরা পড়ে।) তাহার পরে পর্ব্বগুলির কত মাত্রা বিবেচনা করিতে হইবে। এবং তাহার পরে প্রত্যেক পর্ব্বকে উপযুক্ত পর্ব্বাঙ্গে বিভাগ করিতে হইবে। পর্ব্বের ও পর্ব্বাঙ্গের মাত্রা হিসাব করিবার সময় মাত্রা-বিষয়ক নিয়মগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে। দীর্ঘীকরণের আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত তালিকার পর্য্যায় অনুসারে করিতে হইবে,—

(১) শব্দের অন্তস্থ হলন্ত অক্ষর
(২) অন্যান্য হলন্ত অক্ষর } যৌগিক অক্ষর
(৩) যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর

(৪) আহ্বান ও আবেগ-সূচক এবং অনুকারধ্বনি-সূচক অক্ষর

(৫) লুপ্ত অক্ষরের প্রতিনিধিস্থানীয় মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর

(৬) সংস্কৃত-মতে দীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষর

(৭) অন্যান্য মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর *

[২৮ক] যেখানে পর্ব্বে পর্ব্বে মাত্রার সংখ্যা সমান বা সুনিয়মিত, সেখানেই আবশ্যকমত অক্ষরের হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ চলিতে পারে। যেমন, কোন চরণে যদি বরাবরই ৪ মাত্রা, ৬ মাত্রা, কি, ৮ মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়, তখন ছন্দের সেই গতি অব্যাহত রাখার জন্য অক্ষরের আবশ্যক মত হ্রস্বীকরণ বা দীর্ঘীকরণ হয়।

আমাদের ছোট নদী | চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার | হাঁটু জল থাকে

এখানে প্রতি চরণের প্রথম পর্ব্বে ৮ মাত্রা হইবে, ইহা নির্দ্দিষ্টই আছে। সুতরাং "বৈ" অক্ষরটিকে দীর্ঘ ধরা হইল।

যেখানে এরূপ সুনির্দ্দিষ্ট একটা রূপকল্প বা ছাঁচ নাই, সেখানে প্রতি অক্ষরই স্বভাবমাত্রিক হইবে; অর্থাৎ মাত্র শব্দের অন্ত্য হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরিয়া বাকি সব অক্ষরকে হ্রস্ব ধরিতে হইবে। যেমন,

'এই কল্লোলের মাঝে | নিয়ে এস কেহ | পরিপূর্ণ একটি জীবন

এই চরণটিতে (সঙ্কেত—৮+৬+১০) সমস্ত অক্ষরই স্বভাবমাত্রিক হইবে।

অমিতাক্ষর (বা অমিত্রাক্ষর॰) ছন্দেও অনেক দিক্ দিয়া একটা অনির্দ্দিষ্টতা থাকে বলিয়া সেখানেও সব অক্ষর স্বভাবমাত্রিক হইবে।

[২৯] পর্ব্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অনেক সময় hyper-metric বা ছন্দের অতিরিক্ত একটি বা দুইটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাদিগকে ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে হয়।

---

* এই শ্রেণীর অক্ষরের দীর্ঘীকরণ যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলিতে হইবে। কারণ, সেরূপ করিলে বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতির লঙ্ঘন করিতে হয়। তত্রাচ ছন্দকে বজায় রাখিবার জন্য সাধারণ উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যতিক্রমও আবশ্যক হইলে করিতে হইবে।

যথা,

মোর—হার-ছেঁড়া মণি | নেয়নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় | গেছে সে গুঁড়ায়ে
চাকার চিহ্ন | ঘরের সমুখে | পড়ে আছে শুধু | আঁকা
আমি—কী দিলেম কারে | জানে না সে কেউ | ধুলায় রহিল | ঢাকা

এখানে মূল পর্ব্ব ৬ মাত্রার। "মোর" "আমি" এই দুটি শব্দ ছন্দোবন্ধের অতিরিক্ত।

[৩০] ছন্দোলিপিকরণের (Scanning-এর) দুই একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

এই কলিকাতা—কালিকাক্ষেত্র, কাহিনী ইহার সবার শ্রুত,
বিষ্ণুচক্র ঘুরেছে হেথায়, মহেশের পদধূলে এ পূত।
(স্বাগত. সত্যেন্দ্র দত্ত)

এই দুইটি পংক্তি পড়িলে বা অন্বয় করিলেই প্রতীত হইবে যে, প্রত্যেক পংক্তির মাঝখানে একটি যতি বা পর্ব্ববিভাগ আছে।

এই কলিকাতা—কালিকাক্ষেত্র, | কাহিনী ইহার সবার শ্রুত,
বিষ্ণু-চক্র ঘুরেছে হেথায়, | মহেশের পদধূলে এ পূত।

দেখা যাইতেছে, উপরের চারিটি বিভাগে যথাক্রমে ১০, ৯, ৯, ১০ করিয়া অক্ষর আছে। কিন্তু ইহাতে স্বরাঘাতের প্রাবল্য নাই এবং স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের রীতি অনুসারে চারি অক্ষর লইয়া পর্ব্ববিভাগ করিতে গেলে অনুচিত ভাবে শব্দ ভাঙিতে হয় এবং পড়া অসম্ভব হয়। সুতরাং সাধারণ রীতি অনুসারে অন্ততঃ শব্দের অন্তস্থ হলন্ত অক্ষরগুলিকে দীর্ঘ ধরিতে হইবে। তাহা হইলে বিভাগগুলিতে ১০, ১১, ৯, ১১ মাত্রা করিয়া পড়ে। কিন্তু ১১ মাত্রার পর্ব্ব হয় না, বিশেষতঃ এখানে ধ্বনির চাল মাঝারি রকমের। সুতরাং ৫ বা ৬ মাত্রার পর্ব্ব লইয়া ইহা সম্ভবতঃ গঠিত, এবং উপরের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্ভবতঃ দুইটি পর্ব্বের সমষ্টি। এই ভাবে দেখিলে নিম্নলিখিত ভাবে পর্ব্ব বিভাগ করা যায়—

এই কলিকাতা— | কালিকা-ক্ষেত্র, | কাহিনী ইহার | সবার শ্রুত,
বিষ্ণুচক্র | ঘুরেছে হেথায়, | মহেশের পদ- | ধূলে এ পূত

মাত্রার হিসাব এবং পর্ব্বাঙ্গের বিভাগ ঠিক করিতে গেলে প্রত্যেক যৌগিক অক্ষরকে দীর্ঘ করিলেই চলে।* সুতরাং ছন্দোলিপি এইরূপ হইবে—

— • • • •   • • •   — •   • • •   • —   • —   • •

এই ⁝ কলিকাতা— | কালিকা- ⁝ ক্ষেত্র, | কাহিনী ⁝ ইহার | সবার ⁝ শ্রুত ||

=(২+৪)+(৩+৩)+(৩+৩)+(৩+২)

— •   — •   • • •   • —   • • —   • •   • • •   • •

বিষ্ণু- ⁝ চক্র | ঘুরেছে ⁝ হেথায়, | মহেশের ⁝ পদ- | ধূলে এ ⁝ পূত ।

=(৩+৩)+(৩+৩)+(৪+২)+(৩+২)

আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক।

নীল-সিন্ধুজল-ধৌত চরণ-তল
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী !

সহজেই প্রতীত হইবে যে, এখানে প্রথম তিন পংক্তির পর্ব্ববিভাগ হইবে এইরূপ—

নীল-সিন্ধু-জল- | ধৌত চরণ-তল
অনিল-বিকম্পিত | শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত | ভাল হিমাচল

শেষের পংক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। মূল পর্ব্বের মাত্রা স্থির না করিলে উহার বিভাগ স্থির করা কঠিন।

এই কয়টি পংক্তি যে স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে লিখিত নয়, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং এই কয়েকটি পর্ব্বে অন্ততঃ ৬, ৭, ৭, ৬, ৬, ৬ মাত্রা আছে। কিন্তু সমমাত্রিক পর্ব্বে এ কবিতাটি যখন লিখিত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক পর্ব্বে অন্ততঃ ৭ মাত্রা আছে ধরিতে হইবে। কিন্তু ৭ মাত্রা করিয়া ধরিলে অবশ্য ২য় ও ৩য় পংক্তিতে পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগের তত অসুবিধা হয় না, কিন্তু প্রথম পংক্তিতে হয়। প্রথম পর্ব্বটিকে ৭ মাত্রা করিতে গেলে, রীতি অনুযায়ী 'সিন্' অক্ষরটিকে দীর্ঘ ধরিতে হইবে। প্রথম তাহা হইলে পর্ব্ববিভাগ হয় 'নীল-সিন্ ⁝ ধু-জল'। দ্বিতীয় পর্ব্বে বিভাগ হয় 'ধৌত চর ⁝ ণ তল' বা 'ধৌত চ ⁝ রণ তল।' এরূপ বিভাগ বাংলা ছন্দের ও উচ্চারণের রীতির বিরোধী।

*অনেক সময়ে চরণের শেষ পর্ব্বটি অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব হয়।

সুতরাং পর্ব্বগুলিকে ৮ মাত্রার ধরিলে চলে কি না, দেখিতে হইবে। বিশেষতঃ, যখন ৮ মাত্রার পর্ব্বই গম্ভীর ভাবের কবিতার উপযোগী।

ছন্দের নিয়ম অনুসারে দীর্ঘীকরণ করিলে ৮ মাত্রার পর্ব্বে সহজেই ছন্দোলিপি করা যায়—

নীল : সিন্ধু : জল | ধৌত : চরণ : তল =(৩+৩+২)+(৩+৩+২)

অনিল-বি : কম্পিত | শ্যামল : অঞ্চল =(৪+৪)+(৪+৪)

অম্বর : -চুম্বিত | ভাল : হিমা : চল =(৪+৪)+(৩+৩+২)

শুভ্র : -তুষার : -কিরী | টিনী ! =(৩+৩+২)+২

অথবা

শুভ্র : -তুষার : -কিরিটিনী =(৩+৩+৪)

এইরূপ হিসাব করিয়াই নিম্নলিখিত পদ্যাংশগুলির ছন্দোলিপি করিতে হইয়াছে—

সন্ধ্যা : গগনে | নিবিড় : কালিমা | অরণ্যে : খেলিছে : নিশি।

ভীত- : বদনা | পৃথিবী : হেরিছে | ঘোর্ অন্ধ : কারে : মিশি।

(ছায়াময়ী, হেমচন্দ্র)

"জয় : রাণা | রাম : সিংহের | জয়"

মৈত্রি : পতি | উর্দ্ধ : স্বরে | কয়

কনের : বক্ষ | কেঁপে : উঠে | ডরে,

দুটি : চক্ষু | ছল্ : ছল্ | করে,

বর : যাত্রী | হাঁকে : সম | স্বরে

"জয় : রাণা | রাম : সিংহের | জয়"।

(কথা ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ

সর্ব্বদা এইরূপে পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ-গঠনের রীতি স্মরণ রাখিয়া মাত্রা-বিচার করিতে হইবে। **কোনরূপ বাঁধা নিয়ম অনুসারে অক্ষরের মাত্রা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট থাকে না,—বাংলা ছন্দের এই ধাতুগত লক্ষণটি ভুলিলে চলিবে না।**

(ছন্দোলিপির অন্যান্য উদাহরণ পরে দেওয়া হইয়াছে)

ছন্দের সৌষম্য

(৩১) বাংলা ছন্দের সৌন্দর্য্যের জন্য পরিমিত মাত্রার পর্ব্বের যোজনা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার। বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতিতে অক্ষরের মাত্রা সুনির্দ্দিষ্ট নহে; হলন্ত অক্ষরের, কখন কখন স্বরান্ত অক্ষরেরও, ইচ্ছামত হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ করা হইয়া থাকে। লঘু অক্ষর ছাড়া অন্যান্য অক্ষরের অর্থাৎ গুরু এবং প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের বিশেষ প্রয়াস ও ক্রিয়া আবশ্যক হয়। সুতরাং ইহাদের ব্যবহারের সময় ছন্দের সৌষম্য সম্পর্কে বিশেষ কয়েকটি রীতির অনুসরণ করিতে হয়। পর্ব্বাঙ্গে ও পর্ব্বে কি ভাবে মাত্রা স্থির হয় তাহা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু পরিমিত মাত্রা থাকিলেও সময়ে সময়ে পর্ব্বে বা পর্ব্বাঙ্গে সৌষম্যের অভাব ঘটিতে পারে। এই সম্পর্কে কয়েকটি রীতি আছে।

গুরু অক্ষরের সৌষম্য

গুরু অক্ষরের বহুল ব্যবহার বাংলা ছন্দে চলে, কিন্তু তাহাদের সৌষম্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। এই কারণেই গুরু অক্ষরের ব্যবহারের জন্য কখন ছন্দ শ্রুতিকটু, আবার কখনও অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও উপাদেয় হয়। নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলিতে যে সৌষম্য রক্ষা হয় নাই, তাহা বেশ বুঝা যায়।

ডগমগ তনু | রসের ভারে
ভারত হীরারে | জিজ্ঞাসা কত্রে (ভারতচন্দ্র)

বীর শিশু | সাহসে যুঝিয়া
উপযুক্ত | সময় বুঝিয়া (রঙ্গলাল)

ব্রজাঙ্গনে | দয়া করি
লয়ে চল | যথা হরি (মধুসূদন)

কয়েকটি উপায়ে গুরু অক্ষরের ব্যবহারে সৌষম্য রক্ষা হইতে পারে।

(ক) গুরু অক্ষরের সন্নিধানে হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর যোজনা করিলে সৌষম্য রক্ষা হয়।

যথা,—

আজিকার কোন ফুল | বিহঙ্গের কোন গান | আজিকার কোন রক্ত রাগ

এখানে দ্বিতীয় পর্ব্বে 'হঙ্' ও 'গের্', এবং তৃতীয় পর্ব্বে 'রক্' ও 'রাগ' পরস্পরের সন্নিধানে থাকায় সৌষম্য রক্ষিত হইতেছে।

(খ) প্রতিসম বা সন্নিহিত পর্ব্বাঙ্গে বা পর্ব্বে সমসংখ্যক গুরু অক্ষর যোজনা করিলে সৌষম্য রক্ষা হয়।

যদি চরণে গুরু অক্ষরের সংখ্যাই বেশী হয়, তবে প্রতিসম পর্ব্বাঙ্গে বা পর্ব্বে সমসংখ্যক লঘু অক্ষর যোজনা করিলে সৌষম্য রক্ষা হয়। যথা—

প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি
ওগো পুরবাসী | কে রয়েছ জাগি

অনাথ পিণ্ডদ | কহিলা অম্বুদ- নিনাদে

জয় ভগবান্ | সর্ব্ব : শক্তিমান্ | জয় জয় : ভুবপতি

দুর্দ্দান্ত : পাণ্ডিত্য : পূর্ণ | দুঃসাধ্য : সিদ্ধান্ত

যেখানে পরস্পর সন্নিহিত দুইটি পর্ব্বের মধ্যে মাত্রার বৈষম্য আছে, সেখানে এই রীতির ব্যতিক্রম করিলেও সৌষম্য রক্ষা হয়।

সন্ধ্যা রক্ত রাগ সম | তন্দ্রাতলে হয় হোক্ লীন।

স্পর্শ করে লালসার | উদ্দীপ্ত নিঃশ্বাস

কিন্তু এরূপ ব্যতিক্রম সর্ব্বদা হয় না।

নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো | নবকুন্দ রাজি

নহ মাতা, নহ কন্যা | নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী

সর্ব্বদা এইরূপে পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ-গঠনের রীতি স্মরণ রাখিয়া মাত্রা-বিচার করিতে হইবে। **কোনরূপ বাঁধা নিয়ম অনুসারে অক্ষরের মাত্রা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট থাকে না,—বাংলা ছন্দের এই ধাতুগত লক্ষণটি ভুলিলে চলিবে না।**

(ছন্দোলিপির অন্যান্য উদাহরণ পরে দেওয়া হইয়াছে)

ছন্দের সৌষম্য

(৩১) বাংলা ছন্দের সৌন্দর্য্যের জন্য পরিমিত মাত্রার পর্ব্বের যোজনা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার। বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতিতে অক্ষরের মাত্রা সুনির্দ্দিষ্ট নহে ; হলন্ত অক্ষরের, কখন কখন স্বরান্ত অক্ষরেরও, ইচ্ছামত হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ করা হইয়া থাকে। লঘু অক্ষর ছাড়া অন্যান্য অক্ষরের অর্থাৎ গুরু এবং প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের বিশেষ প্রয়াস ও ক্রিয়া আবশ্যক হয়। সুতরাং ইহাদের ব্যবহারের সময় ছন্দের সৌষম্য সম্পর্কে বিশেষ কয়েকটি রীতির অনুসরণ করিতে হয়। পর্ব্বাঙ্গে ও পর্ব্বে কি ভাবে মাত্রা স্থির হয় তাহা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু পরিমিত মাত্রা থাকিলেও সময়ে সময়ে পর্ব্বে বা পর্ব্বাঙ্গে সৌষম্যের অভাব ঘটিতে পারে। এই সম্পর্কে কয়েকটি রীতি আছে।

গুরু অক্ষরের সৌষম্য

গুরু অক্ষরের বহুল ব্যবহার বাংলা ছন্দে চলে, কিন্তু তাহাদের সৌষম্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। এই কারণেই গুরু অক্ষরের ব্যবহারের জন্য কখন ছন্দ শ্রুতিকটু, আবার কখনও অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও উপাদেয় হয়। নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলিতে যে সৌষম্য রক্ষা হয় নাই, তাহা বেশ বুঝা যায়।

ডগমগ তনু | রসের ভারে
ভারত হীরারে | জিজ্ঞাসা করে (ভারতচন্দ্র)

বীর শিশু | সাহসে যুঝিয়া
উপযুক্ত | সময় বুঝিয়া (রঙ্গলাল)

ব্রজাঙ্গনে | দয়া করি
লয়ে চল | যথা হরি (মধুসূদন)

কয়েকটি উপায়ে গুরু অক্ষরের ব্যবহারে সৌষম্য রক্ষা হইতে পারে।

(ক) **গুরু অক্ষরের সন্নিধানে হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর যোজনা করিলে সৌষম্য রক্ষা হয়।**

যথা,—

আজিকার কোন ফুল | বিহঙ্গের কোন গান | আজিকার কোন রক্ত রাগ

এখানে দ্বিতীয় পর্ব্বে 'হঙ্' ও 'গের্', এবং তৃতীয় পর্ব্বে 'রক্' ও 'রাগ' পরস্পরের সন্নিধানে থাকায় সৌষম্য রক্ষিত হইতেছে।

(খ) **প্রতিসম বা সন্নিহিত পর্ব্বাঙ্গে বা পর্ব্বে সমসংখ্যক গুরু অক্ষর যোজনা করিলে সৌষম্য রক্ষা হয়।**

যদি চরণে গুরু অক্ষরের সংখ্যাই বেশী হয়, তবে প্রতিসম পর্ব্বাঙ্গে বা পর্ব্বে সমসংখ্যক লঘু অক্ষর যোজনা করিলে সৌষম্য রক্ষা হয়। যথা—

প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি
ওগো পুরবাসী | কে রয়েছ জাগি

অনাথ পিণ্ডদ | কহিলা অম্বুদ- নিনাদে

জয় ভগবান্ | সর্ব্ব : শক্তিমান্ | জয় জয় : ভুবপতি

দুর্দ্দান্ত : পাণ্ডিত্য : পূর্ণ | দুঃসাধ্য : সিদ্ধান্ত

যেখানে পরস্পর সন্নিহিত দুইটি পর্ব্বের মধ্যে মাত্রার বৈষম্য আছে, সেখানে এই রীতির ব্যতিক্রম করিলেও সৌষম্য রক্ষা হয়।

সন্ধ্যা রক্ত রাগ সম | তন্দ্রাতলে হয় হোক্ লীন।

স্পর্শ করে লালসার | উদ্দীপ্ত নিঃশ্বাস

কিন্তু এরূপ ব্যতিক্রম সর্ব্বদা হয় না।

নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো | নবকুন্দ রাজি

নহ মাতা, নহ কন্যা | নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী

ব্যতিক্রম হইলেও, মাত্রার অনুপাতে গুরু অক্ষরের যোজনা-ই সাধারণতঃ করা হয়।

কিম্বা বিম্বাধরা রমা | অম্বুরাশি তলে

জীর্ণ পুষ্পদল যথা | ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দ্দিকে

(গ) কোন বিশিষ্ট ভাবের ব্যঞ্জনার জন্য সন্নিহিত প্রতিসম পর্ব্বে গুরু অক্ষর প্রয়োগে সৌষম্যের রীতির ব্যভিচার করা যাইতে পারে।

অনুরাগে সিক্ত করি | পারিব না পাঠাইতে | তোমাদের করে

আজি হ'তে শতবর্ষ পরে

এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বের মাত্রা সমান, কিন্তু গুরু অক্ষরের ব্যবহারে সৌষম্য নাই মনে হইবে। কিন্তু ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলে ছন্দের সুর ক্রমশঃ নামিয়া আসাই দরকার। সেইজন্য দ্বিতীয় পর্ব্বকে প্রথম পর্ব্বের চেয়ে নরম সুরে বাঁধা হইয়াছে।

চরণ (Verse)

[৩২] পর্ব্ব অপেক্ষা বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের নাম চরণ (Verse)। সাধারণতঃ প্রত্যেকটি চরণ এক একটি ভিন্ন পংক্তিতে (line) লিখিত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া পংক্তি ও চরণ সর্ব্বদা ঠিক এক নহে। অনেক সময় অনুপ্রাসের অবস্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য পদ্যের এক চরণকে নানাভাবে পংক্তিতে সাজান হয়। যেমন, সাধারণ ত্রিপদী ছন্দে এক একটি চরণকে দুই পংক্তিতে লেখা হয়, কিন্তু ঐ দুই পংক্তি আসলে একই চরণের অংশ।

[৩৩] প্রত্যেক চরণের মধ্যে কয়েকটি পর্ব্ব এবং শেষে পূর্ণযতি থাকে। চরণের গঠন-প্রণালী হইতেই ছন্দের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত হয়।

[৩৪] প্রত্যেক চরণে সাধারণতঃ দুইটি, তিনটি বা চারিটি করিয়া পর্ব্ব থাকে। কখন কখন অপূর্ণ বা এক পর্ব্বের চরণও দেখা যায়, কিন্তু সে রকম চরণ বৃহত্তর চরণের সহযোগে কোন বিশেষ ছাঁচের শ্লোক-গঠনে ব্যবহৃত হয়। পাঁচ পর্ব্বের চরণও কখন কখন দেখা যায়, কিন্তু সে রকম চরণ বাংলায় খুব শ্রুতিমধুর হয় না।

[৩৫] দ্বিপর্ব্বিক চরণই বাংলায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। অনেক সময়ই, বিশেষতঃ যেখানে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ (অর্থাৎ ৮ বা ১০ মাত্রার) পর্ব্বের ব্যবহার আছে সেই সব স্থলে, দ্বিপর্ব্বিক চরণের দুইটি পর্ব্ব অসমান হয়। প্রায়ই শেষ পর্ব্বটি ছোট হইতে দেখা যায়, কখনও আবার শেষটিই বড় হয়।

ত্রিপর্ব্বিক চরণেরও যথেষ্ট ব্যবহার আছে। প্রাচীন ছন্দে ত্রিপর্ব্বিক ছন্দ মাত্রেই প্রথম দুইটি পর্ব্ব সমান ও তৃতীয়টি দীর্ঘতর হইত। লঘু ত্রিপদীর সূত্র ছিল ৬+৬+৮ এবং দীর্ঘ ত্রিপদীর সূত্র ছিল ৮+৮+১০। বর্ত্তমান যুগে কিন্তু নানা ধরণের ত্রিপর্ব্বিক চরণ দেখা যায়। ৮+৮+৬, ৮+১০+৬, ৭+৭+৭, ৮+৬+৬, ৮+১০+১০ ইত্যাদি সূত্রের ত্রিপর্ব্বিক চরণের ব্যবহার দেখা যায়।

চতুষ্পর্ব্বিক চরণে সাধারণতঃ, হয়, চারিটি পর্ব্বই সমান, না হয়, প্রথম তিনটি পরপর সমান এবং চতুর্থটি হ্রস্ব হয়। অন্য ধরণের চতুষ্পর্ব্বিক চরণও দেখা যায় ; কিন্তু তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে একটি হ্রস্ব ও একটি দীর্ঘ পর্ব্ব থাকে, কিংবা মাঝের পর্ব্ব দুইটি পর পর সমান এবং প্রান্তস্থ পর্ব্ব দুইটিও হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর ও পরস্পর সমান হয়।

('চরণ ও স্তবক' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

স্তবক (Stanza)

[৩৬] সুশৃঙ্খল রীতিতে পরস্পর সংশ্লিষ্ট চরণ-পর্য্যায়ের নাম **স্তবক**। অনেক সময়ই মিল বা অন্ত্যানুপ্রাসের দ্বারা এই সংশ্লেষ স্পষ্ট হয়।

পরস্পর সমান দুই চরণের মিত্রাক্ষর স্তবকের ব্যবহারই বাংলায় অধিক। পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি বেশীর ভাগ প্রচলিত ছন্দই এই জাতীয়। ১০ম সূত্রে উদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্ত পয়ারের ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত লঘু ত্রিপদীর উদাহরণ। আধুনিক যুগে ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ চরণের স্তবক অনেক সময় দেখা যায়। স্তবকে অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহারেও বর্ত্তমান যুগে বহু বিচিত্র কৌশল দেখা যায়।

পূর্ব্বে স্তবকের অন্তর্গত সব কয়টি চরণই সমান হইত এবং এক ধরণের পর্ব্বই ব্যবহৃত হইত। আধুনিক যুগে অনেক সময় দেখা যায় যে, স্তবকে একই মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হইতেছে ; কিন্তু প্রতি চরণের পর্ব্বের সংখ্যা বা চরণের

দৈর্ঘ্য এক নয়। আবার কখন কখন দেখা যায় যে, চরণের দৈর্ঘ্য সমান আছে ; কিন্তু বিভিন্ন মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হইতেছে।

('চরণ ও স্তবক' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

মিল বা মিত্রাক্ষর (Rime)

[৩৭] একই ধ্বনি পুনঃপুনঃ শ্রুতিগোচর হইলে তাহার ঝঙ্কার মনে বিশেষ এক প্রকার আন্দোলন উৎপাদন করে। এইরূপ একধ্বনিযুক্ত অক্ষর-যুগলকে **মিত্রাক্ষর** বলা যায়। নিয়মিত ভাবে একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি হইলে, ছন্দ শ্রুতিমধুর হয়, এবং ইহাদ্বারা ছন্দের ঐক্যসূত্রও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

বাংলায় স্তবকের এক চরণের শেষে যে ধ্বনি থাকে, স্তবকের অন্য চরণের শেষে তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া একটি সনাতন প্রথা। ইহার এক নাম **মিল** বা **অন্ত্যানুপ্রাস** (Rime)। পূর্ব্বে পদ্যে সর্ব্বদাই অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহৃত হইত, বর্ত্তমান কালে ইহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।

অন্ত্যানুপ্রাস যে মাত্র চরণের শেষেই থাকে, তাহা নহে। অনেক সময়ে চরণের অন্তর্গত পর্ব্বের শেষেও অন্ত্যানুপ্রাস দেখা যায়। সাধারণ ত্রিপদীতে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বের শেষ অক্ষরে মিল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্র কৌশলে তাঁহার কাব্যে অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন।

[৩৮] মিত্রাক্ষর ধ্বনি উৎপাদনের জন্য (১) হলন্ত অক্ষর হইলে, শেষ ব্যঞ্জন ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর এক হওয়া দরকার, এবং (২) স্বরান্ত অক্ষর হইলে, অন্ত্য ও উপান্ত স্বর ও অন্ত্যস্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জন এক হওয়া দরকার। এইখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, বাংলা ছন্দের রীতিতে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের ধ্বনি একই বলিয়া বিবেচিত হয়। এইজন্য 'শিথ্' ও 'নির্ভীক' পরস্পর মিত্রাক্ষর।

অমিতাক্ষর (বা অমিত্রাক্ষর) ছন্দ (Blank Verse)

[৩৯] মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম বাংলা ভাষায় ইংরেজীর অনুকরণে blank verse লেখেন। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে অমিত্রাক্ষর ; কারণ, তিনি

এই নূতন ছন্দে প্রতি জোড়া চরণের শেষে মিত্রাক্ষর ব্যবহারের প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অমিত্রাক্ষর নামটি ঠিক উপযুক্ত হয় নাই; কারণ, চরণের শেষে মিল থাকা বা না থাকা ইহার প্রধান লক্ষণ নহে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরণের শেষে যদি মিল থাকিত, তাহা হইলেও ইহা সাধারণ মিত্রাক্ষর হইতে ভিন্ন থাকিত। আবার পয়ার প্রভৃতি ছন্দের মিল যদি উঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইবে না।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের প্রধান লক্ষণ—এই ছন্দে অর্থ-বিভাগ ও ছন্দো-বিভাগ পরস্পর মিলিয়া যায় না, অর্থাৎ যতি ছেদের অনুগামী হয় না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যেখানে ছেদ, সেখানেই যতি পড়ে। মাঝে মাঝে অবশ্য দেখা যায় যে, উপচ্ছেদ ও অর্দ্ধযতি ঠিক মেলে না, কিন্তু সাধারণ ছন্দে পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি মিলিয়া যাইবেই। এক একটি চরণ এক একটি সম্পূর্ণ অর্থ-বিভাগ। ছন্দের আদর্শ অনুসারে পরিমিত মাত্রার পর যতি পড়ে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ ছন্দে পরিমিত মাত্রার অক্ষরের পর ছেদ পড়ে; কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে কয় মাত্রার পর ছেদ পড়িবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই, আবেগের তীব্রতা অনুসারে তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে পড়ে। এক একটি চরণ লইয়া অর্থ-বিভাগ সম্পূর্ণ হয় না; এক চরণের সহিত অপর চরণের কোন অংশ মিলাইয়া অথবা এক চরণের কোন ভগ্নাংশ লইয়া এক একটি অর্থ বিভাগ হয়। সুতরাং মধুসূদনের প্রবর্ত্তিত নূতন ধরণের ছন্দকে **অমিতাক্ষর,** ও সাধারণ ছন্দকে **মিতাক্ষর** বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত ২৫ পৃষ্ঠার পঞ্চম দৃষ্টান্তটি মধুসূদনের অমিতাক্ষরের উদাহরণ। যতির অবস্থানের দিক্ দিয়া তাঁহার অমিতাক্ষর পয়ারের অনুরূপ; অর্থাৎ তিনি ১৪ মাত্রার প্রতি চরণের শেষে পূর্ণযতি এবং চরণের প্রথম ৮ মাত্রার পর অর্দ্ধযতি বসাইতেন। কিন্তু মধুসূদন্ প্রায়ই পর্ব্বের মধ্যে কোন পর্ব্বাঙ্গের পর ছেদ বসাইতেন। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ বসাইবার বৈচিত্র্যের দরুণ তাঁহার ছন্দ অর্থ-বিভাগের দিক্ দিয়া বিচিত্র ভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে।

[৪০] মধুসূদন ছাড়া আরও অনেকে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অমিতাক্ষরে কিছু কিছু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। নবীনচন্দ্র সেন মাঝে মাঝে অন্য এক প্রকার রীতিতে

অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা করিতেন। তাঁহারা পর্ব্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ বসাইতেন না, কিন্তু যেখানে অর্দ্ধযতির অবস্থান, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ দিতেন—

দূর হোক্ ইতিহাস ! | * * দেখ একবার ||
মানবহৃদয় রাজ্য। | * * দেখ নিরন্তর ||
বহিতেছে কি ঝটিকা | * *

[৪১] রবীন্দ্রনাথ আর এক প্রকারের অভিনব অমিতাক্ষরে বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। এ রকম অমিতাক্ষর ছন্দে প্রতি চরণের দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু ঠিক্ একই প্রকারের পর্ব্ব সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না, ইচ্ছা-মত বিভিন্ন প্রকারের পর্ব্বের সমাবেশ হয় ; পর্ব্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ প্রায় থাকে না, থাকিলেও বিজোড় সংখ্যক মাত্রার পরে বসে না ; প্রতি চরণের শেষে পূর্ণযতি নির্দ্দেশের জন্য পয়ারের অনুকরণে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ইহা মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দ।

[৪২] রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে ১৪ মাত্রার চরণই বেশীর ভাগ ব্যবহার করিয়াছেন। কখন কখন আবার তিনি ঈদৃশ ছন্দে ১৮ মাত্রার চরণ ব্যবহার করিয়াছেন। এসব ক্ষেত্রেও লক্ষণাদি পূর্ব্ববৎ, কেবল ৮ মাত্রা ও ১০ মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়।

হে আদি জননী সিন্ধু, | * বসুন্ধরা সন্তান তোমার, || *
একমাত্র কন্যা তব কোলে। | * * তাই * তন্দ্রা নাহি আর ||
চক্ষে তব, * তাই বক্ষ জুড়ি | * সদা শঙ্কা, সদা আশা, ||
সদা আন্দোলন ; * * ······ (সমুদ্রের প্রতি)

[৪৩] রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'-তে আর একপ্রকারের অমিতাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতেও মিত্রাক্ষর আছে ; কিন্তু তাহা মাত্র চরণের শেষে না থাকিয়া বিচিত্রভাবে চরণের ভিতরে ছেদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মিত্রাক্ষরের অবস্থান অনুসারে পংক্তি সাজান হয় বলিয়া আপাততঃ এ রকম ছন্দের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা দুরূহ মনে হয়। যথা,—

হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।

ততক্ষণ

নিখিল গগন

হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।

যতি ও ছেদ বিচার করিয়া ইহার ছন্দোলিপি করিলে স্তবকটি এইরূপ দাঁড়ায়—

(ক) (ক)
হে ভুবন * আমি যতক্ষণ | * তোমারে না ||
(খ) (ক) (খ)
বেসেছিনু ভালো | * * ততক্ষণ * তব আলো || *
(ক)
খুঁজে খুঁজে পায় নাই | * তার সব ধন। || * *
(ক) (ক) (গ)
ততক্ষণ * নিখিল গগন | * হাতে নিয়ে ||
(গ)
দীপ তার | * শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে || * *

এক একটি অর্থ-বিভাগের শীর্ষে সূচী-বর্ণ দিয়া ইহার মিত্রাক্ষর বসাইবার রীতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর হইতে ইহা বিশেষ বিভিন্ন নহে।

[৪৪] বলাকায় আর একটু অন্য রকমের ছন্দও আছে। ইহাদের ছন্দোলিপি করা আরও দুরূহ বলিয়া মনে হইতে পারে। যথা,—

হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা,
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা,
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক,
(শুধু থাক,)
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল-তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

এইরূপ পদ্যের ছন্দোলিপি করার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পর্ব্বের পূর্ব্বে কখন কখন ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দসমষ্টি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ([২৯] সংখ্যক সূত্র দ্রষ্টব্য)

এই ধরণের ছন্দে রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দ বসাইয়া ছন্দের প্রবাহকে ক্ষিপ্রতর করিয়াছেন।

উপরের উদ্ধৃতাংশের ছন্দোলিপি এইরূপ হইবে—

হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা *	=০+১০	}
যেন শূন্য দিগন্তের | ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা *	=৮+১০	
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক, * *	=০+১০	
(শুধু থাক্) এক বিন্দু নয়নের জল *	=০+১০	
কালের কপোল তলে | শুভ্র সমুজ্জ্বল *	=৮+৬	}
এ তাজমহল * *	=০+৬	

দেখা যাইতেছে যে, এই রকমের ছন্দ মিতাক্ষরের জটিল স্তবকের রূপান্তর মাত্র। উপরের চারিটি চরণ লইয়া একটি স্তবক এবং নীচের দুইটি চরণ লইয়া আর একটি স্তবক। চরণগুলি দ্বিপর্ব্বিক,—হয় পূর্ণ, না হয় অপূর্ণ, অর্থাৎ কোন একটি পর্ব্বের স্থান ফাঁক দিয়া পূর্ণ করা হইয়াছে। (এইরূপ দীর্ঘ ও হ্রস্ব চরণের সমাবেশ মিতাক্ষর ছন্দের অনেক স্তবকেও দেখা যায়।) ছেদ চরণের অন্তেই পড়িতেছে, ইহাও মিতাক্ষরের লক্ষণ। সুকৌশলে মিত্রাক্ষরের এবং মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার করিয়া ছন্দের প্রবাহে বৈচিত্র্য আনা হইয়াছে।

[৪৫] এতদ্ভিন্ন গিরিশচন্দ্র ঘোষ আর এক প্রকারের ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ 'গৈরিশ ছন্দ' নামে অভিহিত হয়। এখানে প্রতি চরণে দুইটি করিয়া পর্ব্ব থাকে। ভাবের গাম্ভীর্য্য অনুসারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়, এবং পর্ব্ব দুইটি দৈর্ঘ্যে প্রায় অনুরূপ হইয়া থাকে। প্রত্যেক চরণই একটি পূর্ণ অর্থ-বিভাগ, নিকটস্থ অন্যান্য চরণের সহিত তাহার সংশ্লেষ থাকে না। মধ্যে মধ্যে ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া ছন্দের প্রবাহকে ক্ষিপ্রতর করা হয়।

গিরিধারী, * নাহি | বাহুবল তব	=৬+৬
চাহ বুঝাইতে | (তোমা হ'তে) আমি বলাধিক।	=৬+৬
"ক্ষত্রিয় সমাজে | (কথা বটে) সম্মানসূচক,	=৬+৬
ছল নহি আমি | —অতি ছল তুমি	=৬+৬
মুক্ত কণ্ঠে | করি হে স্বীকার।	=৪+৬
ছলে চাহ | ভুলাইতে,	=৪+৪
ছলে কহ | আশ্রিতে ত্যজিতে,	=৪+৬
চতুরের | চূড়ামণি তুমি।	=৪+৬

(সূঃ ৪৩, ৪৪, ৪৫ সম্পর্কে পরিশিষ্টে 'বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

চরণ ও স্তবক

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা ছন্দের মূলসূত্রের আলোচনা করিয়াছি। বাংলা ছন্দের উপকরণ—পর্ব্ব, এবং সমমাত্রিক পর্ব্বের সমাবেশেই চরণ, স্তবক ইত্যাদি গঠিত হয়। সংস্কৃতে এরূপ প্রত্যেক সমাবেশের এক একটি বিশেষ নাম আছে, যথা—অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, ইন্দ্রবজ্রা, স্রগ্ধরা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি। বাংলায় এইরূপ পয়ার, ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি কয়েকটি নাম অনেক দিন হইতে চলিত আছে। কিন্তু আধুনিক বাংলায় এত বিচিত্র রকমের চরণ ও স্তবক ব্যবহৃত হইয়াছে যে তাহাদের সকলের নাম দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পক্ষে এরূপ নামকরণেরও বিশেষ সার্থকতা নাই। আমরা কয়েক প্রকারের সুপ্রচলিত চরণ ও স্তবকের উদাহরণ নিম্নে দিতেছি।*

চরণ

চার মাত্রার ছন্দ

(যেখানে মূল পর্ব্বে চার মাত্রা থাকে)

দ্বিপর্ব্বিক—

— • • | • • • •
পূর্ণপদী— জল পড়ে | পাতা নড়ে = ৪ + ৪

/ • • • | • / • •
খিন্‌তা খিনা | পাকা নোনা = ৪ + ৪

• / • • | • /
অপূর্ণপদী-- একটি ছোট | মালা = ৪ + ২

• / • • | • /
হাতের হবে | বালা = ৪ + ২

• • — | ◡ — • • —
অতিপূর্ণপদী—সারাদিন | অশান্ত বাতাস = ৪ + ৬

• • • • | ◡ — ◡ —
ফেলিতেছে | মর্ম্মর নিশ্বাস = ৪ + ৬

---

* মৎপ্রণীত Studies in Rabindranath's Prosody (Journal of the Department of Letters, Vol. XXXI, Cal. Univ.) নামক প্রবন্ধে আরও অধিক সংখ্যক উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

ত্রিপর্ব্বিক—

পূর্ণপদী— মিথ্যে তুমি | গাঁথলে মালা | নবীন ফুলে =৪+৪+৪

ভেবেছ কি | কণ্ঠে আমার | দেবে তুলে =৪+৪+৪

অপূর্ণপদী— কৃষ্ণ কলি | আমি তারেই | বলি =৪+৪+২

কালো তারে | বলে গাঁয়ের | লোক =৪+৪+২

চতুষ্পর্ব্বিক—

পূর্ণপদী— জলে বাসা | বেঁধে ছিলেম | ডাঙায় বড় | কিচিমিচি =৪+৪+৪+৪

সবাই গলা | জাহির করে | চেঁচায় কেবল | মিছি মিছি =৪+৪+৪+৪

অপূর্ণপদী— রাত্ পোহাল | ফরসা হল | ফুট্‌ল কত | ফুল =৪+৪+৪+১

কাঁপিয়ে পাখা | নীল পতাকা | জুট্‌ল অলি | কুল =৪+৪+৪+১

পঞ্চপর্ব্বিক—

অপূর্ণপদী— পড়্‌তে শুরু | করে দিলেম | ইংরেজি এক | নভেল কিনে | এনে
=৪+৪+৪+৪+২

পাঁচ মাত্রার ছন্দ

দ্বিপর্ব্বিক— গোপিন রাতে | অচল গন্ধে =৫+৫

নহর যারে | এনেছে ধরে =৫+৫

চতুষ্পর্ব্বিক— বসন কার | দেখিতে পাই | জোৎস্না লোকে | লুন্ঠিত =৫+৫+৫+৪

বদন কার | দেখিতে পাই | কিরণে অব- | গুন্ঠিত =৫+৫+৫+৪

ছয় মাত্রার ছন্দ

. . . . . — | — . . . .
দ্বিপর্ব্বিক— নীরবে দেখাও | অঙ্গুলি তুলি =৬+৬
. . . — . | . . . . . .
অকূল সিন্ধু | উঠেছে আকুলি =৬+৬

শুধু অকারণ | পুলকে =৬+৩
ছুটে যা ঝলকে | ঝলকে =৬+৩

. . . . . . | . . . . . . | —
ত্রিপর্ব্বিক— তোমরা হাসিয়া | বহিয়া চলিয়া | যাও =৬+৬+২
.. .. — | . — . — | ..
কুল্ কুল্ কল্ | নদীর স্রোতের | মত =৬+৬+২

ঐ (লঘু ত্রিপদী)—শাখী শাখা যত | ফল ভরে নত | চরণে প্রণত তারা =৬+৬+৮
পল্লব নড়িছে | সলিল পড়িছে | দর দর প্রেম ধারা =৬+৬+৮

— — — | — . . . . | — — . . | . . .
চতুষ্পর্ব্বিক— সব ঠাঁই মোর | ঘর আছে, আমি | সেই ঘর মরি | খুঁজিয়া
. . .. — | — . . . . | — — .. | . . .
দেশে দেশে মোর | দেশ আছে, আমি | সেই দেশ লবো | বুঝিয়া
=৬+৬+৬+৩

সাত মাত্রার ছন্দ

. . . . | . . . .
দ্বিপর্ব্বিক—পূরব মেঘ মুখে | পড়েছে রবিরেখা =৭+৭
. . . . | . . . — . .
অরুণ রথচূড়া | আধেক যায় দেখা =৭+৭

. . . — — | . . —
ঐ (অপূর্ণপদী)— সমাজ সংসার | মিছে সব =৭+৪
. . . . . . — | . . —
মিছে এ জীবনের | কলরব =৭+৪

ত্রিপর্ব্বিক— . . . . | . . . — . . | . . . — . .
ললাটে জয়টীকা | প্রসূন হার গলে | চলে রে, বীর চলে =৭+৭+৭
. . . . | . . . — .. | — . . . . .
সে কারা নহে কারা | যেখানে ভৈরব | রুদ্র শিখা জ্বলে =৭+৭+৭

চতুষ্পর্ব্বিক—এসেছে সখা সখী | বসিয়া চোখোচোখি | দাঁড়ায়ে মুখোমুখি | হাসিছে শিশুগুলি

এসেছে ভাইবোন | পুলকে ভরা মন, | ডাকিছে ভাই ভাই | আঁখিতে আঁখি তুলি

=৭+৭+৭+৭

ঐ (অপূর্ণপদী)—খাঁচার পাখী ছিল | সোনার খাঁচাটিতে | বনের পাখী ছিল | বনে

=৭+৭+৭+২

একদা কি করিয়া | মিলন হ'ল দোঁহে | কি ছিল বিধাতার | মনে =৭+৭+৭+২

আট মাত্রার ছন্দ

দ্বিপর্ব্বিক—দূর হ'তে শুনি যেন | মহাসাগরের গান =৮+৮

(পয়ার)—রাখাল গরুর পাল | নিয়ে যায় মাঠে =৮+৬

শিশুগণ দেয় মন | নিজ নিজ পাঠে =৮+৬

গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরষা =৮+৫

তীরে একা বসে আছি | নাহি ভরসা =৮+৫

ত্রিপর্ব্বিক—নদীতীরে বৃন্দাবনে | সনাতন একমনে | জপিছেন নাম =৮+৮+৬

হেন কালে দীন বেশে | ব্রাহ্মণ চরণে এসে | করিল প্রণাম =৮+৮+৬

ঐ (দীর্ঘ ত্রিপদী)—বলো না কাতর স্বরে | বৃথা জন্ম এ সংসারে | এ জীবন নিশার স্বপন

দারা পুত্র পরিবার | তুমি কার কে তোমার | বলে জীব ক'রো না ক্রন্দন

=৮+৮+১০

চতুষ্পর্ব্বিক—

বনের মর্ম্মর মাঝে | বিজনে বাঁশরি বাজে | তারি সুরে মাঝে মাঝে। ঘুঘু দুটি গান গায়

ঝুরু ঝুরু কত পাতা | গাহিছে বনের গাথা | কত না মনের কথা | তারি সাথে মিশে যায়

=৮+৮+৮+৮

রাশি রাশি ভারা ভারা | ধান কাটা হ'ল সারা | ভরা নদী ক্ষুরধারা | খর-পরশা

=৮+৮+৮+৫

দশ মাত্রার ছন্দ

দ্বিপর্ব্বিক—ওর প্রাণ আঁধার যখন | করুণ শুনায় বড়ো বাঁশি =১০+১০

দুয়ারেতে সজল নয়ন | এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসিরাশি =১০+১০

বিবিধ

দ্বিপার্ব্বিক—হে নিস্তব্ধ, গিরিরাজ, | অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত =৮+১০
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে | অনুদাত্ত, উদাত্ত, স্বরিত =৮+১০

ত্রিপর্ব্বিক—ঈশানের পুঞ্জ মেঘ | অন্ধবেগে ধেয়ে চ'লে আসে | বাধা বন্ধ হারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে | নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া | হানি দীর্ঘ ধারা
=৮+১০+৬

স্তবক

বাংলা কাব্যে আজকাল অসংখ্য প্রকারের স্তবক দেখা যায়। মাত্র কয়েকটি সুপ্রচলিত স্তবক ও তাহাদের গঠনপ্রণালীর উল্লেখ করা এখানে সম্ভব।

স্তবকের গঠনে বহু বৈচিত্র্য থাকিলেও প্রায় সর্ব্বদাই দেখা যাইবে যে কোন এক বিশিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পর্ব্ব-ই ইহার মূল উপকরণ। স্তবকের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি চরণের পর্ব্বসংখ্যা সমান না হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা মূলে সমান। অবশ্য অনেক সময়ই চরণের শেষ পর্ব্বটি অপূর্ণ হইয়া থাকে, এবং কখন কখন স্তবকের মধ্যে খণ্ডিত চরণের ব্যবহার দেখা যায়।

স্তবকের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস বা মিলের দ্বারাই সাধারণতঃ চরণে চরণে সংশ্লেষ নির্দ্দিষ্ট হয়। আমরা ক, খ, গ,...ইত্যাদি বর্ণের দ্বারা অন্ত্যানুপ্রাস যোজনার রীতি নির্দ্দেশ করিব। কোন স্তবককে ক-খ-খ-ক এই সঙ্কেত দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে বুঝিতে হইবে যে ঐ স্তবকে চারিটি চরণ আছে, এবং প্রথম ও চতুর্থ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের মধ্যে মিল আছে।

দুই চরণের স্তবক

পরস্পর সমান ও মিত্রাক্ষর দুইটি চরণ দিয়া স্তবক বা শ্লোক রচনার রীতি-ই বহুকাল হইতে আজও সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। পূর্ব্বে ত ইহা ছাড়া অন্য কোন প্রকার স্তবক ছিলই না। পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি সবই এই জাতীয়। নানাবিধ চরণের উদাহরণ দিবার সময় এইরূপ বহু স্তবকের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

আধুনিক কালে কখনও কখনও দেখা যায় যে এইরূপ স্তবকের চরণ দুইটি ঠিক সর্ব্বাংশে এক নহে ; যথা—

কতবার মনে করি | পূর্ণিমা নিশীথে | স্নিগ্ধ সমীরণ, =৮+৬+৬
নিদ্রালস আঁখি সম | ধীরে যদি মুদে আসে | এ শ্রান্ত জীবন =৮+৮+৬

আবার অনেক সময় দেখা যায় যে চরণ দুইটির পর্ব্বসংখ্যা সমান নহে ; যথা—

শুধু অকারণ | পুলকে =৬+৩
ক্ষণিকের গান | গারে আজি প্রাণ | ক্ষণিক দিনের | আলোকে =৬+৬+৬+৩

তিন চরণের স্তবক

এরূপ স্তবকের ব্যবহার আগে ছিল না, আজকাল দেখা যায়। ইহাতে নানাভাবে মিল দেওয়া যায় ; যেমন ক-ক-ক, ক-খ-ক, ক-খ-খ, ক-ক-খ। তিনটি চরণই ঠিক একরূপ হইতে পারে ; যেমন—

নিত্য তোমায় | চিত্ত ভরিয়া | স্মরণ করি =৬+৬+৫
বিশ্ব বিহীন | বিজনে বসিয়া | বরণ করি =৬+৬+৫
তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি =৬+৬+৫

বিভিন্ন সংখ্যক পর্ব্বের চরণ লইয়াও এরূপ স্তবক গঠিত হইতে পারে। বিশেষতঃ প্রথম দুইটি ছোট, এবং তৃতীয়টি বড়—এইরূপ স্তবক বেশ প্রচলিত যেমন—

সবার মাঝে আমি | ফিরি একেলা =৭+৫
কেমন করে কাটে | সারাটা বেলা =৭+৫
ইঁটের পরে ইঁট | মাঝে মানুষ কীট | নাইকো ভালোবাসা | নাইকো খেলা=৭+৭+৭+৫

চার চরণের স্তবক

এরূপ স্তবকের ব্যবহার বেশ প্রচলিত। ক-খ-ক-খ, ক খ খ-ক, ক-ক-ক-খ চ-ক-ছ-ক, এইরূপ নানাভবে এখানে মিল দেওয়া যায়। চরণগুলি ঠিক একরূপ হইতে পারে ; যেমন—

অঙ্গে অঙ্গ | বাঁধিছ রঙ্গ | পাশে =৬+৬+২
বাহুতে বাহুতে | জড়িত ললিত | লতা =৬+৬+২
ইঙ্গিত রসে | ধ্বনিয়া উঠিছে | হাসি =৬+৬+২
নয়নে নয়নে | বহিছে গোপন | কথা =৬+৬+২

আবার, বিভিন্ন সংখ্যক পর্ব্বের চরণ লইয়াও এইরূপ স্তবক রচিত হইতে পারে। তন্মধ্যে, নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রকার আজকাল বেশ প্রচলিত ;

(ক) প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ ছোট, এবং তৃতীয়টি বড় ; যথা—

সে কথা শুনিবে না | কেহ আর =৭+৪
নিভৃত নির্জ্জন | চারি ধার =৭+৪
দু'জনে মুখোমুখি | গভীর দুখে দুখী, | আকাশে জল ঝরে | অনিবার =৭+৭+৭+৪
জগতে কেহ যেন | নাহি আর =৭+৪

(খ) প্রথম ও চতুর্থটি বড়, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ছোট ; যথা—

বহে মাঘ মাসে | শীতের বাতাস | স্বচ্ছ-সলিলা | বরুণা। =৬+৬+৬+৩
পুরী হতে দূরে | গ্রামে নির্জ্জনে =৬+৬
শিলাময় ঘাটে | চম্পক-বনে =৬+৬
স্নানে চলেছেন | শত সখী সনে | কাশীর মহিষী | করুণা। =৬+৬+৬+৩

(গ) প্রথম ও তৃতীয়টি বড়, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থটি ছোট ; যেমন—

পঞ্চশরে | দগ্ধ ক'রে | করেছো একি | সন্ন্যাসী =৫+৫+৫+৪
বিশ্বময় | দিয়েছো তারে | ছড়ায়ে =৫+৫+৩
ব্যাকুলতর | বেদনা তার | বাতাসে উঠে | নিঃশ্বাসি' =৫+৫+৫+৪
অশ্রু তার | আকাশে পড়ে | গড়ায়ে। =৫+৫+৩

পাঁচ চরণের স্তবক

পাঁচ চরণের স্তবক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনেক সময় দেখা যায়। বিশেষতঃ প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চমটি বড়, এবং তৃতীয় ও চতুর্থটি ছোট, এইরূপ স্তবক তাঁহার বেশ প্রিয় বলিয়া মনে হয়। যেমন,—

বিপুল গভীর | মধুর মন্দ্রে | কে বাজাবে সেই | বাজনা। =৬+৬+৬+৩
উঠিবে চিত্ত | করিয়া নৃত্য | বিস্মৃত হবে | আপনা। =৬+৬+৬+৩
টুটিবে বন্ধ | মহা আনন্দ =৬+৬
নব সঙ্গীতে | নূতন ছন্দ, =৬+৬
হৃদয়সাগরে | পূর্ণচন্দ্র | জাগাবে নবীন | বাসনা। =৬+৬+৬+৩

ছয় চরণের স্তবক

ছয় মাত্রার পর্ব্বের ন্যায় ছয় চরণের স্তবক-ও আজকাল খুব প্রচলিত। তন্মধ্যে কয়েক প্রকারের স্তবক খুব জনপ্রিয়। প্রথম প্রকারের স্তবকের ছয়টি

চরণের মধ্যে ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম চরণ পরস্পর সমান ও ছোট হয়, এবং ৩য় ও ৬ষ্ঠ চরণ অপেক্ষাকৃত বড় ও পরস্পর সমান হয়। যথা,—

"প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি,	=৬+৬
ওগো পুরবাসী ¦ কে রয়েছ জাগি"	=৬+৬
অনাথ-পিণ্ডদ | কহিলা অম্বুদ- | নিনাদে।	=৬+৬+৩
সদ্য মেলিতেছে | তরুণ তপন	=৬+৬
আলস্যে অরুণ | সহাস্য লোচন	=৬+৬
শ্রাবস্তী পুরীর | গগন-লগন | প্রাসাদে।	=৬+৬+৩

দ্বিতীয় প্রকার স্তবকের ছয়টি চরণের মধ্যে ১ম, ২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ পরস্পর সমান ও বড় হয়, এবং ৩য় ও ৪র্থ চরণ অপেক্ষাকৃত ছোট ও পরস্পর সমান হয়। যথা,—

আজি কী তোমার | মধুর মূরতি | হেরিনু শারদ | প্রভাতে	=৬+৬+৬+৩
হে মাতঃ বঙ্গ | শ্যামল অঙ্গ | ঝলিছে অমল | শোভাতে	=৬+৬+৬+৩
পারে না বহিতে | নদী জল-ধার,	=৬+৬
মাঠে মাঠে ধান | ধরে নাকো আর,	=৬+৬
ডাকিছে দোয়েল, | গাহিছে কোয়েল | তোমার কানন- | সভাতে	=৬+৬+৬+৩
মাঝখানে তুমি | দাঁড়ায়ে জননী | শরৎ কালের | প্রভাতে	=৬+৬+৬+৩

ইহা ছাড়া আরও নানা ছাঁচের ও নক্সার স্তবক দেখিতে পাওয়া যায়। সাতটি, আটটি, নয়টি, দশটি চরণ দিয়াও স্তবক গঠিত হইতে দেখা যায়। হেমচন্দ্রের "ভারতভিক্ষা" ইত্যাদি Ode জাতীয় কয়েকটি কবিতা, রবীন্দ্রনাথের "উর্ব্বশী" "ঝুলন" প্রভৃতি কবিতা এই সম্পর্কে উল্লেখ-যোগ্য। বলা বাহুল্য যে মিত্রাক্ষরের সংশ্লেষ এবং একই মূল পর্ব্বের ব্যবহারের দ্বারাই এইরূপ দীর্ঘ স্তবকের গঠন সম্ভব হইয়াছে। দীর্ঘ স্তবক গুলিতে কিন্তু প্রায়ই পর্ব্বসংখ্যা ও দৈর্ঘ্যের দিক দিয়া চরণে চরণে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। নহিলে অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া এই সমস্ত স্তবক অত্যন্ত ক্লান্তিকর মনে হইত। দৈর্ঘ্যের বৈচিত্র্যের দ্বারা ভাব প্রবাহের ব্যঞ্জনার-ও সুবিধা হয়।

সনেট্

এই উপলক্ষে সনেট্ (**Sonnet**) সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। সনেট্ য়ুরোপীয় কাব্যে খুব সুপ্রচলিত। সুপ্রসিদ্ধ ইতালীয় কবি পেত্রার্ক ইহার

প্রচলন করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরাজি সাহিত্যেও সনেট্ লেখা আরম্ভ হয়। সনেট্ সাধারণতঃ দীর্ঘ কবিতার উপযুক্ত গাম্ভীর্য্যধর্ম্মী চরণে লিখিত হয়, এবং ইহাতে ১৪টি করিয়া চরণ থাকে। ইহার মধ্যে প্রথম ৮টি চরণ লইয়া একটি বিভাগ (অষ্টক), এবং শেষের ৬টি চরণ লইয়া আর একটি বিভাগ (ষড়ক); সনেটের ভাবের দিক দিয়াও এইরূপ বিভাগ দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে মিত্রাক্ষর স্থাপনের যে বিচিত্র কৌশল আবশ্যক, তাহাতেই ইহার বিশেষত্ব। সাধারণতঃ ইহাতে ক-খ-খ-ক, গ-ঘ-ঘ-গ, চ-ছ-চ-ছ-চ-ছ / চ-ছ-জ-চ-ছ-জ এই পদ্ধতি ক্রমে মিত্রাক্ষর যোজনা করা হয়। কিন্তু মোটামুটি এই কাঠাম রাখিয়া একটু আধটু পরিবর্ত্তন করা চলে, ও করা হইয়া থাকে।

বাংলায় মধুসূদন-ই চতুর্দ্দশপদী কবিতা নাম দিয়া সনেটের প্রথম প্রচলন করেন। তিনি পয়ারের ৮+৬ এই সঙ্কেতের চরণকেই বাংলা সনেটের বাহন করিয়া লইলেন, এবং তাহাই অদ্যাপি চলিত আছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ৮+১০ সঙ্কেতের চরণ লইয়াও সনেট রচনা করিয়াছেন। ('কড়ি ও কোমল' দ্রষ্টব্য)

মধুসূদন পয়ারের চরণ লইয়া সনেট রচনা করিলেও ছন্দের প্রবাহে অনেক সময়েই তাঁহার অমিতাক্ষরের লক্ষণ দেখা যায়। মিত্রাক্ষর-যোজনা বিষয়ে তিনি পেত্রার্কের রীতিই মোটামুটি অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি বাংলা সনেটের সুন্দর উদাহরণ।

বাল্মীকি		মিত্রাক্ষর স্থাপনের রীতি	
স্বপনে ভ্রমিনু আমি | গহন কাননে	... ৮+৬	... ক	অষ্টক
একাকী। দেখিনু দূরে | যুবা একজন,	... ৮+৬	... খ	
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে | প্রাচীন ব্রাহ্মণ,	... ৮+৬	... খ	
দ্রোণ যেন ভয় শূন্য | কুরুক্ষেত্র রণে।	... ৮+৬	... ক	
"চাহিস বধিতে মোরে | কিসের কারণ?"	... ৮+৬	... খ	
জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর | মধুর বচনে।	... ৮+৬	... ক	
"বধি তোমা হরি আমি | লব সব ধন"	... ৮+৬	... খ	
উত্তরিলা যুবজন | ভীম গরজনে।	... ৮+৬	... ক	

বাল্মীকি		মিত্রাক্ষর স্থাপনের রীতি	
পরিবরতিল স্বপ্ন, | শুনিনু সত্বরে	... ৮+৬ ...	গ	ষট্‌ক
সুধাময় গীতধ্বনি ; | আপনি ভারতী,	... ৮+৬ ...	ঘ	
মোহিতে ব্রহ্মার মন, | স্বর্ণবীণা করে,	... ৮+৬ ...	গ	
আরম্ভিলা গীত যেন | —মনোহর অতি।	... ৮+৬ ...	ঘ	
সে দুরন্ত যুবজন, | সে বৃদ্ধের বরে,	... ৮+৬ ...	গ	
হইল, ভারত, তব | কবি-কুল-পতি।	... ৮+৬ ...	ঘ	

মধুসূদনের পর যাঁহারা সনেট লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় খাঁটি পেত্রার্কীয় সনেটের ধারার অনুসরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সনেটে মিতাক্ষর ও অমিতাক্ষর উভয়েরই প্রবাহ দেখা যায়। কিন্তু মিত্রাক্ষর যোজনা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে তাঁহার সনেট, সাতটি দুই চরণের স্তবকের সমষ্টি মাত্র।

বাংলা ছন্দের জাতি (?) ও ঢঙ্

বাংলা ছন্দের যে কয়টি সূত্র নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সমস্ত বাংলা কবিতাতেই খাটে। ঐ সূত্রগুলি বাংলা ভাষার প্রকৃতি, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। নানা ভঙ্গীতে কবিরা কাব্যরচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু সকলেরই ছন্দের 'কান' ঐ সূত্রগুলি মানিয়া চলে। দেখা যাইবে যে, অ-দুষ্ট ছন্দের সমস্ত বাংলা কবিতারই ঐ সূত্র অনুসারে সুন্দর ছন্দোলিপি করা যায়। এতদ্দ্বারা সমগ্র বাংলা কাব্যের ছন্দের একটি ঐক্যসূত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমি ইহার নাম দিয়াছি the Beat and Bar Theory বা **পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদ**।

বাংলা ছন্দ সম্পর্কে সম্প্রতি যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা অনেকেই বাংলা ছন্দপদ্ধতির মূল ঐক্যটি ধরিতে পারিতেছেন না। বাংলায়

অক্ষরের (syllable-এর) মাত্রা বাঁধা-ধরা কিংবা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট নহে, ছন্দের আবশ্যকতা মত অক্ষরের (syllable-এর) হ্রস্বীকরণ বা দীর্ঘীকরণ হইয়া থাকে ; কিন্তু ছন্দের আবশ্যকতার সূত্র কি, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া, তাঁহারা বাংলায় নানারকম 'স্বতন্ত্র' রীতি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা বাংলা ছন্দকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া 'স্বরবৃত্ত', 'মাত্রাবৃত্ত' এবং 'অক্ষরবৃত্ত' এই তিনটি নাম দিয়াছেন, এবং বলিতেছেন যে, তিনটি বিভিন্ন রীতিতে বাংলায় ছন্দ রচিত হয়। কখন কখন তাঁহারা আবার চারিটি, পাঁচটি, কি ততোধিক বিভাগ কল্পনা করিতেছেন।

অবশ্য অনেক দিন পূর্ব্বেই, বাংলায় তিন ধরণের ছন্দের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। যাঁহারা কবি, তাঁহারা ত স্বীকার করিতেন-ই, যাঁহারা ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করিতেন, তাঁহারাও করিতেন। ১৩২৩ সনে দশম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে স্বর্গীয় রাখালরাজ রায় মহাশয় এতৎসম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন—"বাঙ্গলায় এখন তিন প্রকারের ছন্দ চলিয়াছে। প্রথম—অক্ষর গণনা করিয়া, ২য় প্রকার—মাত্রা গণনা করিয়া, আর এক প্রকারের ছন্দ খনার বচন, ছেলে ভুলান ছড়া, মেয়েলি ছড়ায় আবদ্ধ হইল। ব্যঙ্গ কবিতায় ৺রাজকৃষ্ণ রায় এবং ৺কবি হেমচন্দ্র এই ছন্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন। এখন কবিবর শ্রীর রবীন্দ্রনাথ ও বিজয়চন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই উচ্চাঙ্গের কবিতায় ইহার ব্যবহার করিতেছেন। * * * প্রথম প্রকার ছন্দের 'অক্ষরমাত্রিক', ২য় প্রকারের 'মাত্রাবৃত্ত' এবং ৩য় প্রকারের 'স্বরমাত্রিক' বা 'ছড়ার ছন্দ' নাম দেওয়া যাইতে পারে।" আজকাল অনেকে 'অক্ষরমাত্রিক' স্থলে 'অক্ষরবৃত্ত', এবং 'স্বরমাত্রিক' স্থলে 'স্বরবৃত্ত' ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু এই নামগুলি অপেক্ষা রাখালরাজ রায় মহাশয়ের দেওয়া নামগুলিই বরং সমীচীনতর ; কারণ, 'বৃত্তছন্দ' বাংলায় বা অন্যান্য প্রাকৃত ভাষায় নাই। সমমাত্রিক পর্ব্বের উপরই বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার ছন্দ প্রতিষ্ঠিত, 'বৃত্তছন্দ' তদ্রূপ নহে। সংস্কৃত 'বৃত্তছন্দ' গুলি প্রাচীন বৈদিক ছন্দ হইতে সমুদ্ভূত এবং মাত্রাসমক ছন্দ হইতে মূলতঃ পৃথক্। 'বৃত্তছন্দ' এবং মাত্রাসমক ছন্দের rhythm বা ছন্দঃস্পন্দনের প্রকৃতি এবং আদর্শ একেবারেই বিভিন্ন। বলা বাহুল্য, বাংলা ছন্দমাত্রেই মাত্রাসমক-জাতীয়। সংস্কৃত 'অক্ষরবৃত্তে'র অনুরূপ কোন ছন্দ বাংলায় চলে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন।

১৩২৫ সনে 'ভারতী' পত্রিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ 'ছন্দ-সরস্বতী' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতেও এইরূপ বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধের প্রথম 'প্রকাশে' তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত,' দ্বিতীয় ''প্রকাশে' তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্ত,' এবং তৃতীয় 'প্রকাশে' তথাকথিত 'স্বরবৃত্তের' কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি কেহ কেহ বাংলা ছন্দের যে আর একটি চতুর্থ বিভাগের অর্থাৎ মাত্রাসমক-স্বরসমক ছন্দের কথা তুলিয়াছেন, তাহার বিষয় 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধের পঞ্চম 'প্রকাশে' বলা হইয়াছে। পয়ার-জাতীয় ছন্দের প্রতি কেহ কেহ যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাহা ঐ প্রবন্ধের দ্বিতীয় 'প্রকাশে' 'ছন্দোময়ী'-র মতের অনুযায়ী। বাংলা ছন্দে যে বিদেশী সব রকম ছন্দের অনুকরণ করা যায়, এ মতটিও 'ছন্দ-সরস্বতী'-র চতুর্থ 'প্রকাশে' আছে। 'অক্ষরবৃত্ত' শব্দটিও ঐ প্রবন্ধের, এবং মধ্য যুগের লেখকেরা যে ছন্দোজ্ঞান না থাকার দরুণ সংখ্যা ভর্ত্তি করার জন্য "বাংলা ছন্দের পায়ে অক্ষরবৃত্তের তুড়ুং ঠুকে দিয়েছিলেন" এ মতটিও ঐ প্রবন্ধে আছে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবলে যে, বাংলা ছন্দের তিন ধারায় বঙ্গের কাব্য-সাহিত্যে "যুক্তবেণীর সৃষ্টি হয়েছে"—এই মত এবং এই উপমা উভয়ই 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে পাওয়া যায়। কিন্তু কবি সত্যেন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধে ছন্দ সম্পর্কীয় যত সূক্ষ্ম প্রশ্ন ও চিন্তার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা আর কেহ করেন নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ নানা ধরণের ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু মূলে যে একটা ঐক্য থাকিতে পারে, তাহা একেবারে বিস্মৃত হ'ন নাই। তৃতীয় 'প্রকাশে' তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন—"আচ্ছা, এই অক্ষর-গোণা ছন্দ এবং syllable বা শব্দ-পাপড়ি-গোণা ছন্দ, মূলে কি একই জিনিস নয়?" ইহার স্পষ্ট উত্তর তিনি কিছু দেন নাই,—তামিল, ফার্সী বা আসামী হইতে পয়ারের উৎপত্তি হইয়াছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্থাপন মাত্র করিয়াছেন। তাঁহার মতাবলম্বীরা বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচনা না করিয়া একেবারেই স্বতন্ত্র তিনটি (চারিটি?) বিভাগের কল্পনা করিয়াছেন।

মতটি যাহারই হউক, ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

প্রথমতঃ, a priori কয়েকটি আপত্তি হইতে পারে,—

বৈজ্ঞানিক চিন্তা-প্রণালী সর্ব্বত্রই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দেখিতে পায়। বাংলা ছন্দের জগতে নানাবিধ ঢঙ্ থাকিতে পারে, যেমন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের

জগতে নানাবিধ ঢঙ্ আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ছন্দোবন্ধনের কোন একটা মূলনীতি থাকা সম্ভব নয় কি? বাংলার ভাষা, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে যদি একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে বাংলা ছন্দে থাকিবে না কেন? তিনটি বা চারিটি বা পাঁচটি স্বতন্ত্র রীতি একই ভাষার ছন্দে একই সময় প্রচলিত থাকা সম্ভব কি? বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধ বলিয়া কোন জিনিস নাই কি? যদি থাকে, তবে তাহার কি কোন সহজবোধ্য মূল সূত্র পাওয়া যায় না?

ছন্দোদুষ্ট কবিতার দুর্ব্বলতা সহজেই বাঙালীর কানে ধরা দেয়। কিন্তু যদি বাস্তবিক-ই তিন চারিটি বিভিন্ন পদ্ধতির ছন্দ প্রচলিত থাকিত, তবে অত শীঘ্র ও সহজে ছন্দের দোষ কানে ধরা দিত কি? কারণ, তিনটি পদ্ধতি স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন এক কবিতার ছন্দ, একটি বিশেষ পদ্ধতি মতে শুদ্ধ হইলেও অপরাপর পদ্ধতি মতে দুষ্ট; যেমন—

আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাসের | কালে

এই চরণটি তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত' এবং তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্ত' রীতিতে দুষ্ট, কিন্তু তথাকথিত 'স্বরবৃত্ত' রীতির হিসাবে নির্ভুল। সুতরাং কোনও কবিতার চরণ শুনিয়া তখনই তাহাতে ছন্দঃপতন হইয়াছে বলা চলিত না, তিনটি রীতির নিয়ম মিলাইয়া তবেই তাহাকে ছন্দোদুষ্ট বলা যাইত।

তাহা ছাড়া, যে ভাবে এই তিনটি রীতির বিভাগ করা হয়, তাহাতে কি putting the cart before the horse এই fallacy আসে না? কেহ কি প্রথমে কোনও কবিতার জাতি নির্ণয় করিয়া, পরে তাহার ছন্দোবিভাগ করেন, না, প্রথমে ছন্দোবিভাগ করিয়া পরে জাতি নির্ণয় করেন?

অনেকে বলেন যে স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রাকৃত বাংলার ছন্দ, এবং হসন্তবহুল। কিন্তু

ভূতের মতন | চেহারা যেমন | নির্বোধ অতি | ঘোর = ৬+৬+৬+২
যা কিছু হারায় | গিন্নী বলেন | কেষ্টা বেটাই | চোর = ৬+৬+৬+২

এখানে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার হইয়াছে, অথচ ছন্দ যে 'স্বরবৃত্ত' নহে, 'মাত্রাবৃত্ত', তাহা ছন্দোবিভাগ না করিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে?

মুক্ত বেণীর | গঙ্গা যেথায় | মুক্তি বিতরে | রঙ্গে = ৬+৬+৬+২
আমরা বাঙালী | বাস করি সেই | বরদতীর্থ | বঙ্গে = ৬+৬+৬+২

এখানেও ছন্দ হসন্তবহুল, সুতরাং ইহাকে 'স্বরবৃত্ত' মনে করাই স্বাভাবিক। একমাত্র অসুবিধা এই যে, 'স্বরবৃত্তে' ইহার ছন্দোবিভাগ 'মিলান' যায় না, সুতরাং 'মাত্রাবৃত্ত' বলিতে হয়। কার্য্যতঃ সকলেই আগে ছন্দোবিভাগ করিয়া পরে জাতি-নির্ণয় করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ছন্দোবিভাগের সূত্র কি, তাহাই নির্ণীত হওয়া দরকার। জাতি-বিভাগের হিসাবে ছন্দের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হয় না। ছন্দের মাত্রা ও বিভাগ ইত্যাদি স্থির হইলে পর তাহাকে এ জাতি, সে জাতি, যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরেজি ছন্দের কয়েকটি নিয়ম ধরিয়া বাংলা ছন্দের আলোচনায় অগ্রসর হইলে এবং বাংলা ভাষার এবং বাঙালীর ছন্দের মূল প্রকৃতির দিকে অবহিত না হইলে নানাবিধ প্রমাদে জড়িত হইতে হয়।

তাহার পর, বাস্তবিকই কি তিনটি 'বৃত্তে' মাত্রার পদ্ধতি বিভিন্ন ? 'স্বরবৃত্তে' ও 'অক্ষরবৃত্তে' পার্থক্য কি ? 'স্বরবৃত্তে' স্বর গুণিয়া মাত্রা ঠিক করিতে হয়। 'অক্ষরবৃত্তে' হরফ্ গুণিয়া ঠিক করা হয় ? ছন্দের পরিচয় কানে ; সুতরাং যাহা নিতান্ত দর্শনগ্রাহ্য এবং কেবলমাত্র লেখার কৌশল হইতে উৎপন্ন (অর্থাৎ হরফ্), তাহা কখনও ছন্দের ভিত্তি হইতে পারে না। নিরক্ষর লোকেও তো ছন্দঃপতন ধরিতে পারে। ধ্বনির দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্তে' স্বর গুণিয়াই মাত্রা ঠিক করা হয়, তবে কোন শব্দের শেষে যদি কোন closed syllable অর্থাৎ যৌগিক অক্ষর থাকে, তবে তাহাকে দুই মাত্রা ধরা হয়। কিন্তু তাহা কি সর্ব্বত্র হয় ?

> 'যাদঃপতি-রোধ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে'
> 'তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
> প্রসারিছে করপুট মুগ্ধ পারাবার'

এখানে 'যাদঃ', 'রজঃ' শব্দে দুই মাত্রা, যদিও 'দঃ' বা 'জঃ' যৌগিক অক্ষর (closed syllable)। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই দেখা যায় যে, 'দিক্-প্রান্ত' শব্দটী অক্ষরবৃত্তে কখনও তিন মাত্রার, কখনও চার মাত্রার বলিয়া গণ্য হয়। 'দিক্' শব্দটিও কখনও এক মাত্রার, কখনও দুই মাত্রার বলিয়া ধরা হয়।

তব চিত্ত গগনের | দূর দিক্-সীমা	=৮+৬
বেদনার রাঙা মেঘে | পেয়েছে মহিমা	=৮+৬
মনের আকাশে তার | দিক্ সীমানা বেয়ে	=৮+৬
বিবাগী স্বপনপাখী | চলিয়াছে ধেয়ে।	=৮+৬

'ঐ' শব্দটী কখনও এক মাত্রার, কখনও দুই মাত্রার বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

'মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি উঠে গভীর নিশীথে'

এ রকম পংক্তিতেও 'ভৈঃ' পদান্তের যৌগিক অক্ষর হইয়াও এক মাত্রার। তাহা ছাড়া, শব্দের মধ্যে কি প্রারম্ভে যদি closed syllable বা যৌগিক অক্ষর থাকে, তবে তাহাও সর্ব্বদা এক মাত্রার বলিয়া গণ্য হয় না।

ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল।
আল্‌তা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥

এখানে 'আল্' ও 'ধুই' শব্দের আদ্য স্থান অধিকার করিয়াও দুই মাত্রার বলিয়া পরিগণিত। সেইরূপ—

চিম্‌নি ফেটেছে দেখে | গৃহিণী সরোষ =৮+৬
ঝি বলে ঠাকরুণ মোর | নেই কোন দোষ =৮+৬

এখানে 'চিম্' দীর্ঘ। সম্প্রতি কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, 'অক্ষরবৃত্তে' সংস্কৃত শব্দের আদিতে বা মধ্যে অবস্থিত closed syllable বা যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘীকরণ চলে না। কিন্তু এ মত কি ঠিক?—

সর্ব্বাঙ্গ : জ্বলে' গেল | অগ্নি দিল : গায় =৮+৬

অথবা,

আসে অবগুণ্ঠিতা | প্রভাতের অরুণ দুকূলে =৮+১০
শৈলতটমূলে।

এ রকম স্থলে এই মত খণ্ডিত হইয়েছে।* সুতরাং এই মাত্র বলা যায় যে, 'অক্ষরবৃত্তে' closed syllable কখনও এক মাত্রার, কখনও দুই মাত্রার হয়। বাঁধা-ধরা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট কোনও রীতি নাই। কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে যে তথাকথিত অক্ষরবৃত্তে যৌগিক অক্ষর দীর্ঘ হইবে তাহার কোন নির্দ্দেশ কেহ দিতে পারিতেছেন না। কিন্তু পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদ অনুসারে তাহা সহজেই নির্ণয় করা যায়।

'স্বরবৃত্তে'-ও কি সর্ব্বদা স্বর গুণিয়া মাত্রা স্থির হয়?

(১) গর্ গর্ গর্ | গর্জ্জে দেয়া | ঝর্ ঝর্ ঝর্ | বৃষ্টি
(২) আয় আয় সই | জল্ আনি গে | জল্ আনি গে | চল্
(৩) আই আই আই | এই বুড়ো কি | ঐ গৌরীর | বর লো

(৪) কিন্তু নাপিত | দাড়ী কামায় | আৰ্দ্ধেক তার | চুল
(৫) এক পয়সায় | কিনেছে সে | তালপাতার এক | বাঁশী
(৬) এ সংসার | রসের কুটি
খাই দাই আর | মজা লুটি
(৭) নির্ভয়ে তুই | রাখ্‌রে মাথা | কাল রাত্রির | কোলে
(৮) বসেছে আজ | রথের তলায় | স্নান যাত্রার | মেলা
(৯) আগাগোড়া | সব শুনতেই | হবে
(১০) বাপ বল্‌লেন, | কঠিন হেসে, | "তোমরা মায়ে | ঝিয়ে
এক লগ্নেই | বিয়ে ক'রো | আমার মরার | পরে
(১১) এম্‌নি করে | হায়, আমার | দিন যে কেটে | যায়
(১২) কপালে যা | লেখা আছে | তার ফল তো | হবেই হবে
(১৩) গেছে দোঁহে | ফরাকাবাদ চ'লে
সেইখানেতেই | ঘর পাত্‌বে | ব'লে।
(১৪) হায় কি হ'লো | পেটের কথা | বেরিয়ে গেলো | কত
ইস্তক সে | লাট্‌ টম্‌সন | বেরাল ইন্দুর | যত
(১৫) বাইরে শুধু | জলের শব্দ | ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ | ঝুপ
দস্যি ছেলে | গল্প শুনে | একেবারে | চুপ

এগুলি কোন্ বৃত্তে রচিত? 'স্বরবৃত্তে' ত? নিম্নরেখ পর্ব্বগুলিতে যে স্বর গুণিয়া মাত্রা স্থির করা হয় নাই, তাহা তো সুস্পষ্ট। কারণ ঐ পর্ব্বগুলিতে স্বরের সংখ্যা কখন তিন, কখন দুই হওয়া সত্ত্বেও সন্নিহিত চতুঃস্বর পর্ব্বের সহিত মাত্রায় সমান হইতেছে। তাহা হইলে স্বরবৃত্তেও কখন কখন closed syllable-কে দুই মাত্রা ধরা হয়, স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বলিতে হয় যে, 'স্বরবৃত্ত' ছন্দেও আবশ্যক-মত syllable-কে দীর্ঘ করিতে হয়। কিন্তু সেই আবশ্যকতার স্বরূপ কি? পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদে তাহারই ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন তথাকথিত মাত্রাবৃত্ত-জাতীয় কবিতাতেও যে সর্ব্বদা 'মাত্রাবৃত্তে'র নিয়ম বজায় থাকে, তাহা নহে। হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' কবিতাটিতে বা রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' কবিতাটিতে 'মাত্রাবৃত্তের' নিয়মগুলি প্রতিপালিত হইয়াছে কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ঐ কবিতাগুলি

সংস্কৃত পদ্ধতিতে রচিত। বাংলায় open syllable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ প্রায় হয় না; ঐ কবিতাগুলিতে বহু open syllable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ হইতেছে। কিন্তু উচ্চারণ অনেক সময় সংস্কৃতানুগ হইলেও, ছন্দ সংস্কৃতের নহে, ছন্দ বাংলার। ইচ্ছা করিলেই সংস্কৃত উচ্চারণ যে বাংলা কবিতায় চালান যায় না—ইহা বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ছন্দের মূল ধাত ও নিয়ম বজায় রাখিলে open syllable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ স্বভাবতঃই হইতে পারে। যেমন,—

রূঢ় দীপের | আলোক লাগিল | ক্ষমা-সুন্দর | চক্ষে

তথাকথিত মাত্রাবৃত্তে সমস্ত স্বরান্ত অক্ষর হ্রস্ব বলিয়া ধরার রীতি থাকিলেও এখানে 'রূ' অনায়াসেই দীর্ঘ হইতেছে। ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কবির বহু রচনায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই সমস্ত সংস্কৃত-গন্ধী কবিতায় দীর্ঘ উচ্চারণ বাস্তবিক যে সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়ম অনুসারে হয় না, বাংলা ছন্দের নিয়ম অনুসারে হয়, তাহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই দেখা যাইবে। (১৬ক সূত্র দ্রষ্টব্য)

Open syllable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ 'অক্ষরবৃত্ত' 'স্বরবৃত্ত' প্রভৃতিতেও যে হয় না, এমন নহে। যথা—

'বল্ ছিন্ন বীণে, | বল উচ্চৈঃস্বরে—
না— না —না— | মানবের তরে—'

'কাজি ফুল | কুড়ুতে | পেয়ে গেলা | মালা
হাত ঝুমঝুম্ | পা ঝুমঝুম্ | সীতারামের | খেলা'।

'মাত্রাবৃত্ত' ঢঙের কবিতাতে যে closed syllable সর্ব্বদা দীর্ঘ হয়, তাহাও নয়। যথা—

'চিত্রা সময় জানি | সুবর্ণের সিঁথি আনি | যতনে দেঅল সিঁথিমূলে।
চম্পক-ললিতা ধনী | অপূর্ব্ব সিন্দূর আনি | যতনে পরাঅল ভালে॥'

শিখরে শিখণ্ড রোল | মত্ত দাদুরী বোল | কোকিল কুহরে কুতূহলে।

এ সমস্ত পদ 'মাত্রাবৃত্তে'র ঢঙে রচিত, কিন্তু সর্ব্বত্র closed sylladle-এর দীর্ঘীকরণ হয় নাই। সুতরাং **আসলে দেখা যাইতেছে যে, সব রকম**

ঢঙের কবিতাতেই ছন্দের আবশ্যক মত open ও closed সব রকম syllable-ই দীর্ঘ হইতে পারে। কাজে কাজেই মাত্রা-পদ্ধতির দিক্ দিয়া তিনটি 'বৃত্তে' বাংলা ছন্দের ভাগ করার কোন কারণ নাই। আজকাল অনেকে এইজন্য 'অক্ষরবৃত্ত'কে 'যৌগিক' বলিতেছেন। কিন্তু 'স্বরবৃত্ত', 'মাত্রাবৃত্ত' ও 'যৌগিক'—এইরূপ ভাগ যে কিরূপ যুক্তি-তর্কের বিরুদ্ধ, তাহা সহজেই প্রতীত হয়।

বাংলা কাব্য হইতে বহু শত উদাহরণ দিয়া দেখান যায় যে, প্রস্তাবিত ত্রিধা বিভাগ স্বীকার করিলে অনেক বাংলা কবিতাই ছন্দের রাজ্য হইতে বাদ পড়ে। নিম্নে বিভিন্ন যুগের লেখা হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। কিন্তু ইহাদের কোনটিতেই কোন 'বৃত্তের' নিয়ম খাটে না।

(১) জন : জামাই | ভাগ্ না
তিন : নয় | আপ্ না।

(২) বৃষ্টি পড়ে | টাপুর্ টুপুর্ | নদী এল | বান
শিব ঠাকুরের | বিয়ে হল | তিন্ কন্তে | দান।

(৩) ডাক্ দিয়ে কয় | দেবীবর
নিকুল | শোভাকর
ডাক্ দিয়ে কয় | শোভাকর
নির্বংশ | দেবীবর।

(৪) যে রঙ্কন | খেয়েছি (= খেয়্ছি) আমি | বার বৎসর | আগে
আজ কেন | জিভে আমার | সেই রঙ্কন | লাগে।

(৫) শুক বলে | আমার কৃষ্ণ | জগতের | কালো
শারী বলে | আমার রাধার | রূপে জগৎ | আলো।

(৬) কহিছেন | মুনিবর | এম্‌নি ক'রে | যেতেই কি হয়

চাই] লক্ষ কথা | সমাপন | এই কথার | উত্থাপন,

দিনক্ষণ | চাই নিরূপণ | ওঠ্ ছুড়ী তোর | বিয়ে নয়

(৭) কি বলিলে : পোড়ারমুখ | কুল করিতে : যায়

সর্ব্বাঙ্গ : জলে' গেল | অগ্নি দিল : গায়।

(৮) এরা) পর্দ্দা তুলে | ঘোম্‌টা খুলে | সেজে গুজে | সভায় যাবে

ড্যাম্ হিন্দু | য্যানি বোলে | বিন্দু বিন্দু | ব্রাণ্ডি খাবে।

(৯) কোথায় বৈশবী দল ? | বিদ্যাসাগর কোথা ?

মুখুজ্যের কারচুপিতে | মুখ হৈল ভোঁতা।

ও যতীন্দ্র, কৃষ্ণদাস ! | একবার দেখ চেয়ে,

বকুলতলার পথের ধারে | কত শত মেয়ে।

(১০) সন্ধ্যা গগনে | নিবিড় কালিমা | অরণ্যে খেলিছে নিশি

ভীত বদনা | পৃথিবী হেরিছে | ঘোর অন্ধকারে মিশি

হী হী শবদে | অটবী পূরিছে | জাগিছে প্রমথগণ

অট্টহাসেতে | বিকট ভাষেতে | পূরিছে বিটপী বন

কূট করতালি | কবন্ধ তালিছে | ডাকিনী দুলিছে ডালে,

বিল্ব বিটপে | ব্রহ্ম পিশাচ | হাসিছে বাজায়ে গালে।

ঢঙের কবিতাতেই ছন্দের আবশ্যক মত open ও closed সব রকম syllable-ই দীর্ঘ হইতে পারে। কাজে কাজেই মাত্রা-পদ্ধতির দিক্ দিয়া তিনটি 'বৃত্তে' বাংলা ছন্দের ভাগ করার কোন কারণ নাই। আজকাল অনেকে এইজন্য 'অক্ষরবৃত্ত'কে 'যৌগিক' বলিতেছেন। কিন্তু 'স্বরবৃত্ত', 'মাত্রাবৃত্ত' ও 'যৌগিক'—এইরূপ ভাগ যে কিরূপ যুক্তি-তর্কের বিরুদ্ধ, তাহা সহজেই প্রতীত হয়।

বাংলা কাব্য হইতে বহু শত উদাহরণ দিয়া দেখান যায় যে, প্রস্তাবিত ত্রিধা বিভাগ স্বীকার করিলে অনেক বাংলা কবিতাই ছন্দের রাজ্য হইতে বাদ পড়ে। নিম্নে বিভিন্ন যুগের লেখা হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। কিন্তু ইহাদের কোনটিতেই কোন 'বৃত্তের' নিয়ম খাটে না।

(১) জন : জামাই | ভাগ্ না

তিন : নয় | আপ্ না।

(২) বৃষ্টি পড়ে | টাপুর্ টুপুর্ | নদী এল | বান

শিব ঠাকুরের | বিয়ে হল | তিন্ কন্যে | দান।

(৩) ডাক্ দিয়ে কয় | দেবীবর

নির্কুল | শোভাকর

ডাক্ দিয়ে কয় | শোভাকর

নির্বংশ | দেবীবর।

(৪) যে রঞ্জন | খেয়েছি (= খেয়্ ছি) আমি | বার বৎসর | আগে

আজ কেন | জিভে আমার | সেই রঞ্জন | লাগে।

(৫) শুক বলে | আমার কৃষ্ণ | জগতের | কালো

শারী বলে | আমার রাধার | রূপে জগৎ | আলো।

(৬) কহিছেন | মুনিবর | এম্‌নি ক'রে | যেতেই কি হয়

চাই] লক্ষ কথা | সমাপন | এই কথার | উত্থাপন,

দিনক্ষণ | চাই নিরূপণ | ওঠ ছুঁড়ী তোর | বিয়ে নয়

(৭) কি বলিলে : পোড়ারমুখ | কুল করিতে : যায়

সর্ব্বাঙ্গ : জ্বলে' গেল | অগ্নি দিল : গায়।

(৮) এরা) পর্দ্দা তুলে | ঘোম্‌টা খুলে | সেজে গুজে | সভায় যাবে

ডান্ হিন্দু | যাঁনি বোলে | বিন্দু বিন্দু | ব্রাণ্ডি খাবে।

(৯) কোথায় বৈশবী দল ? | বিদ্যাসাগর কোথা ?

মুখুজ্যের কারচুপিতে | মুখ হৈল ভোঁতা।

ও যতীন্দ্র, কৃষ্ণদাস ! | একবার দেখ চেয়ে,

বকুলতলার পথের ধারে | কত শত মেয়ে।

(১০) সন্ধ্যা গগনে | নিবিড় কালিমা | অরণ্যে খেলিছে নিশি

ভীত বদনা | পৃথিবী হেরিছে | ঘোর অন্ধকারে মি'শি

হী হী শবদে | অটবী পূরিছে | জাগিছে প্রমথগণ

অট্টহাসেতে | বিকট ভাবেতে | পূরিছে বিটপী বন

কূট করতালি | কবন্ধ তালিছে | ডাকিনী দুলিছে ডালে,

বিধ বিটপে | ব্রহ্ম পিশাচ | হাসিছে বাজায়ে গালে।

(১১) "জয় রাণা | রামসিংহের | জয়"—
মেত্রপতি | উ দ্বস্বরে | কয়
কনের বক্ষ | কেঁপে উঠে | ডরে,
দুটি চক্ষু | ছল্ ছল্ | করে,
বরযাত্রী | হাঁকে সম | স্বরে
"জয় রাণা | রামসিংহের | জয়।"

(১২) ছুটল কেন : মহেন্দ্রের | আনন্দের : ঘোর
টুটল কেন : উর্ব্বশীর | মঞ্জিরের : ডোর
বৈকালে : বৈশাখী : এল | আকাশ : লুণ্ঠনে
শুক্লরাতি : ঢাক্‌ল মুখ | মেঘাব : গুণ্ঠনে

এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, এখানে বিভিন্ন 'বৃত্তে'র নিয়মের ব্যভিচারী যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইল, সেগুলিকে শুদ্ধ 'স্বরবৃত্ত', শুদ্ধ 'অক্ষরবৃত্ত' বা শুদ্ধ 'মাত্রাবৃত্তে'র উদাহরণ নহে। এই সমস্ত 'ব্যভিচারী' কবিতাকে তবে কি বলা হইবে? আশাকরি, তাহাদিগকে ছন্দোদুষ্ট বলিতে কেহ সাহস করিবেন না—বহুকাল হইতে বাঙালীর কান ঐ সমস্ত কবিতার ছন্দে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। বাংলা ছন্দের জগতে তাহাদের কোনও একটা স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে। তবে কি প্রত্যেক 'বৃত্তে'র প্রাচীন ও আধুনিক, শুদ্ধ ও ব্যভিচারী-ভেদে ছয়টি কি নয়টি, কি ততোঽধিক বিভাগ করিতে হইবে? কিন্তু বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রাচীন 'স্বরবৃত্ত' বা প্রাচীন 'মাত্রাবৃত্ত' বা প্রাচীন 'অক্ষরবৃত্ত', ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট একই মাত্রা-পদ্ধতি দেখা যায় না। আবশ্যক মত' হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ করাই চিরন্তন রীতি। তাহা ছাড়া, 'ব্যভিচারী

স্বরবৃত্ত' ইত্যাদি সংজ্ঞা দিলে তো কোন পদ্ধতি স্থির করা হয় না, কেবল মাত্র 'স্বরবৃত্ত' ইত্যাদির প্রস্তাবিত নিয়মের ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত সতীদেহের ন্যায় বাংলা ছন্দকে বহু খণ্ডে বিভাগ করিতে হইবে, তাহাতেও সব অসুবিধার পার পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।

বাংলা ছন্দের প্রস্তাবিত ত্রিধা বিভাগ সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। বাংলা ভাষার কোন যুগেই তথাকথিত তিনটি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে কবিতা রচনা হয় নাই। 'বৌদ্ধগান ও দোহা', 'শূন্যপুরাণ' ইত্যাদি রচনার সময় হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কোন সময়েই তিনটি পৃথক্ মাত্রা-পদ্ধতি বাংলা ছন্দে দেখা যায় না। সর্ব্বদাই Beat and Bar Theory বা পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদ অনুযায়ী রীতিতে মাত্রা নির্ণীত হইতেছে দেখা যায়। একই চরণের মধ্যে কতকটা তথাকথিত 'স্বরবৃত্তে'র, কতকটা তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্তে'র লক্ষণ নানাভাবে জড়িত হইয়া আছে দেখা যায়। যে ছন্দ বাংলা কবিতার প্রধান বাহন, যাহাতে বাংলার সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত কোন গভীর ভাবপূর্ণ কবিতায় যে ছন্দ অপরিহার্য্য, সেই ছন্দে অর্থাৎ পয়ার-জাতীয় ছন্দে প্রস্তাবিত কয়েকটি "বৃত্তের" নিয়মগুলির মিশ্রণ তো সুস্পষ্ট। যাহারা পূর্ব্বে ইহাকে 'অক্ষরবৃত্ত' বলিয়াছেন, তাঁহারা এই সংজ্ঞার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া এখন বলিতেছেন যে, ইহা 'যৌগিক' ছন্দ, অর্থাৎ 'স্বরবৃত্ত' ও 'মাত্রাবৃত্তে'র বর্ণসঙ্কর। কিন্তু তাঁহারা যাহাকে 'স্বরবৃত্ত' ও 'মাত্রাবৃত্ত' বলিতেছেন, তাহার বয়স অতি কম। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনুকারকগণের কাব্য দেখিয়া তাঁহারা বাংলা ছন্দের তিনটি বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন। প্রাচীন কাব্যের 'স্বরবৃত্ত' তাঁহাদের কল্পিত নিয়ম মানিয়া চলে না, প্রাচীন 'মাত্রাবৃত্ত'ও তাঁহাদের নিয়ম মানে না। আধুনিক 'স্বরবৃত্ত' ও মাত্রাবৃত্ত' মিশাইয়া যে পয়ার-জাতীয় ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এ মত একান্ত অগ্রাহ্য। তাঁহাদের স্বকল্পিত ছন্দঃশাস্ত্র অনুসারে যদি পয়ার-জাতীয় ছন্দের ব্যাখ্যা খুঁজিয়া না পান, তবে সে দোষ তাঁহাদের কল্পিত ছন্দঃশাস্ত্রের; বাংলা ছন্দের মূল তত্ত্বটি যে তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই, তাহা ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, **মাত্রাপদ্ধতির দিক্ দিয়া বাংলায় যে তিনটি স্বতন্ত্র 'বৃত্ত' আছে, তাহা কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না।**

এই division সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ,—যত রকম fallacies of division আছে, সমস্তই ইহাতে পাওয়া যায়।

আধুনিক অনেক কবিতাকেই অবশ্য যে কোন একটি 'বৃত্তে' ফেলিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু আসলে বাংলা ছন্দের পদ্ধতি এক ও অপরিবর্ত্তনীয়। পূর্ব্বোক্ত Beat and Bar Theory-তে সূত্রাকারে সেই পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। আধুনিক কবিরা সেই পদ্ধতি বজায় রাখিয়াই কোন কোন দিক্ দিয়া এক-একপ্রকার বাঁধা-ধরা রীতি বাংলা কাব্যের ছন্দে আনিতেছেন। কিন্তু সেই রীতি দেখিয়াই বাংলা ছন্দের মূল প্রকৃতি বুঝা যায় না। **আধুনিক এক একটি রীতিতে বাংলা ছন্দের কোন একটি প্রবৃত্তির চরম অভিব্যক্তি হইয়াছে।** আধুনিক 'স্বরমাত্রিক' ছন্দে যৌগিক অক্ষর মাত্রেরই হ্রস্বীকরণ হয়; পরন্তু আধুনিক 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে যৌগিক অক্ষরমাত্রেরই দীর্ঘীকরণ হয়। ইচ্ছা করিলে অন্যান্য বিশিষ্ট রীতির ছন্দও কবিরা চালাইতে পারেন; যেমন, এমন এক রীতির ছন্দ চালান সম্ভব যে, তাহাতে কেবল মাত্র হলন্ত অক্ষরেরই দীর্ঘীকরণ হইবে, কিন্তু যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণ চলিবে না। **কিন্তু বাংলা ছন্দের যে প্রবৃত্তিকেই কবিরা বিশেষ ভাবে ফুটাইয়া তুলুন না কেন, মূল সূত্রগুলিকে তাঁহাদের মানিয়া চলিতেই হইবে।** কিন্তু আধুনিক কবিরা যে সর্ব্বদাই আধুনিক 'স্বরমাত্রিক' বা আধুনিক 'মাত্রাবৃত্ত' বা 'বর্ণমাত্রিক' ছন্দে লেখেন, তাহাও নয়।

যাহা হউক, মাত্রা-পদ্ধতির দিক্ দিয়া যে বাংলা ছন্দে তিনটি স্বতন্ত্র জাতি আছে, এরূপ মনে করার পক্ষে কোন যৌক্তিকতা নাই।

ছন্দের ঢঙ্

যে তিন ধরণের কবিতার কথা আধুনিক কবিরা বলেন, তাহাদের বিশেষত্ব ও পরস্পর পার্থক্য মাত্রা গুণিবার রীতিতে নয়। ছন্দোবন্ধনের জন্য অবশ্য মাত্রার হিসাব ঠিক্-ঠাক্ বজায় রাখা আবশ্যক, কিন্তু কোথায় কোন্ অক্ষরটি হ্রস্ব, কোন্ অক্ষরটি দীর্ঘ—এইটুকু স্থির করিতে পারিলেই ছন্দের ধাত্‌টি ঠিক জানা হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন তাল ছাড়াও রাগ-রাগিণী আছে, তেমনি ছন্দেও নানা রকম ঢঙ্ আছে। যে তিন রকম ঢঙের কবিতা বাংলায় প্রচলিত, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে দিতেছি।

[১] তান-প্রধান ছন্দ (পয়ার-জাতীয় ছন্দ)

বাংলা কাব্যের যেটি সনাতন ও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত ঢঙ্, তাহার নাম দিতেছি পয়ারের ঢঙ্। এই ঢঙে যে সমস্ত কবিতা রচিত তাহাদিগকে 'পয়ার-জাতীয়' বলা যাইতে পারে।

এই ছন্দকেই 'অক্ষরমাত্রিক', 'বর্ণ-মাত্রিক', 'অক্ষরবৃত্ত' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়; কারণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই ঢঙের কবিতায় মাত্রাসংখ্যা হরফ বা বর্ণের সংখ্যার অনুযায়ী হইয়া থাকে। ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্মত কোন ব্যাখ্যা খুঁজিলে বলিতে হয় যে, এই ছন্দে **সাধারণতঃ** প্রত্যেক syllable বা অক্ষরকে একমাত্রা ধরা হয়, কেবল কোন শব্দের শেষে হলন্ত syllable বা অক্ষর থাকিলে তাহাকে দুই মাত্রার ধরা হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এই মাত্রা-পদ্ধতি যে সর্ব্বত্র বজায় থাকে, তাহা নহে। মাত্রা পদ্ধতির দিক্ দিয়া ইহার যথার্থ স্বরূপ ধরা যায় না।

পয়ারের ঢঙে কোন কবিতা পাঠ করার সময় শুদ্ধ অক্ষর-ধ্বনি ছাড়াও একটা টানা সুর আসে। এই টানটাই পয়ারের বিশেষত্ব। এই টানটুকুকে সংস্কৃতের 'তান' শব্দ দ্বারা অভিহিত করিতেছি (ইংরেজীতে vocal drawl)। অক্ষরের ধ্বনির সহিত এই টান বা তান মিশিয়া থাকে, কখনও কখনও অক্ষরের ধ্বনিকে ছাপাইয়াও উঠে, এবং স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়। উপমা দিয়া বলা যায় যে, পয়ার-জাতীয় ছন্দে এক একটি ছন্দোবিভাগ যেন এক একটি তানের

প্রবাহ। স্রোতের মধ্যে ছোট বড় উপলখণ্ড ফেলিলে যেমন সহজেই তাহারা স্থান করিয়া লইতে পারে, পয়ারের একটানা সুরের মধ্যে তদ্রূপ মৌলিক-স্বরান্ত বা যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর প্রভৃতি সহজেই স্থান করিয়া লইতে পারে। পয়ারের এক একটি মাত্রা এই ধ্বনিপ্রবাহের এক একটি অংশ। এক একটি পূর্ণকায় হরফ বা বর্ণ—('ং, ঃ, ৎ' ইত্যাদিকে গণনার বাহিরে রাখা হয়) এইরূপ এক একটি অংশ মোটামুটি নির্দ্দেশ করে। সুতরাং অনেক সময় হরফ গুণিয়া মাত্রার হিসাব পাওয়া যায়। এই হিসাবে এ ছন্দকে 'বর্ণমাত্রিক' বলা হইয়া থাকে, যদিও এ নামটিতে এই ছন্দের মূল কথাটি নির্দ্দেশ করা হয় না। কেবল মাত্র অক্ষরধ্বনি দিয়াই পয়ারের এক একটি মাত্রা পূর্ণ হয় না; এই জন্য শুদ্ধ ধ্বনি হিসাবে যে সমস্ত অক্ষর সমান নয়, তাহারাও পয়ারে সমান হইতে পারে। বিদেশীর কানে এই বিশেষ লক্ষণটি সহজেই ধরা পড়ে, এই জন্য তাঁহারা বাঙালীর আবৃত্তিকে sing-song গোছের অর্থাৎ সুর করিয়া পাঠ করার মতন বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক, গানে যেমন সুর আছে, বাঙালীর এই সুপ্রচলিত ছন্দে তেমনি একটা টান বা তান আছে। এই টানটিকে বাদ দিলে পয়ার-জাতীয় কবিতা পড়াই অসম্ভব হইবে। এই লক্ষণটি কেবল যে প্রাচীন পয়ারে পাওয়া যায়, তাহা নহে; আধুনিক কালে লিখিত পয়ার-জাতীয় কবিতা মাত্রেই ইহা আছে। অন্যত্র বলিয়াছি যে, 'ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া দুই একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে।' পয়ার-জাতীয় রচনায় অক্ষরের অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া মূল স্বরের ঝঙ্কারকেই অবলম্বন করিয়া ছন্দ গড়িয়া উঠে। মূল স্বরের ধ্বনিই এ ছন্দে প্রধান, ব্যঞ্জনাদি অপরাপর বর্ণকে মূল স্বরের অধীন এবং মাত্র ইহার আকার-সাধক বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং ছন্দোবন্ধনের হিসাবে ব্যঞ্জনাদি গৌণধ্বনির এখানে মূল্য দেওয়া হয় না। অক্ষরের স্বরাংশকে প্রাধান্য দিয়া যে পয়ার জাতীয় ছন্দে একটানা একটা ধ্বনি-প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়, এবং এই ধ্বনি-প্রবাহের এক একটি অংশে যে কোন প্রকারের অক্ষরের স্থান সঙ্কুলান করা যায়, তাহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। নিম্নোক্ত যে কোন কবিতাতেই ইহা লক্ষিত হইবে।

(১) মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।

(২) বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ,
বিমর্ষ নিস্তব্ধ ভাব চিন্তিত ব্যাকুল।

(৩) জয় ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্
জয় জয় ভবপতি।
করি প্রণিপাত, এই কর নাথ—
তোমাতেই থাকে মতি।

(৪) হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।
তা' সবে (অবোধ আমি !) অবহেলা করি'
পরধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ।

(৫) এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।

শুদ্ধ অক্ষরধ্বনিকে প্রাধান্য না দিয়া, তাহাকে সুরের টানের অধীন রাখা হয় বলিয়া পয়ার-জাতীয় ছন্দে যতগুলি অক্ষর এক পর্ব্বে সমাবেশ করা যায়, অন্য ঢঙে লেখা কবিতায় ততগুলি করা যায় না। আট মাত্রা, দশ মাত্রার পর্ব্ব এই পয়ার জাতীয় ছন্দেই দেখা যায়।

অন্যান্য ঢঙে লেখা কবিতা হইতে পয়ার-জাতীয় ছন্দের পার্থক্য বুঝিতে হইলে এইরূপ টানা সুরের প্রবাহ আছে কিনা, অক্ষরকে অতিক্রম করিয়া ধ্বনি-প্রবাহ চলিতেছে কিনা, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। কেবল-মাত্র মাত্রার হিসাব হইতে কবিতার ঢঙ অনেক সময় বুঝা যাইবে না।

পয়ার-জাতীয় ছন্দের আর একটি রীতির (অর্থাৎ কোনও শব্দের শেষের হলন্ত অক্ষরকে দুই মাত্রা ধরার) হেতু বুঝিতে হইলে, পয়ারের আর একটি লক্ষণ বুঝিতে হইবে। 'বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব' শীর্ষক অধ্যায়ের ২ গ পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা বাংলার একটি বিশিষ্ট রীতি। পয়ার জাতীয় কবিতায় এই রীতির চরম অভিব্যক্তি দেখা যায়। ঐ প্রবন্ধে যে বলিয়াছি, 'বাংলা ছন্দের এক একটি পর্ব্বকে কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মনে না করিয়া, কয়েকটি শব্দের সমষ্টি বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে', তাহা পয়ার-জাতীয় ছন্দের পক্ষেই বিশেষরূপে খাটে। বাংলার উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক শব্দের প্রথমে স্বরের গাম্ভীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, শব্দের শেষে সর্ব্বাপেক্ষা কম। কিন্তু হলন্ত অক্ষরকে এক মাত্রার ধরিয়া উচ্চারণ করিতে গেলে উচ্চারণ কিছু দ্রুত লয়ে হওয়া দরকার; সুতরাং বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ক্ষিপ্রতর ও অবলীল হওয়া দরকার। কিন্তু যেখানে স্বর-গাম্ভীর্য্য কমিয়া আসিতেছে, সেখানে এবংবিধ ক্রিয়া হওয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং শব্দের অন্তিম হলন্ত অক্ষরকে একমাত্রার ধরিয়া পড়িতে গেলে শব্দের শেষে স্বর-গাম্ভীর্য্যের বৃদ্ধি হওয়া দরকার। কিন্তু সেরূপ করা স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণের বিরোধী। সুতরাং পয়ার-জাতীয় ছন্দে শব্দের অন্তিম হলন্ত অক্ষরকে একমাত্রার না ধরিয়া দুইমাত্রার ধরা হয়। বিশেষতঃ যেখানে স্বর-গাম্ভীর্য্যের হ্রাস হইতেছে, সে ক্ষেত্রে লয় স্বভাবতঃই একটু মন্থর হইয়া থাকে। এই কারণেও শব্দের অন্তিম হলন্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণ করার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক।

পয়ার-জাতীয় ছন্দের ব্যবহারই বাংলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কারণ সাধারণ কথাবার্ত্তায় এবং গদ্যে আমরা যে ঢঙের অনুসরণ করি, সেই ঢঙ ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বজায় থাকে। কয়েক লাইন গদ্য বা নাটকীয় ভাষা লইয়া তাহার মাত্রা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, পয়ারের ও গদ্যের মাত্রানির্ণয়, একই রীতি অনুসারেই হইতেছে। উদাহরণ-স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'রামায়ণী কথা' ও 'হাস্যকৌতুক' হইতে উদ্ধৃত অংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কারণে নাট্যকাব্যে, মহাকাব্যে, চিন্তাগর্ভ কাব্যে এই ঢঙের ব্যবহার দেখা যায়।

পয়ার-জাতীয় ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহার অপর কয়েকটি বিশেষ গুণের তাৎপর্য্য পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথ পয়ারের আশ্চর্য্য 'শোষণ শক্তি'-র কথা বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ পয়ারের (৮+৬=) ১৪ মাত্রা বজায় রাখিয়াই যুক্তাক্ষরহীন পয়ারকে যুক্তাক্ষর-বহুল পয়ারে পরিবর্ত্তিত করা যায়। ইহার হেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পয়ারের একটানা তান বা ধ্বনি-স্রোতের এক একটি অংশের মধ্যে লঘু, গুরু—সব রকম অক্ষরই সহজে ডুবিয়া যায় বলিয়া এইরূপ হওয়া সম্ভব। বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকে, সেই ফাঁকটা সাধারণতঃ সুরের টান দিয়া ভরান থাকে। সুতরাং লঘু অক্ষরের স্থানে গুরু অক্ষর বসাইলে ছন্দের হানি হয় না। এই জন্য তৎসম, অর্দ্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, সব রকমের শব্দ সহজেই পয়ারে স্থান পাইতে পারে।

কিন্তু পয়ার-জাতীয় ছন্দে অক্ষর-যোজনার একটা সীমা আছে। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন যে, 'দুর্দ্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত' এইরূপ চরণেই যেন পয়ারের ধ্বনির স্থিতিস্থাপকতার চরম সীমা রক্ষিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে

আমি এই সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছি—পর্ব্বাঙ্গের শেষ অক্ষরটি লঘু হওয়া আবশ্যক। 'বৈদান্তিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত' বলিলে, তাহা আর কিছুতেই ১৪ মাত্রার বলিয়া ধরা চলিবে না, কারণ 'তিক্' অক্ষরটিকে পয়ারে দীর্ঘ ধরিতেই হইবে।

পয়ারের মধ্যে সুরের টান থাকে বলিয়া ইহার গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর। এতদ্ভিন্ন পয়ার-জাতীয় ছন্দে কখনও যৌগিক অক্ষরের হ্রস্বীকরণ, কখনও দীর্ঘীকরণ করিতে হয় বলিয়া পয়ারে লয় সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। লয় পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া সর্ব্বদাই পাঠককে 'কান খাড়া' করিয়া থাকিতে হয়, পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ বিভাগের দিকে বিশেষ অবহিত থাকিতে হয়। এই জন্য পয়ারের ছন্দে কখন নৃত্যচপল বা ক্ষিপ্র গতি, কিম্বা গা-ঢালা আরাম বা বিলাসের ভাব আসে না—পরন্তু স্বভাবতঃই একটা অবহিত, সংযত সুতরাং গম্ভীর ভাব আসে। এই জন্য উচ্চাঙ্গের কবিতা পয়ার-জাতীয় ছন্দেই রচনা হইয়া থাকে। অন্যত্র বলিয়াছি যে, এই ছন্দে যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ-কৌশলে কতকটা সংস্কৃত 'বৃত্ত' ছন্দের অনুরূপ একটা মন্থর, গভীর, উদাত্ত ভাব আসিতে পারে। 'কারণ এই ছন্দে পদ-মধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না এবং তাহার পরে কোনরূপ বিরাম বা ঝঙ্কারের অবসর থাকে না। সুতরাং এখানে ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত আছে। সুতরাং সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহার-কৌশলে একটা ধ্বনির তরঙ্গ সৃষ্টি হয়।' এতদ্ভিন্ন, মাঝে মাঝে লয়ের পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া স্পন্দন-বৈচিত্র্যও পাওয়া যায়। সুতরাং যে rhythmic harmony 'বৃত্ত' ছন্দের প্রাণ, তাহা অন্ততঃ মাত্রা-সম্বন্ধের অতিরিক্ত অলঙ্কাররূপেও পয়ার ছন্দে পাওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কৃতী। রবীন্দ্রনাথের 'তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্ম্মরিত পল্লব বীজনে' প্রভৃতি চরণেও এইরূপ ভাব পাওয়া যায়। Milton-এর blank verse-এর গাম্ভীর্য্যেরও অন্যতম কারণ এবংবিধ substitution বা লয়-পরিবর্ত্তন। যাহা হউক, এই সমস্ত কারণে পয়ার-জাতীয় ছন্দের সুর উচু করিয়া বাঁধা যায়। বাংলা ছন্দে পয়ারই ধ্রুপদ-জাতীয়।

রবীন্দ্রনাথ এ ঢঙের ছন্দকে সাধুভাষার ছন্দ বলেন, কারণ এ ছন্দে যুক্তাক্ষর বহুল সাধু ভাষার শব্দ প্রয়োগের সুবিধা বেশী। কিন্তু সাধু-ভাষা হইলেই যে এই ঢঙের ছন্দ হইবে তাহা নয়। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ

সাধু ভাষা এবং বহু তৎসম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ঐ কবিতাটি এ ঢঙে রচিত নয়।

পয়ারের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ আছে। রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে, পয়ারে দুই বা দুইয়ের গুণিতক যে কোন সংখ্যক মাত্রার পরে ছেদ বসান যায়। কিন্তু পয়ার-জাতীয় ছন্দে তিন মাত্রার পরেও ছেদ বসান চলে। যথা,—

> বিশেষণে সবিশেষ | কহিবারে পারি।
> জান তো * স্বামীর নাম | নাহি লয় নারী ॥

এখানে অন্বয় অনুসারে দ্বিতীয় চরণের প্রথম তিন অক্ষরের পর একটি উপচ্ছেদ বসান চলে। অমিত্রাক্ষরে ইহার উদাহরণ যথেষ্ট ; যথা—

> নিশার স্বপন সম | তোর এ বারতা ॥
> রে দূত ! * * অমর-বৃন্দ | যার ভুজবলে ॥
> কাতর, * সে ধনুর্দ্ধরে | রাঘব ভিখারী ॥ (মধুসূদন)
> কি স্বপ্নে কাটালে তুমি | দীর্ঘ দিবানিশি
> অহল্যা, * পাষাণরূপে | ধরাতলে মিশি (রবীন্দ্রনাথ)

আসলে, রবীন্দ্রনাথ পয়ার-জাতীয় ছন্দের একটি ধর্ম্মের বিশেষ একটি প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছেন। পয়ার-জাতীয় ছন্দে যে কোন পর্ব্বাঙ্গের পরেই ছেদ বসান যায় ; কেবল উপচ্ছেদ নহে, পূর্ণচ্ছেদ পর্য্যন্ত বসান চলে। পয়ার ছন্দে শব্দের মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রাখা যায় বলিয়াই এইরূপ করা চলে। এ ছন্দে ছেদ যতির অধীনতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে। এই কারণে যথার্থ blank verse বা অমিতাক্ষর কাব্য মাত্র পয়ার-জাতীয় ছন্দেই রচিত হইতে পারে।

পয়ার-জাতীয় ছন্দের বিরুদ্ধে কেহ কেহ যে সমস্ত 'নালিশ' আনিয়াছেন, সেগুলি একান্ত ভিত্তিহীন। ইহাতে 'বাংলা ভাষার যথার্থ রূপটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে' এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত-সিদ্ধান্ত-প্রণোদিত ; বরং সাধারণ উচ্চারণ-রীতি এই ছন্দেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বজায় আছে। যদি কেহ ইহাকে 'একঘেয়ে' বলেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তিনি 'মেঘনাদবধ-কাব্য' অথবা রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' অথবা 'দেবতার গ্রাস' প্রভৃতি কবিতা বিশ্লেষ বা বিচার করেন নাই। যিনি ইহাকে 'নিস্তরঙ্গ' বলেন, তিনি 'বর্ষশেষ',

'সিন্ধুতরঙ্গ' প্রভৃতি কবিতার প্রতি সুবিচার করেন নাই। পয়ার-জাতীয় ছন্দ যে, লিপিকরদিগের চাতুরি হইতে উৎপন্ন, অথবা ইহাতে যে ধ্বনিশাস্ত্রকে ফাঁকি দেওয়া হয়, এ কথা বলিলে মাত্র বাংলা ছন্দের ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বোধের অভাব প্রকাশ করা হয়। পয়ার-জাতীয় ছন্দে 'যতি অনিয়মিত এবং পর্ব্ববিভাগ অস্পষ্ট', এরূপ অভিযোগ অভিযোক্তার ছন্দোবোধের গভীরতা বা সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে সন্দেহ আনয়ন করে।

পূর্ব্বকালে যে সমস্ত ছন্দ কাব্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলি সমস্তই পয়ার-জাতীয়। শুধু পয়ার নহে, ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি সমস্তই তান-প্রধান বা পয়ার-জাতীয় ছন্দে রচিত হইত।

পয়ারে দুই চরণ, ও প্রতি চরণে দুইটি পর্ব্ব থাকিত। প্রথম পর্ব্বে ৮ ও দ্বিতীয় পর্ব্বে ৬ মাত্রা থাকিত। চরণ দুইটি পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত।

লঘু ত্রিপদীরও দুই মিত্রাক্ষর চরণ, এবং প্রতি চরণে তিনটি পর্ব্ব থাকিত। মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৬+৬+৮।

দীর্ঘ ত্রিপদীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৮+৮+১০।

ত্রিপদী মাত্রেরই প্রথম দুইটি পর্ব্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত।

একাবলীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৬+৫। যথা—

বড়র পীরিতি | বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি | ক্ষণেকে চাঁদ

চৌপদীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৬+৬+৬+৫। যথা—

এক দিন দেব | তরুণ তপন, | হেরিলেন সুর | নদীর জলে;
অপরূপ এক | কুমারী-রতন | খেলা করে নীল | নলিনী দলে।
(বিহারীলাল)

মালঝাঁপের মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৪+৪+৪+২; প্রথম তিনটি পর্ব্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত। যথা,—

কোতোয়াল | যেন কাল | খাঁড়া ঢাল | হাঁকে (ভারতচন্দ্র)

মালতীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৮+৭; পয়ারের শেষে এক মাত্রা যোগ করিয়া মালতী ছন্দ হইত। যথা,—

বড় ভালবাসি আমি | তারকার মাধুরী
মধুর মুরতি এরা | জানেনাক চাতুরী (বিহারীলাল)

এ সমস্ত ছন্দেই মিত্রাক্ষর দুইটি চরণ লইয়া স্তবক গঠিত হইত।

প্রাচীনকালের পয়ারাদি ছন্দে সর্ব্বদাই অক্ষর গণিয়া মাত্রার হিসাব পাওয়া যাইবে না। আবশ্যক মত হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। যথা,—

বাক্য চাতুরী করি | দিবাতে মাগিয়া
সন্ধ্যাকালে যাও ভাল | গৃহস্থ দেখিয়া
(বংশীবদন, মনসা-মঙ্গল)

গ্রাম রত্ন ফুলিয়া | জগতে বাখানি
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে | গঙ্গা তরঙ্গিণী
(কৃত্তিবাস, আত্মপরিচয়)

পিককুল কলকল | চঞ্চল অলিদল, | উছলে সুরব জল, | চল লো বনে
(মধুসূদন)

[২] ধ্বনি-প্রধান ছন্দ (মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিমাত্রিক ছন্দ)

আর এক ঢঙের কবিতাকে 'মাত্রাবৃত্ত' নাম দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এই নামটি খুব সুষ্ঠু বলা যায় না। কারণ, বাংলা তথা উত্তর-ভারতীয় সমস্ত প্রাকৃত ভাষাতেই সমমাত্রিক পর্ব্ব লইয়া ছন্দ রচিত হয়। সংস্কৃতে 'মাত্রাবৃত্ত' যে অর্থে প্রচলিত, সেই অর্থে সমস্ত বাংলা ছন্দ-ই মাত্রাবৃত্ত বলা যাইতে পারে।

কেবল-মাত্র মাত্রাপদ্ধতির খোঁজ করিলে অন্যান্য ঢঙের কবিতার সহিত এই ঢঙের কবিতার পার্থক্য বুঝা যাইবে না। আধুনিক সময়ে কবিরা মোটামুটি একটা স্থির পদ্ধতি অনুসারে এই ধরণের কবিতায় মাত্রা-যোজনা করেন, অর্থাৎ যৌগিক অক্ষরমাত্রকেই দীর্ঘ ধরেন এবং অপর সব অক্ষরকে হ্রস্ব ধরেন। তবে সর্ব্বদাই যে অবিকল এই নিয়ম অনুসরণ করেন, তাহা নহে; মৌলিক স্বরের দীর্ঘীকরণের উদাহরণও যে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে কিন্তু অক্ষরের মাত্রা সম্বন্ধে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থির পদ্ধতি ছিল না। পদাবলী সাহিত্যে তাহাই দেখা যায়। নিম্নোক্ত উদাহরণ হইতেই ইহা বুঝা যাইবে—

চ ম্প ক দাম হেরি | চি ত অ তি কম্পিত | লোচনে ব হে অ নু রা গ।

তু য়া রূপ অ ন্ত র | জা গ য়ে নি র ন্ত র | ধ নি ধ নি তোহারি সোহাগ।

এখানে হ্রস্ব বা দীর্ঘ বলিয়া অক্ষরের দুই বিভিন্ন জাতি স্বীকার করা হয় নাই ; অথচ ইহা খাঁটি 'মাত্রাবৃত্ত' ঢঙের উদাহরণ। অতি প্রাচীন কালের মাত্রাবৃত্ত ঢঙের কবিতাতে,—যেমন 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'য়—এই লক্ষণ দেখা যায়,—

⏑ — ⏑ — ⏑ ⏑ — ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ —
ধামার্থে চা টি ল | সা ঙ্ক ম গ ঢ ই

⏑ ⏑ ⏑ — — — ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ —
পা র গামি লো অ | নি ভ র ত র ই

বস্তুতঃ বাংলা প্রভৃতি ভাষাতে কবিতায় কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অক্ষরের মাত্রা স্থির থাকে না। অর্ব্বাচীন প্রাকৃত হইতে প্রাচীন বাংলা প্রভৃতির পার্থক্যের এই অন্যতম লক্ষণ।

সুতরাং মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ও পয়ার-জাতীয় ছন্দের তুলনা করিলে, মাত্রা-পদ্ধতির দিক্ দিয়া খুব বেশী পার্থক্য দেখা যাইবে না। ছন্দের আবশ্যক মত অক্ষরের দীর্ঘীকরণ উভয়-জাতীয় ছন্দেই চলে, তবে মাত্রাবৃত্ত-জাতীয় ছন্দে দীর্ঘীকরণ অপেক্ষাকৃত বহুল।

এরূপ ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হইতে পারে না।

[পয়ার-জাতীয় ছন্দের সহিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রধান পার্থক্য এই যে, 'মাত্রাবৃত্তে' উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি-পরিমাণই প্রধান। পয়ারে অক্ষর-ধ্বনির অতিরিক্ত যে একটা সুরের টান থাকে, 'মাত্রাবৃত্তে' তাহা থাকে না। সুতরাং পয়ারের ন্যায় 'মাত্রাবৃত্তের' স্থিতি-স্থাপকতা গুণ নাই, শোষণ-শক্তিও নাই। যদি দেখা যায় যে, কোন একটি কবিতার চরণ কি ঢঙে লিখিত তাহা মাত্রার হিসাব হইতে বুঝিবার উপায় নাই, তখন এই সুরের টান আছে কি না আছে তাই দেখিয়া ঢঙ স্থির করিতে হয়।]

যত পায় বেত | না পায় বেতন | তবু না শাসন মানে

এবং

বসি তরু পরে | কলরব করে, | মরি মরি, আহা মরি

এই উভয় চরণেই মাত্রার হিসাব এক। কিন্তু প্রথমটি যে 'মাত্রাবৃত্ত' ঢঙে এবং দ্বিতীয়টি যে পয়ারের ঢঙে রচিত, তাহা ঐ সুরের টান আছে কি না আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়।

যথার্থ blank verse বা অমিতাক্ষর ছন্দ 'মাত্রাবৃত্ত' ঢঙে লেখা যায় না, কারণ ছেদ ও যতির পরস্পরের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ না হইলে যথার্থ অমিতাক্ষর রচিত হইতে পারে না। কিন্তু 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে স্বরের টান থাকে না, শব্দের মাঝে মাঝে ফাঁক থাকে না বলিয়া পর্ব্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ বসাইবার উপায় থাকে না। 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে অক্ষরের সহিত অক্ষর যেন লাগিয়া থাকে। এই জাতীয় ছন্দে একই পর্ব্বের দুইটি পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে বড় জোর একটি উপচ্ছেদ বসিতে পারে। যেমন—

শুনি রাজা কহে : | — "বাপু, * জান ত হে, | করেছি বাগান- | খানা

'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে স্বরবর্ণের ধ্বনির প্রাধান্য দেখা যায় না। প্রত্যেক স্পষ্টোচ্চারিত ধ্বনিরই ইহাতে হিসাব রাখিতে হয়। এই জন্য যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘীকরণের দিকে ইহার প্রবৃত্তি আছে। এই দীর্ঘীকরণ কি ভাবে হয়, তাহা 'বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব' শীর্ষক অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। যৌগিক অক্ষরকে অন্যান্য অক্ষরের সহিত সমান হ্রস্ব ধরিয়া পড়িতে গেল, একটু অধিক জোরের সহিত দ্রুত লয়ে উচ্চারণ করা দরকার হইয়া পড়ে। কিন্তু 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দ লয়-পরিবর্ত্তনের একান্ত বিরোধী। বস্তুতঃ 'মাত্রাবৃত্ত' ঢঙে আরামপ্রিয়তার ও আয়াসবিমুখতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি দেখা যায়। এই জন্য এই ঢঙে বর্ণসংঘাত ও হ্রস্বীকরণ সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া চলিতে হয়, কোন যৌগিক অক্ষর থাকিলেই তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দুই মাত্রা পূরাইয়া দেওয়া হয়। এই ধরণের ছন্দে যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগ্‌যন্ত্রকে একটুখানি আরাম দেওয়া হয়। এবং সেই অক্ষরটির উচ্চারণের পর খানিকক্ষণ শেষ ধ্বনির ঝঙ্কারটিকে টানিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে যৌগিক অক্ষর মাত্রেই দুই মাত্রার অক্ষর বলিয়া পরিগণিত হয়।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে শ্বাসবায়ুর পরিমাণের খুব সূক্ষ্ম হিসাব রাখিতে লয়। যতটুকু শ্বাসবায়ুর খরচ হইল, ধ্বনি-উৎপাদক কণ্ঠকটি বাগ্‌যন্ত্রে যতটুকু আয়াস হইল —সমস্তই ইহাতে বিবেচনা করিতে হয়। তা ছাড়া, গা ছাড়িয়া দিয়া এক লয়ে উচ্চারণ করাই এই ছন্দের প্রকৃতি, লয়-পরিবর্ত্তন এ ছন্দে চলে না। সুতরাং এই ছন্দ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ছন্দ। বেশী মাত্রার পর্ব্ব এ ছন্দে ব্যবহার করা যায় না। ইহার শক্তি ও উপযোগিতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই ছন্দে দীর্ঘীকরণের বাহুল্য আছে বলিয়া হ্রস্ব ও দীর্ঘের সমাবেশে ইহাতে বিচিত্র

সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায়। তবে তাহাতে যে ধ্বনি-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা যে ঠিক ইংরেজী বা সংস্কৃতের অনুরূপ ছন্দ-স্পন্দন নহে, তাহা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। তবে বিদেশী ছন্দের অনুকরণ করিতে গেলে আমাদের মাত্রাবৃত্ত ভিন্ন উপায় নাই, কারণ অক্ষর-পরম্পরার মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য সংস্কৃত, ইংরেজী, আরবী প্রভৃতি ছন্দের ভিত্তি, তাহার কতকটা অনুকরণ এক 'মাত্রাবৃত্তে'ই সম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল্ ইস্‌লাম প্রভৃতি কবিরা তাহাই করিয়াছেন। ছড়ার ছন্দে অর্থাৎ স্বরাঘাত-প্রবল ছন্দে অবশ্য গুণগত পার্থক্য খুব স্পষ্ট; কিন্তু তাহাতে মাত্র একটার বেশী pattern বা ছাঁচ নাই, সুতরাং তাহাতে বিদেশী ভাষার বিচিত্র ছাঁচের ছন্দের অনুকরণ করা চলে না।

পয়ারের সহিত তুলনা করিলে বলিতে হয়, 'মাত্রাবৃত্ত' মেয়েলি ছন্দ, পয়ার যেন পুরুষালি ছন্দ। যেটুকু কাজ মাত্রাবৃত্তের দ্বারা পাওয়া যায়, সেটুকু বেশ সুন্দর হয়; কিন্তু 'ইস্তক্ জুতা-সেলাই নাগাদ্ চণ্ডীপাঠ' ইহাতে চলে না। পয়ারে কিন্তু 'পাখী সব করে রব' হইতে আরম্ভ করিয়া 'গর্জ্জমান বজ্রাগ্নি-শিখা'র নির্ঘোষ, এমন কি 'চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন' পর্য্যন্ত প্রকাশ করা যায়।

[৩] স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ

আর এক ঢঙের ছন্দকে 'ছড়ার ছন্দ', 'স্বরমাত্রিক' বা 'স্বরবৃত্ত' বলা হয়। এ ধরণের ছন্দ পূর্ব্বে গ্রাম্য ছড়াতেই ব্যবহার হইত; এ জন্য ইহাকে 'ছড়ার ছন্দ' বলা হয়। সাধারণতঃ এ রকম ছন্দে প্রত্যেক syllable বা অক্ষর এক-মাত্রার বলিয়া গণ্য করা হয়, অর্থাৎ শুধু কয়টি স্বরবর্ণের ব্যবহার হইয়াছে, গণনা করিলেই মাত্রার হিসাব পাওয়া যায়। এ জন্য ইহাকে 'স্বরমাত্রিক' বা 'স্বরবৃত্ত' বলা হইয়া থাকে।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মাত্রা গুণিবার রীতি হইতেই এই ঢঙের ছন্দের আসল স্বরূপটি বোঝা যায় না। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, এ রকম ছন্দেও মধ্যে মধ্যে কোন অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। তা-ছাড়া, পয়ার জাতীয় ছন্দেও তো স্বরধ্বনির প্রাধান্য আছে, এবং কেবল শব্দের শেষ অক্ষর ভিন্ন অন্য অক্ষর সাধারণতঃ একমাত্রিক বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং, স্থানে স্থানে রীতির বিশেষ আছে,—ইহাই কি পয়ারের সহিত এই ছন্দের পার্থক্য?

তাহা হইলে পয়ার কি স্বরমাত্রিক ছন্দের একটি ব্যভিচারী বা অনৈসর্গিক রূপ? কিন্তু পয়ারের ঢঙ্ ও স্বরমাত্রিকের ঢঙ্ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা তো শোনা-মাত্র বোঝা যায়।

ঐ দেখো গো | বর্ষা এলো | দৈববাণী | নিয়ে

এই-রকম কোন চরণের মাত্রার হিসাব পয়ারের এবং স্বরমাত্রিক ছন্দের উভয় রীতি অনুসারেই এক। কিরূপে তবে ইহার প্রকৃতি বুঝা যাইবে?

এই জাতীয় ছন্দের প্রায় প্রত্যেক পর্ব্বেই অন্ততঃ একটি প্রবল স্বরাঘাত পড়ে। সেই স্বরাঘাতের প্রভাবেই এই ছন্দের বিশেষ লক্ষণগুলি উৎপন্ন হয়। এই জন্য ইহাকে 'স্বরাঘাত-প্রবল' বা 'স্বরাঘাত-প্রধান' ছন্দ বলাই সঙ্গত। স্বরাঘাতের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের একটা সচেষ্ট প্রয়াস আবশ্যক; এবং সুনিয়মিত সময়ান্তরে তাহার পুনঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই কারণে স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের বৈচিত্র্য খুব কম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই ছন্দে কেবল এক ধরণের পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়। প্রতি পর্ব্বে চার মাত্রা, ও দুইটী পর্ব্বাঙ্গ থাকে। সাধারণতঃ এই ধরণের ছন্দে প্রতি চরণে চারটি পর্ব্ব থাকে, তাহাদের মধ্যে শেষ পর্ব্বটি অপূর্ণ থাকে। সত্যেন্দ্রনাথের

আকাশ জুড়ে | চল্ নেমেছে | সূয্যি ঢলে | ছে
চাঁচর চুলে | জলের গুঁড়ি | মুক্তো ফলে | ছে

এই ছন্দের সুন্দর উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথ দুই, তিন, চার, পাঁচ পর্ব্বের চরণও এই ছন্দে রচনা করিয়াছেন। 'পলাতকা'য় এইরূপ নানা দৈর্ঘ্যের চরণ ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্বরাঘাত থাকার দরুণ যৌগিক অক্ষর হ্রস্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। স্বরাঘাতের দরুণ বাগ্‌যন্ত্রের অঙ্গগুলির প্রবল আন্দোলন, এবং বোধ হয়, সঙ্কোচন হয়; তজ্জন্য উচ্চারণের ক্ষিপ্রতা এবং লঘুতা অবশ্যম্ভাবী। এই লঘুতাকে লক্ষ্য করিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

আল্‌গোছে খা' | গায়ে লাগে তা' | শুন্‌ছে বল | কে?

কিন্তু স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ-ও বাংলা মাত্রা-পদ্ধতির সাধারণ নিয়মের অধীন। সুতরাং এ ছন্দে-ও মাঝে মাঝে দীর্ঘীকরণ চলে। উদাহরণ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

যৌগিক অক্ষরের উপর স্বরাঘাত না পড়িলে ইহার প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয় না। এই জন্য এই ছন্দে মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষরের উপর স্বরাঘাত পড়িলে তাহাতেও একটু ঝোঁক দিয়া যৌগিক অক্ষরের ন্যায় পড়িতে হয়। যেমন—

ধিন্‌তা ধিনা | পাকা-া নোনা
কালো-ে া ⁝ তা সে | যতোই কালো | হোক্
দেখে-ে-ছি তার | কালো-ে া হরিণ | চোখ্

স্বরাঘাত-যুক্ত অক্ষরের পরবর্ত্তী অক্ষরটি সেই পর্ব্বাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইলে লঘু হওয়া দরকার। স্বরাঘাতের প্রয়াসের পর বাগ্‌যন্ত্রের একটু আরামের আবশ্যকতা বোধ হয়, পুনশ্চ হ্রস্বীকরণের প্রয়াস করিতে চাহে না।

স্বরাঘাতযুক্ত ছন্দের ছাঁচ বাঁধা থাকে বলিয়া এই ছন্দে একটি মূল শব্দ ভাঙিয়া দুইটী পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে দেওয়া চলে। পয়ারের মত এ ছন্দে অতিরিক্ত কোন ধ্বনি-প্রবাহ থাকে না, অক্ষরের গায়ে অক্ষর লাগিয়া থাকে। প্রবল স্বরাঘাতযুক্ত একটি যৌগিক অক্ষর, এবং তাহার প্রতিক্রিয়াশীল একটি হ্রস্ব অক্ষর—এইভাবে প্রথম একটি পর্ব্বাঙ্গ গঠিত হয়; দ্বিতীয় পর্ব্বাঙ্গে ইহারই একটা মৃদুতর অনুকরণ থাকে। এইভাবে অক্ষর বিন্যাস হয় বলিয়া এক রকম 'চোখ কান বুজিয়া' এই ছন্দের আবৃত্তি করা যায়।

এ ছন্দেও যথার্থ অমিতাক্ষর লেখা যায় না, এখানে ছাঁচের এমন বাঁধা রূপ যে, ছেদের অবস্থান-বৈচিত্র্য ঘটান যায় না। পর্ব্বের মধ্যেও পূর্ণচ্ছেদ বসে না।

এই ছন্দে মাত্রার হিসাবের জন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি নূতন রকমের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, চারটি হ্রস্ব অক্ষর দিয়া এই ছন্দে একটি পর্ব্ব গঠিত হইলে, প্রথম পর্ব্বাঙ্গের একটি অক্ষরের উপর ঝোঁক দিয়া তাহাকে যৌগিক অক্ষরের মতন করিয়া পড়া হয়। সুতরাং তাঁহার ধারণা হয় যে এই ছন্দে প্রতি পর্ব্বে মাত্রা সংখ্যা ৪ নহে, ৪৷৷০। ভ্রমবোধের 'একোমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো···ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্' এই সূত্রের অনুসরণ করিয়া তিনি প্রস্তাব করেন, যে যৌগিক অক্ষরকে ১৷৷০ মাত্রা এবং অন্যান্য অক্ষরকে

১ মাত্রা ধরা উচিত। ইহাতে অবশ্য অনেক জায়গায় মাত্রা-সমকত্বের হিসাব পাওয়া যায়; যেমন—

১½+১½+১½	১½+১+১+১	১½+১+১+১	
আয় আয় সই	জল আনি গে	জল আনি গে	চল
১+১½+১+১	১½+১+১+১	১½+১+১+১	
আকাশ জুড়ে	চল নেমেছে	খুষি চলে	ছে

এসব স্থলে প্রত্যেক সম্পূর্ণ পর্ব্বের ৪॥০ মাত্রা হইতেছে। কিন্তু আবার বহুস্থলে এই হিসাব অনুসারে মাত্রাসমকত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না; যেমন—

১½+১+১+১½	১+১½+১+১	১½+১+১+১½	
সুপ্ত বীজের	গোপন কথা	অঙ্কুরে আজ	ছায়
১½+১+১+১½	১½+১+১+১½	১+১½+১+১	
কামধেনু আর	কল্প লতার	ছল (-২) নাতে	ভুলবোনা
১½+১+১½+১½	১+১½+১+১½	১½+১+১+১	
তাল পাতার ঐ	পুঁথির ভিতর	ধর্ম্ম আছে	বললে কে

(অথবা, তাল্ পাতারৈ = ১½+১+১+১½ = ৫)

এসব স্থলে দেখা যাইতেছে যে, সমমাত্রিক পর্ব্বপরম্পরার এই হিসাবে কাহারও মাত্রা ৫॥০, কাহারও ৫, কাহার ৪॥০ হইতেছে। সুতরাং কবি সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রা-পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় না। তিনিও শেষ পর্য্যন্ত তাহা বুঝিয়া এই হিসাব বাদ দিয়াছিলেন, এবং সমসংখ্যক হ্রস্ব ও সমসংখ্যক যৌগিক অক্ষর দিয়া পর্ব্ব রচনা করিয়া হিসাবের গোলমাল এড়াইয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রা-পদ্ধতি যে গ্রহণ-যোগ্য নয়, তাহা অন্যভাবেও বোঝা যায়। স্বরাঘাত-ই যে এ ধরণের ছন্দের প্রধান তথ্য, তাহা তিনি ঠিক্ ধরিতে পারেন নাই। স্বরাঘাতের উপরেই এই ছন্দের সমস্ত লক্ষণ নির্ভর করে। বাংলায় মাত্রা-পদ্ধতি বাঁধা-ধরা বা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট নহে; প্রত্যেক ক্ষেত্রে শব্দ-সংস্থান, স্বরাঘাত ইত্যাদি অনুসারে মাত্রা নির্ণীত হয়। কাজে কাজেই ওরূপ কোন বাঁধা নিয়মে মাত্রার হিসাব করা চলিতে পারে না।

স্বরাঘাত-প্রবল ছন্দ সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃতে দেখা যায় না। বঙ্গের সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলের ভাষাতেও ইহা বড় একটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বিহারের

গ্রাম্য ছড়া ও নৃত্যের তালে এই ছন্দ দেখা যায়। হোলির দিনে বিহার-অঞ্চলের অশিক্ষিত লোকে

"হ্যা˝ র‍্যা : র‍্যা´-র‍্যা | হ্যা˝-র‍্যা : র‍্যা´-র‍্যা | হ্যা˝-র‍্যা : র‍্যা´-র‍্যা | র‍্যা´—"

এই সঙ্কেতের তালে নৃত্য করে। এই সঙ্কেত আর বাংলা স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের সঙ্কেত একই। কলিকাতার রাস্তায় পশ্চিমা (বিহারী) ফেরিওয়ালারা এই সঙ্কেতের অনুসরণ করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক জিনিষ বিক্রয় করে—

"লেজ্˝-জা : বা-বু | দোদ্˝ দো : পয়্-সা ॥ লেজ্˝-জা : বা-বু | দোদ্˝-দো : পয়্-সা ॥"

ছন্দে এই ঢঙ্ বোধ হয় বাঙালীর পূর্ব্ব পুরুষের-ও নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, কারণ বাংলার গ্রাম্য অঞ্চলের সাহিত্যেই ইহার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। বাংলা ভাষার একটি লক্ষণ—অর্থাৎ দীর্ঘস্বর-বিমুখতা—এই ঢঙের ছন্দেরও বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার আদিম ইতিহাস নির্ণয় করা কঠিন, তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, আজও মাদল প্রভৃতি সাঁওতালি বাদ্যে এই ছন্দের সঙ্কেত ব্যবহৃত হয়, যেমন—

"দি-পির্ : দিপাং | দি-পির্ : দি-পাং | দি-পির্ : দি-পাং | তাং"
"তু-তুর্ : তুয়া | তু-তুর্ : তুয়া | তু-তুর্ : তুয়া | তু"

বাংলার ঢোল ও ঢাকের বাদ্যের সঙ্কেতও তাই—

"গিজ্-তা : গি-জোড়্ | গিজ্-তা : গি-জোড়্ | গিজ্-তা : গি-জোড়্ | গাং"

অথবা

"লাক্ চ : ড়া চড়্ | লাক্ চ : ড়া চড়্ | লাক্ চ : ড়া চড়্ | চড়্"—

সম্ভবতঃ বাঙালীর আদিম ইতিহাসে কোল-জাতির প্রভাবের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। কেহ কেহ বলেন, বাংলার স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ আর ইংরেজী ছন্দ এক জিনিস। এই মত একান্ত ভ্রান্ত; যিনি কিঞ্চিৎ অনুধাবন-পূর্ব্বক ইংরেজী ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনি কখন এরূপ ভ্রান্ত মতের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করিয়াছি।

উপসংহারে একটি কথা পুনর্ব্বার বলিতে চাই। উপরে বাংলা ছন্দের তিন ঢঙের কথা বলিয়াছি। কিন্তু বাংলা কবিতার তিনটি

স্বতন্ত্র জাতি-ভেদের কথা বলি নাই। একই কবিতার স্থানে স্থানে বিভিন্ন ঢঙ্ থাকিতে পারে। বাংলা ছন্দের ভিত্তি পর্ব্ব, এবং পর্ব্বের পরিচয় মাত্রা-সংখ্যায়। কিন্তু মাত্রাসমকত্ব ছাড়া ছন্দের আরও নানাবিধ গুণ আছে, তদনুসারে তাহার ঢঙ্ বুঝা যায়। বাংলা ছন্দের মাত্রা-পদ্ধতি এক ও অপরিবর্ত্তনীয়, ছন্দের জাতি বা ঢঙের উপর নির্ভর করে না। কবিতা-বিশেষে পর্ব্ব-গঠন ও মাত্রা-বিচার হইতে একটি বিশিষ্ট ভাব বা ঢঙের আভাস আসিতে পারে। আবার, মাত্রাসংখ্যাদি স্থির রাখিয়াও বিভিন্ন ভঙ্গীতে বা ঢঙে একই কবিতা পড়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন ঢঙের আলোচনা-প্রসঙ্গে মাত্রা-সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছি, তাহা সেই ঢঙের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতাতেই খাটে। কিন্তু সকল কবিতাতেই যে কোন-না-কোন ঢঙের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণমাত্রায় থাকিবে, তাহা নহে।

———

ছন্দোলিপি

অনেক পাঠকের সুবিধা হইতে পারে বলিয়া বিভিন্ন প্রকারের ছন্দোবন্ধের কয়েকটি কবিতার ছন্দোলিপি দেওয়া হইল।

(১)

ভূতের : মতন | চেহারা : যেমন | নির্ব্বোধ : অতি | ঘোর =(৩+৩)+(৩+৩)+(৪+২)।

যা কিছু : হারায়, | গিন্নি : বলেন, | "কেষ্টা : বেটাই | চোর"!
=(৩+৩)+(৩+৩)+(২+২)।

পর্ব্ব—ষন্মাত্রিক।
চরণ—চতুষ্পর্ব্বিক, অপূর্ণপদী (শেষ পর্ব্বটি হ্রস্ব)।
স্তবক—পরস্পর সমান সমপদী দুই চরণে মিত্রাক্ষর।
ঢঙ্—ধ্বনিপ্রধান

প্রণমি : তোমারে : আমি, | সাগর- : উত্থিতে =(৩+৩+২)+(৩+৩)

ষড়ৈশ্বর্য্য : ময়ী, : অয়ি | জননি : আমার। =(৪+২+২)+(৩+৩)

তোমার : শ্রীপদ : রজঃ | এখনো : লভিতে =(৩+৩+২)+(৩+৩)

প্রসারিছে : করপুট | ক্ষুব্ধ : পারাবার। =(৪+৪)+(২+৪)

পর্ব্ব—অষ্ট-মাত্রিক।
চরণ—দ্বিপর্ব্বিক, অপূর্ণপদী (catalectic) (পয়ার)।
স্তবক—সমপদী ; ৪ চরণ, মিত্রাক্ষর (ক-খ-ক-খ)।
ঢঙ্—তানপ্রধান

(৩)

দিনের : শেষে | ঘুমের : দেশে | ঘোমটা : পরা | ঐ ছায়া
=(২+২)+(২+২)+(২+২)+(১+২)

ভুলা : লরে | ভুলা : ল মোর | প্রাণ =(২+২)+(২+২)+১

ও পা : রেতে | সোনার : কূলে | আঁধার : মূলে | কোন্ মায়া
=(২+২)+(২+২)+(২+২)+(১+২)

গেয়ে : গেল | কাজ-ভা : ভানো | গান। =(২+২)+(২+২)+১

পর্ব—চতুর্মাত্রিক।

চরণ—চতুষ্পর্ব্বিক ও ত্রিপর্ব্বিক, অপূর্ণপদী।

স্তবক—অসমপদী ৪ চরণ (১ম-৩য়, ২য়-৪র্থ), মিত্রাক্ষর (ক-খ-ক-খ)।

ঢঙ—স্বরাঘাত-প্রধান

(৪)

"রে সতি, : রে সতি" | কাঁদিল : পশুপতি | পাগল : শিব প্রম : থেশ
=(৪+৪)+(৪+৪)+(৪+৪+২)

যোগ : মগন : হর | তাপস : যত দিন | তত দিন : নাহি ছিল : ক্লেশ
=(৪+৪)+(৪+৪)+(৪+৪+২)

পর্ব—অষ্টমাত্রিক।

চরণ—ত্রিপর্ব্বিক, অতিপদী (hyper-catalectic) (দীর্ঘ ত্রিপদী)।

স্তবক—সমপদী ২ চরণ, মিত্রাক্ষর।

ঢঙ—ধ্বনিপ্রধান

(৫)

ছিল আশা : * মেঘনাদ, * | মুদিব : অন্তিমে ॥ =(৪+৪)+(৩+৩)

এ নয়ন : দ্বয় : আমি | তোমার : সম্মুখে ; * * ॥ =(৪+২+২)+(৩+৩)

সঁপি রাজ্য : ভার : * পুত্র, * | তোমায়, * : করিব ॥ =(৪+২+২)+(৩+৩)

মহাযাত্রা : ! * * কিন্তু বিধি | *—বুঝিব : কেমনে ॥ =(৪+৪)+(৩+৩)

তাঁর লীলা ? : * * ভাঁড়াইলা | সে সুখ : আমারে ! * * ॥ =(৪+৪)+(৩+৩)

পর্ব—অষ্টমাত্রিক
চরণ—দ্বিপর্ব্বিক অপূর্ণপদী (পয়ার)
স্তবক— * , অমিত্রাক্ষর, সমপদী
ঢঙ—তানপ্রধান

} সাধারণ অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধ

(৬)

যদি তুমি ⁝ মুহূর্ত্তের তরে ।
ক্লান্তিভরে ⁝
দাঁড়াও থমকি, ॥ = ১০ + ১০

তখনি ⁝ চমকি ।
উচ্ছি য়া ⁝ উঠিবে ⁝ বিশ্ব । পুঞ্জ পুঞ্জ ⁝ বস্তুর ⁝ পর্ব্বতে ; = ৬ + ৮ + ১০

পঙ্গু মূক । কবন্ধ ⁝ বধির ⁝ আঁধা ।
স্থূলতনু ⁝ ভয়ঙ্করী ⁝ বাধা ॥ = ৪ + ৮ + ১০

সবারে ⁝ ঠেকায়ে ⁝ দিয়ে । দাঁড়াইবে ⁝ পথে ; ॥ = ৮ + ৬

অণুতম ⁝ পরমাণু । আপনার ⁝ ভারে ।
সঞ্চয়ের ⁝ অচল ⁝ বিকারে ॥ = ৮ + ৬ + ১০

বিদ্ধ ⁝ হবে । আকাশের মর্ম্মমূলে ।
কলুষের ⁝ বেদনার ⁝ শূলে । ॥ = ৪ + ৮ + ১০

পর্ব্ব—মিশ্র (৪, ৬, ৮ বা ১০ মাত্রার)
চরণ—দ্বিপর্ব্বিক ও ত্রিপর্ব্বিক
স্তবক—বিষমপদী, মিশ্র, জটিল মিত্রাক্ষর
} 'বলাকা'-র ছন্দ

চঙ্—তানপ্রধান

(৭)

বিশুর বয়স । তেইশ তখন, । রোগে ধ'রলো । তা'রে, = ৪ + ৪ + ৪ + ২
ওষুধে ডা । ক্তারে = ৪ + ২

ব্যাধির চেয়ে । আধি হ'লো । বড়ো ; = ৪ + ৪ + ২
নানা মাপের । জমলো শিশি, । নানা মাপের । কৌটো হ'লো । জড়ো = ৪ + ৪ + ৪ + ৪ + ২

বছর দেড়েক । চিকিৎসাতে । করলো যখন । অস্থি জর । জর = ৪ + ৪ + ৪ + ৪ + ২
তখন বললে, । "হাওয়া বদল । করো" । = ৪ + ৪ + ২

এই সুযোগে । বিশু এবার । চাপ্‌লো প্রথম । রেলের গাড়ি, = ৪ + ৪ + ৪ + ২
বিয়ের পরে । ছাড়্‌লো প্রথম । শ্বশুর বাড়ি = ৪ + ৪ + ৪

পর্ব্ব—চতুর্ম্মাত্রিক ।

চরণ—মিশ্র (দ্বিপর্ব্বিক হইতে পঞ্চ-পর্ব্বিক), প্রায়শঃ অপূর্ণপদী ।

স্তবক—মিশ্র, মিত্রাক্ষর ।

চঙ—স্বরাঘাত-প্রধান

বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব

(১)

Metrics বা ছন্দঃ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ rhythm বা ছন্দঃস্পন্দন সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। বাংলায় ছন্দঃ শব্দটি metre ও rhythm উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয় বলিয়া metre ও rhythm যে দুইটি পৃথক্ concept অর্থাৎ প্রত্যয় বা ভাব, তাহা সাধারণের ধারণায় সব সময় আসে না। কবি যখন লেখেন যে,—

> "ছন্দে উদিছে তারকা, ছন্দে কনকরবি উদিছে
> ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে"

তখন তিনি ছন্দঃ শব্দটি rhythm অর্থেই ব্যবহার করেন। Metre বা পদ্যের ছন্দঃ rhythm বা সাধারণ ছন্দঃস্পন্দনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশমাত্র।

রসানুভূতির সঙ্গে ছন্দোবোধের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। মনে রসের উপলব্ধি হইলেই তাহার প্রকাশ হয় ছন্দঃস্পন্দনে। যেথানেই কোন ভাবে রসোপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানেই ছন্দঃ লক্ষিত হয়। শিশুর চপল নৃত্যেও এক রকমের ছন্দঃ আছে, মানুষের শিল্পের অভিব্যক্তির মধ্যেও ছন্দঃ আছে। যাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা বিশ্বের লীলাতেও ছন্দের খেলা দেখিতে পান। ছন্দোবোধের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুতে স্পন্দন আরম্ভ হয়, সেই স্পন্দনের ফলে মনের মধ্যে মন্ত্রমুগ্ধ আবেশের ভাব আসে, "স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু" এই রকম একটা বোধ হয়। এই অনুভূতিটুকু কবিতার ও অন্যান্য সুকুমার কলার প্রাণ।

এখন প্রশ্ন এই যে, ছন্দোবোধের উপাদান কি? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে কি লক্ষণ থাকিলে মনে ছন্দোবোধ আসিতে পারে? সূর্য্যাস্তের সময়কার আকাশে রঙের খেলায়, বাউল গানের সুরে বা তাজমহলের গঠনশিল্পের মধ্যে এমন কি সাধারণ লক্ষণ আছে, যাহার জন্য আমরা এ সমস্তের মধ্যেই ছন্দঃ বলিয়া একটা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারি? চক্ষু, কর্ণ বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আমরা রঙ, বা সুর বা গন্ধ কিম্বা ঐ রকম কোন না কোন গুণ

প্রত্যক্ষ করি। তাহাদের কি রকম সমাবেশ হইলে আমরা ছন্দোময় বলিয়া তাহাদের উপলব্ধি করি?

কেহ কেহ বলেন যে, ঘটনাবিশেষের পৌনঃপুনিকতাই ছন্দের লক্ষণ। তাঁহারা বলেন যে, সমপরিমিত কালানন্তরে যদি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় এবং তাহার দ্বারাই যদি সময়ের বিভাগের বোধ জন্মে, তবে সেখানে ছন্দঃ আছে বলা যায়। সুতরাং ঘড়ির দোলকের গতি, তরঙ্গের উত্থান-পতন ইত্যাদিতে ছন্দঃ আছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ছন্দের এই সংজ্ঞা খুব স্পষ্ট বলা যায় না। কোন কোন প্রকারের ছন্দে অবশ্য পৌনঃপুনিকতাই প্রধান লক্ষণ; কিন্তু ছন্দের এমন সব ক্ষেত্র আছে, যেখানে পৌনঃপুনিকতা এক রকম নাই বা থাকিলেও তাহার জন্য ছন্দোবোধ জন্মে না। সূর্য্যাস্তের সময় আকাশে কিম্বা বড় বড় চিত্রকরের ছবিতে যে রঙের সমাবেশ দেখা যায়, তাহাতে ত পৌনঃপুনিকতা বিশেষ লক্ষিত হয় না, কিন্তু তাহাতে কি rhythm নাই? গায়কেরা যখন তান ধরেন, তখন তাহাতে কি পৌনঃপুনিকতা লক্ষিত হয়? আসল কথা—rhythm-এর কাজ মানসিক আবেগের অনুযায়ী স্পন্দনের সৃষ্টি করা, কেবলমাত্র কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা নহে।

কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থের উপর আঘাত করিলে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়গুলির গঠন-কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহারা স্থিতিস্থাপক উপাদানে তৈয়ারি। বাহিরের জগতের প্রত্যেক ঘটনা ও পরিবর্ত্তন অক্ষিগোলক বা কর্ণপটহের স্থিতিস্থাপক স্নায়ুতে গিয়া আঘাত করিয়া স্পন্দন উৎপাদন করে, এবং সেই স্পন্দনের ঢেউ মস্তিষ্কের কোষে ছড়াইয়া অনুভূতিতে পরিণত হয়। অহরহঃ বাহ্য জগতের সম্পর্কে আসার দরুণ নানা রকমের স্পন্দনের ঢেউয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় অভিভূত হইতেছে। যখন কোন এক বিশেষ রকমের স্পন্দনের পর্য্যায়ের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য অনুভূত হয়, তখনই ছন্দোবোধ জন্মে।

এই সামঞ্জস্যের স্বরূপ কি? যদি সমধর্ম্মী ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কোন বিশেষ গুণের তারতম্যের জন্য মনে আবেগের সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই সেখানে ছন্দঃস্পন্দন আছে বলা যাইতে পারে। কোন ঘটনা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনে তজ্জাতীয় অন্য ঘটনার জন্য প্রত্যাশা জন্মে। কানে যদি 'সা' সুর আসিয়া লাগে, তবে মন স্বভাবতই তাহার পরে 'পা' কিম্বা এমন অন্য কোন সুরের

প্রত্যাশা করে, যাহাতে কানের স্বাভাবিক তৃপ্তি জন্মিতে পারে; তেমনি সিঁদুর (vermilion) রং দেখিলে তাহার পরে গাঢ় নীল (ultra-marine) রং দেখিবার আকাঙ্ক্ষা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যাশিত ঘটনা না আসিয়া যদি অন্য ঘটনা আসিয়া পড়ে, তবে মনে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়; আবার যাহা প্রত্যাশিত, তাহা আসিলেও আর এক প্রকার আন্দোলন হয়। এবংবিধ আন্দোলনেই আবেগের ব্যঞ্জনা হয়। এইরূপে বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনের সমাবেশ-বৈচিত্র্য বা প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব-জনিত আন্দোলনই ছন্দের প্রাণ। কোন রাগরাগিণীর আলাপে নানা সুরের সমাবেশ বা কোন চিত্রপটে রঙের সমাবেশ লক্ষ্য করিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রতীত হইবে। কেবল দেখিতে হইবে যে, বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনে স্পন্দনে যেন বিরোধ না থাকে, অথবা, সঙ্গীতের ভাষায় বলিতে গেলে, তাহারা যেন পরস্পর 'বিবাদী' না হয়। নানা রকমের স্পন্দনের নানা ভাবে সমাবেশের দরুণ আবেগানুরূপ জটিল স্পন্দনের উৎপত্তি হয়। সেই জটিল স্পন্দনই মানসিক আবেগের প্রতীক।

কিন্তু বৈচিত্র্য ছাড়াও ছন্দে আর একটি লক্ষণ থাকা আবশ্যক। সেটি হইতেছে,—ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে কোন প্রকারের ঐক্যসূত্র। সঙ্গীতে সুর আবেগানুযায়ী বৈচিত্র্য আনিয়া দেয়, তাল সেই সুরসমুদায়কে ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত করে। যেখানে স্পন্দন, সেখানে সতত দুইটি প্রবৃত্তির লীলা দেখা যায়; একটি গতির ও একটি স্থিতির। বেগের বশে কোন এক দিকে গতির প্রবৃত্তি এবং স্থির অবস্থানে ফিরিবার প্রবৃত্তি—এই দুইয়ের পরস্পর প্রতিক্রিয়ায় স্পন্দনের উৎপত্তি। ছন্দেও এক দিকে বৈচিত্র্যের জন্য গতির এবং অপর দিকে ঐক্যসূত্রের জন্য স্থিতির মিলন ঘটে বলিয়া স্পন্দনের লক্ষণ অনুভূত হয়।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, যেখানেই ছন্দঃ, সেখানেই প্রথমতঃ সহধর্মী ঘটনাপরম্পরা থাকা দরকার; দ্বিতীয়তঃ, সেই সমস্তের মধ্যে কোন এক রকমের ঐক্যসূত্র থাকা দরকার; তৃতীয়তঃ তাহাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ গুণের তারতম্যের জন্য একটা সুন্দর বৈচিত্র্যের আবির্ভাব হওয়া দরকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গীতে সুরের পারম্পর্য্যে তাল-বিভাগের দ্বারা ঐক্য এবং আপেক্ষিক তীব্রতা বা কোমলতার দ্বারা বৈচিত্র্য সাধিত হয়, এবং এইরূপে ছন্দোবোধ জন্মে।

পদ্যছন্দের মধ্যেও এই লক্ষণগুলি বিশিষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। বাক্যের সঙ্গে বাক্যের বন্ধনই পদ্যছন্দের কাজ। পদ্যছন্দের ক্ষেত্রে সমধর্ম্মী ঘটনাপরম্পরা বলিতে অক্ষর বা অক্ষরসমষ্টি—এইরূপ কোন বাক্যাংশ বুঝিতে হইবে; এবং পারম্পর্য্য বলিতে, কালানুযায়ী পারম্পর্য্য বুঝিতে হইবে। বাক্যাংশের কোন কোন গুণের দিক্ দিয়া ঐক্যের সূত্র থাকিবে; অর্থাৎ সেই গুণের দিক্ দিয়া পর পর বাক্যাংশ অনুরূপ হইবে বা কোন obvious অর্থাৎ সহজবোধ্য pattern বা আদর্শের অনুযায়ী হইবে। এই আদর্শ বা নক্সাই সময়ে সময়ে অভীষ্ট ভাবের ব্যঞ্জনা করে, এবং একাধারে ঐক্য ও বৈচিত্র্যের সমাবেশ করে। কিন্তু এ ধরণের বৈচিত্র্যে নিয়মের নিগড় অত্যন্ত বেশী, সুতরাং ঐক্যের বাঁধনই অধিক প্রতীত হয়। আবেগের অনুধর্ম্মী বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য অন্য কোন গুণের দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। কবি স্বাধীন ভাবে সেই গুণের তারতম্য ঘটাইয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন এবং অভীষ্ট আবেগের দ্যোতনা করেন। কেবলমাত্র নক্সা ধরিয়া চলিয়া গেলে ছন্দঃ একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয় এবং তাহাতে আবেগের দ্যোতনা হয় না। এই সত্যটি অনেক কবি ও ছন্দঃশাস্ত্রকার বিস্মৃত হ'ন বলিয়া তাঁহারা ছন্দঃসৌন্দর্য্যের মূল-সূত্রটি ধরিতে পারেন না।

Metrics বা পদ্যছন্দের আলোচনা করিতে গেলে মুখ্যতঃ ছন্দের ঐক্যবন্ধনের সূত্রটি আলোচনা করিতে হয়। কবি ইচ্ছামত বৈচিত্র্য আনয়ন করেন, সে বিষয়ে মাত্র দিঙ্‌নির্ণয় করা যাইতে পারে, বাঁধা-ধরা নিয়ম করিয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু ছন্দের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের সূত্র কি হইতে পারে, তাহা ভাষার প্রকৃতি, ইতিহাস ও ব্যবহারের রীতির উপর নির্ভর করে, সে বিষয়ে ছন্দের ব্যাকরণ রচনা হইতে পারে।

কাব্যছন্দের প্রকৃতি বাক্যের ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রথমতঃ বাক্যের ধর্ম্ম কি কি এবং তাহাতে কি ভাবে ছন্দঃ রচনা হওয়া সম্ভব, তাহা বুঝিতে হইবে।

ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা Syllable। বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম আয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর। প্রত্যেকটি অক্ষর উচ্চারণের সময়, কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হইবার কালে কণ্ঠস্থ বাগ্‌যন্ত্রের অবস্থান অনুসারে কোন এক বিশেষ স্বরে পরিণত হয়, এবং

পরে মুখগহ্বরের আকার ও জিহ্বার গতি অনুসারে উপরন্তু ব্যঞ্জনধ্বনিরও উৎপাদন অনেক সময়ে করে। বাগ্‌যন্ত্রের অঙ্গসমূহের পরস্পর অবস্থানের ও গতির পার্থক্য অনুসারে অক্ষরের রূপের বা ধ্বনির ভেদ ঘটে এবং বহুবিধ অক্ষরের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বর থাকিবে এবং সেই স্বরই অক্ষরের মূল অংশ। অতিরিক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সেই স্বরেরই একটি বিশেষ রূপ প্রদান করে মাত্র।

ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চারিটি ধর্ম্ম—(১) তীব্রতা (pitch)—শ্বাস বহির্গত হইবার সময় কণ্ঠস্থ বাকৃতন্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই অনুসারে তাহাদের দ্রুত বা মৃদু কম্পন সুরু হয়। যত বেশী টান পড়িবে, ততই দ্রুত কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়া বা তীব্র হইবে। (২) গাম্ভীর্য্য (intensity or loudness)—অক্ষর উচ্চারণের সময় যত বেশী পরিমাণ শ্বাসবায়ু একযোগে বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর হইবে এবং তত দূর হইতেও স্পষ্টরূপে স্বর শ্রুতিগোচর হইবে। (৩) স্বরের দৈর্ঘ্য বা কালপরিমাণ (length or duration)—যতক্ষণ ধরিয়া বাগ্‌যন্ত্র কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। (৪) স্বরের রঙ্ (tone colour)—শুদ্ধ স্বরমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, স্বরের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধ্বনিরও সৃষ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও স্বর মিষ্ট, কাহারও স্বর কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে; ইহাকেই বলা যায় স্বরের রঙ্।

এই ত গেল স্বরের স্বধর্ম্মের কথা। তাহা ছাড়া অক্ষরে গ্রথিত হইয়া যখন বাক্য সৃষ্টি হয়, তখনও আর দুই একটি বিশেষ ধ্বনিলক্ষণ দেখা যায়। কথা বলিবার সময় ফুসফুসে শ্বাসবায়ুর অপ্রতুল হইলেই নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য থামিতে হয়, ঠিক নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় কোনও ধ্বনির উৎপাদন করা যায় না। এই জন্য বাক্যের মাঝে মাঝে pause বা ছেদ দেখা যায়। তদ্ভিন্ন যেখানে ছেদ নাই, সেখানেও জিহ্বাকে বারংবার প্রয়াসের পর কখন কখন একটু বিশ্রাম দিবার জন্য বিরামস্থল থাকে।

কথা বলিবার সময় নানা লক্ষণাক্রান্ত অক্ষর ও অক্ষর-সমষ্টির পরম্পরায় উচ্চারণ হইতে থাকে। কিন্তু ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া দুই একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে। ছন্দোবদ্ধ রচনার

ঐক্য এবং তদুচিত আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় বাক্যের কোন এক বিশেষ ধর্ম্মে। আবার ছন্দোবদ্ধ রচনায় আবেগের প্রকাশও হয় বাক্যের অপর কোন ধর্ম্মের মাত্রার বৈচিত্র্যে।—যেমন বৈদিক সংস্কৃতে ছন্দের ঐক্যসূত্র পাওয়া যায়—প্রতি পদের অক্ষর-সংখ্যায় এবং পাদান্তস্থ কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা সন্নিবেশের রীতিতে; সেই কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা সন্নিবেশের জন্য পাদান্তে একটা বিশেষ রকমের cadence বা দোলন অনুভব করা যায়। আবার প্রতি পাদের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিতভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্বর-তীব্রতার দরুণ আবেগদ্যোতক বৈচিত্র্য অনুভূত হয়। লৌকিক সংস্কৃতের প্রায় সমস্ত প্রাচীন ছন্দে প্রতি চরণের অক্ষর-সংখ্যার এবং তাহাদের মাত্রা-সংখ্যার দিক দিয়া ঐক্যসূত্র পাওয়া যায়; কিন্তু হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে অক্ষরের সাজাইবার রীতি হইতেই বৈচিত্র্যের অনুভূতি জন্মে। অর্ব্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দে এবং উত্তর-ভারতের চলতি ভাষাসমূহের ছন্দে আবার ঐক্যসূত্র অন্যবিধ; সেখানে প্রতি পর্ব্বের মোট মাত্রা-সংখ্যা হইতেই ছন্দের ঐক্য বোধ হয়। Measure বা পর্ব্বের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার অক্ষর সাজাইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কবিকে দেওয়া হয়। ইংরেজী ছন্দে আবার accent বা অক্ষরবিশেষের উচ্চারণের জন্য স্বাভাবিক স্বরগাম্ভীর্য্যই ধ্বনির প্রধান লক্ষণ। প্রতি চরণে কয়েকটি নিয়মিত সংখ্যার foot বা গণ থাকার দরুণ ঐক্যবোধ জন্মে; কিন্তু গণের মধ্যে accent-যুক্ত এবং accent-হীন অক্ষরের সমাবেশ হইতে বৈচিত্র্য-বোধ জন্মে।

এইরূপে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় ছন্দের প্রকৃতি ও আদর্শ বিভিন্ন। ছন্দের উপাদানীভূত বাক্যাংশের প্রকৃতি, ঐক্যবোধের ও বৈচিত্র্যবোধের ভিত্তিস্থানীয় ধর্ম্ম, ঐক্যের আদর্শ, ঐক্য ও বৈচিত্র্যের পরস্পর সমাবেশের রীতি—এই সমস্ত বিষয়েই পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে। সময়ে সময়ে আবার এক দেশেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছন্দের পৃথক্ রীতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, লৌকিক সংস্কৃতের বৃত্ত ছন্দের এবং অর্ব্বাচীন সংস্কৃতের মাত্রাবৃত্ত বা জাতি ছন্দের রীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির দৈহিক বিশেষত্ব এবং সভ্যতার ইতিহাস অনুসারে এই পার্থক্য নিরূপিত হয়। সংস্কৃত ভাষা কালক্রমে অনার্য্য-ভাষিত হওয়াতে এবং অনার্য্য ছন্দের প্রভাবে আসাতেই সম্ভবতঃ বৃত্তছন্দের স্থানে জাতিছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। বাক্যের

নানা ধর্ম্ম থাকিলেও প্রত্যেক জাতির পক্ষে দুই একটি বিশেষ ধর্ম্মই সমধিকরূপে মন ও শ্রবণ আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ভাষায় ছন্দোবন্ধনের রীতি তুলনা করিলে বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

(২)

বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্বগুলি বুঝিতে গেলে, প্রথমতঃ বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতির কয়েকটি বিশেষত্ব মনে রাখা দরকার। সেই বিশেষত্বগুলির সহিত বাংলা ছন্দের প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

প্রথমতঃ, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতিতে খুব বাঁধাধরা লক্ষণ কোন দিক্ দিয়া নাই। অবশ্য সব দেশেই যখন লোকে কথা বলে, তখন ব্যক্তিভেদে এবং সময়ভেদে একই শব্দের ধ্বনির অল্পাধিক তারতম্য ঘটে। কিন্তু অনেক ভাষাতেই শব্দের কোন না কোন একটি ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রধান হইয়া থাকে, এবং সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই ছন্দঃসূত্র রচিত হইয়া থাকে। সংস্কৃতে অক্ষরের মধ্যে কোন্‌টি হ্রস্ব, কোন্‌টি বা দীর্ঘ হইবে, তাহা সুনির্দ্দিষ্ট আছে, গদ্যে পদ্যে সর্ব্বত্রই তাহা বজায় থাকে, এবং তদনুসারে ছন্দ রচিত হয়। ইংরেজীতে যদিও অক্ষরের দৈর্ঘ্য সুনির্দ্দিষ্ট নয় এবং পদ্যে ছন্দের খাতিরে অক্ষরের দৈর্ঘ্য কমাইতে বা বাড়াইতে হয়, তত্রাচ এক দিক্ দিয়া অর্থাৎ accent-এর দিক্ দিয়া উচ্চারণের যথেষ্ট বাঁধাবাঁধি আছে। শব্দের কোন্ অক্ষরের উপর accent বা একটু বেশী জোর পড়িবে, তাহা এক রকম নির্দ্দিষ্ট আছে এবং accent-অনুসারেই ছন্দ রচিত হয়। বাংলায় ছন্দ মাত্রাগত, কিন্তু বাংলায় অক্ষরের মাত্রা বা কালপরিমাণ যে কি হইবে, সে বিষয়ে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই।

চল্‌তি বাংলার একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাক্ :—

"আর (,) টের পেলেই বা কি? | ধরা কি মুখের কথা! | ত্যাথ্, শ্রীকান্ত, | কিচ্ছু ভয়
নেই; | ব্যাটাদের চারখানা— | ডিঙ্গি আছে বটে— | কিন্তু যদি দেখিস্ | ঘিরে ফেলে
ব'লে | আর পালাবার | যো নেই, তখন | ঝুপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ে | এক ডুবে

যত দুর পারিস্ গিয়ে | ভেসে উঠ্‌লেই হ'ল। | এ অন্ধকারে আর | দেখবার জো-টি নেই।" | ("শ্রীকান্ত," শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

'এই ত চাই' | কিন্তু আস্তে ভাই | —ব্যাটারা ভারী পাজী। | আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে | মক্কা ক্ষেতের ভেতর দিয়ে | এম্‌নি বার ক'রে নিয়ে যাব | যে শালারা টেরও পাবে না। | ("শ্রীকান্ত," শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

(উপরের উদ্ধৃতাংশগুলিতে মোটা লম্বা দাঁড়ি দিয়া উচ্চারণের বিরামস্থল নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং ভারতীয় সঙ্গীতবিজ্ঞানের চল্‌তি সঙ্কেত অনুসারে অক্ষরের মাথায় চিহ্ন দিয়া মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়াছি ; মাথায় ।, মানে, একমাত্রা ; ॥, মানে, দুই মাত্রা ; ।।।, মানে, তিন মাত্রা বুঝিতে হইবে।)

উপরে উদ্ধৃত অংশগুলির মাত্রা বিচার করিলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত করা যায়,—

(১) সাধারণতঃ বাংলা উচ্চারণে প্রতি অক্ষর হ্রস্ব বা এক মাত্রা ধরা হইয়া থাকে।

(২) কিন্তু প্রায়শঃ দীর্ঘতর অক্ষর এবং, কখন কখন হ্রস্বতর অক্ষরও দেখা যায়।

(ক) একাক্ষর হলন্ত শব্দ সাধারণতঃ দীর্ঘ বা দুই মাত্রা ধরা হয় ; যথা—উদ্ধৃতাংশের 'আর্', 'টের্', 'ত্যাথ্'; কিন্তু কখন কখন হ্রস্বও হইয়া থাকে :—যথা, 'ঝুপ্'।

(খ) শব্দান্তের হলন্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ হয় (যথা—'ব্যাটাদের' শব্দে 'দের্', 'দেখিস্' শব্দে 'খিস্'), আবার কখনও হ্রস্ব হইতে পারে (যথা—'ঝাউবনের' পদে 'নের্')।

(গ) পদ-মধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ (যথা—'শ্রীকান্ত' শব্দের 'কান্'), কখন হ্রস্ব (যথা—'কিচ্ছু' শব্দের 'কিচ্', 'যতদুর' [=জদ্দূর্] পদের 'যৎ'), আবার কখন প্লুত—(যথা—'ফেল্‌লে' পদের 'ফেল্') হইতে পারে।

(ঘ) যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর প্রায়ই দীর্ঘ হয় (যথা—'নেই', গিয়ে (=গিএ), 'লাফিয়ে' শব্দের 'ফিয়ে' (=ফিএ); কখনও প্লুতও হয় (যথা—'চাই'); আবার কখনও 'হ্রস্ব' হয় (যথা—'পেলেই' শব্দে 'লেই')।

(ঙ) মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর প্রায়ই হ্রস্ব হয়, কিন্তু ইচ্ছামত তাহাদেরও দীর্ঘ করা যায়; যথা—'ধরা' শব্দের 'রা', 'জো-টি' পদের 'জো', 'ভারি' পদের 'ভা'।

চল্‌তি ভাষায় লিখিত পদ্য হইতেও ঐ সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। একটা উদাহরণ লওয়া যাক্—

(১) নিধিরাম চক্রবর্তী । শোণ কাটিছেন ব'সে,
(২) খেলারাম ভট্টাচার্য্য । উত্তরিল এসে।
(৩) নিধিরামকে খেলারাম । করিল সম্ভাষ।
(৪) নিধিরাম বলে তোমার । কোথায় নিবাস।
(৫) কি বলিলে পোড়া মুখ । কুল করিতে যায়?
(৬) সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল । অগ্নি দিল গায়।
(৭) ওর কপালে যদি । অন্য মেয়ে হইত,
(৮) এখ দিন ওর ভিটেয় । ঘুঘু চ'রে যেত।
(৯) কখন বলিনে যে । দিন গেল রে কিসে।
(১০) আমার গলিয়ায় রস আছে তাই । খাচ্ছে ব'সে ব'সে

এখানেও দেখা যায় যে,—

(ক) একাক্ষর হলন্ত শব্দ কখনও দীর্ঘ (যথা—১ম পংক্তিতে 'রাম'), কখনও হ্রস্ব (যথা—১ম পংক্তির 'শোণ', ১০ম পংক্তির 'রস'), কখন প্লুত (যথা—৭ম পংক্তির 'ওর') হইয়া থাকে।

(খ) শব্দান্তের হলন্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ (যথা—৪র্থ পংক্তির 'নিবাস' শব্দের 'বাস্', ৩য় পংক্তির 'সম্ভাষ' শব্দের 'ভাষ'), এবং কখনও হ্রস্ব (যথা—৪র্থ পংক্তির 'তোমার' পদের 'মার', ১০ম পংক্তির 'আমার' পদের 'মার') হয়।

(গ) পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর কখনও হ্রস্ব (১ম ও ২য় পংক্তির যুক্তবর্ণবিশিষ্ট অক্ষর মাত্রেই ইহার উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে), কখনও দীর্ঘ (যথা—৬ষ্ঠ পংক্তির 'সর্ব্বাঙ্গ' পদে 'বাঙ্')।

(ঘ) স্বরান্ত অক্ষর প্রায়শঃ হ্রস্ব, কিন্তু কখনও দীর্ঘও হইতে পারে (যথা—৯ম পংক্তির 'কখন' শব্দের 'ন')।

তা'ছাড়া স্থান-ভেদে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইতে পারে :—

(১) পঞ্চ নদীর তীরে | বেণী পাকাইয়া শিরে

(২) পঞ্চ ক্রোশ জুড়ি কৈলা | নগরী নির্ম্মাণ

এই দুই পংক্তিতে 'পঞ্চ' শব্দের উচ্চারণ এক নহে ; ১ম পংক্তিতে 'পঞ্চ' তিন মাত্রার এবং ২য় পংক্তিতে 'পঞ্চ' দুই মাত্রার ধরা হইয়াছে। তদ্রূপ,

(৩) এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য ! ওগো কৌতুক | ময়ী

(৪) ফেরে দূরে, মত্ত সবে | উৎসব-কৌতুকে

এই দুই উদাহরণেও 'কৌতুক' শব্দের উচ্চারণ একবিধ নহে।

নব্য বাংলার একজন ইংরেজী-শিক্ষিত কবির রচনা হইতেও উপরিলিখিত মতের প্রমাণ পাওয়া যায়—

কোথায় কৈশবী দল ? | বিদ্যাসাগর কোথা ?

মুখুয্যের কারচুপিতে | মুখ হইল ভোঁতা।

আসবে রাজা রাজ্‌পরিষদ্	লাট্‌ সাহেবের মেয়ে.
মার্‌বেল-মারা গিল্‌টি হলে	একবার দেখ চেয়ে।

("বাজিমাৎ", হেমচন্দ্র)।

এখানেও দেখা যায়, পদান্তের হলন্ত অক্ষর কোথাও দীর্ঘ (যথা—'মুখুয্যের' পদে 'য্যের্'), কোথাও হ্রস্ব (যথা—'বিদ্যাসাগর' পদে 'গর্') হইতেছে ; পদ-মধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর সেইরূপ কখনও হ্রস্ব, কখনও দীর্ঘ হইতেছে।

এই সমস্ত উদাহরণ হইতে বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি যে কিরূপ পরিবর্ত্তনশীল, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

ভারতীয় সঙ্গীতেও এই লক্ষণটি দেখা যায়। সঙ্গীতে গায়কের ইচ্ছামত যে কোন একটি অক্ষরের সিকি মাত্রা হইতে চার মাত্রা পর্য্যন্ত পরিমাণ হইতে পারে। সাধারণ কথাবার্ত্তায় মাত্রার এত বেশী পরিবর্ত্তন অবশ্য চলে না, তবু অর্দ্ধমাত্রা হইতে দুই মাত্রা, এমন কি, তিন মাত্রা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন প্রায়ই লক্ষিত হয়। উচ্চারণের এই পরিবর্ত্তনশীলতার সহিত বাংলা ছন্দের বিশেষ সম্পর্ক আছে।

বাঙালীর বাগ্‌যন্ত্রের কয়েকটি অঙ্গের—বিশেষতঃ জিহ্বার—নমনীয়তা ইহার কারণ।

ইচ্ছামত যে কোন অক্ষরকে হ্রস্ব বা দীর্ঘ করা বাঙালীর পক্ষে সহজ। প্রত্যেক অক্ষরকে হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করার প্রবৃত্তিই প্রবল, তবে পদান্তে যদি হলন্ত অক্ষর থাকে, সাধারণতঃ তাহার দীর্ঘ উচ্চারণ হয় (যথা—'পাখী-সব করে রব,' 'রাখাল গরুর পাল' ইত্যাদি উদাহরণে 'সব্' 'রব্' '-খাল্' '-রুর্' 'পাল্' ইত্যাদি একাক্ষর হইলেও দুই মাত্রা হিসাবে পঠিত হয়)। কিন্তু আবশ্যক-মত পদান্তস্থ হলন্ত অক্ষরও হ্রস্ব করা যায়। উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

বাঙালীর বাগ্‌যন্ত্রের নমনীয়তার জন্য বাংলা উচ্চারণের আর একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। বাঙালীর জিহ্বা ও বাগ্‌যন্ত্র অবলীলাক্রমে অবস্থান ও আকার পরিবর্ত্তন করে। সুতরাং প্রত্যেকটি স্বর অথবা অক্ষরের উচ্চারণের প্রয়াস বাংলা উচ্চারণের দিক্ দিয়া তত উল্লেখযোগ্য নহে। ইংরেজী ও সংস্কৃত

ভাষায় অক্ষরই উচ্চারণের দিক্ দিয়া বাক্যের প্রধানতম অঙ্গ, এবং ছন্দ রচনায় প্রত্যেকটি স্বরের ওজন এবং হিসাব ঠিক রাখিতে হয়। Inhumanity, Eternity ইত্যাদি শব্দের প্রত্যেকটি স্বরের হিসাব ছন্দের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং সেই জন্য পদ্যে Inhumanity শব্দটিকে পাঁচটি একস্বর শব্দের সমানরূপে ধরা হইয়া থাকে।

বাংলায় কিন্তু স্বরের সেরূপ প্রাধান্য লক্ষিত হয় না। Inhumanity আর what books can tell thee, ইহারা যে সমান ওজনের, তাহা বাংলা উচ্চারণের রীতিতে প্রতীত হয় না। কারণ, বাংলায় স্বর অন্যান্য বর্ণকে চাপাইয়া রাখে না। স্বরের উচ্চারণের চেষ্টাই বাক্যের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা নহে। খুব অল্প আয়াসে বাংলায় স্বরের উচ্চারণ হয় এবং অবলীলাক্রমে তাহার মাত্রা বৃদ্ধি, মাত্রা-হ্রাস কিংবা তাহার উপর উচ্চারণের জোর ফেলা যাইতে পারে। অনেক সময় এত লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে তাহাকে বাদ দেওয়া হয়। যথা—

পূর্ব্বে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাতে অনেক জায়গায় এই রীতির দৃষ্টান্ত আছে ; যেমন, 'লাফিয়ে'—'লাফ্ য়ে'—'লাফ্যে', 'থলিয়ায়'—'থল্ য়ায়্'—'থল্যায়্'। এই ভাবেই 'করিতে' 'চলিতে' প্রভৃতি রূপের জায়গায় এখন 'কর্তে' 'চল্তে' ইত্যাদি দাঁড়াইয়াছে।

আর এক দিক্ দিয়া ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন একটি স্বরের উচ্চারণ করিলে বা না করিলে ছন্দের কিছুমাত্র ইতর-

বিশেষ হয় না। যেমন, 'এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো কৌতুক-ময়ী'— এই পংক্তির প্রথম 'কৌতুক' শব্দটির শেষ বর্ণটিকে হসন্ত-ভাবে বা অকারান্ত পড়িলে একই ছন্দ থাকে ; পূর্ব্বের স্বর 'উ' কে দীর্ঘ ও শেষের 'ক'-বর্ণকে হসন্ত ভাবে পড়িয়া পংক্তির ঐ অংশটির মাত্রা পূরণ করিবার পরও একটু লঘু ভাবে (অ)
অন্ত্য অকারের উচ্চারণ করা যাইতে পারে [এ কি কৌতুক্,] তাহাতে কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, অক্ষর বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয়। অক্ষরের সংখ্যা বা অক্ষরের কোন নির্দ্দিষ্ট গুণের উপর বাংলা ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে না। যদি করিত তাহা হইলে, উপর্য্যুক্ত উদাহরণে 'কৌতুক' শব্দকে একবার দুই অক্ষর এবং একবার তিন অক্ষর ধরার জন্য ছন্দের ইতর-বিশেষ হইত।

বাংলা ভাষার আদিম কাল হইতেই উচ্চারণের এতাদৃশ পরিবর্ত্তনীয়তা লক্ষিত হয়। বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভাষায় প্রাচীন নমুনা ও তদ্ভব প্রাকৃত ভাষার পার্থক্য বুঝিবার একটি প্রধান চিহ্ন এই। সংস্কৃত, তথা পালি এবং অন্যান্য প্রাকৃত ভাষায় অক্ষরের দৈর্ঘ্য বাঁধা-ধরা নিয়মের উপর নির্ভর করে, গদ্যে ও পদ্যে সর্ব্বত্রই তাহা বজায় থাকে। কিরূপে প্রাকৃত ভাষা হইতে ক্রমে আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি হইল, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না ; কিন্তু বাংলার ন্যায় আধুনিক ভাষার প্রাচীনতম অবস্থা হইতেই দেখা যায় যে, অক্ষরের মাত্রার কোন স্থির নিয়ম নাই। "বৌদ্ধ গান ও দোহা" হইতে দুই এক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—

ধামার্থে চাটিল | সাঙ্কম গ ঢ ই
পারগামি লোঅ | নি্ভর তর হ ।
টালত মোর ঘ র | নাহি পড়বেষী ।
হাড়ীত ভাত নাহি | নিতি আবেশী ।

উপরের শ্লোক দুইটির মাত্রা বিচার করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, পুরাতন মাত্রা-বিধি অচল হইয়া গিয়াছে, এবং পাঠকের ইচ্ছানুসারে যে কোন অক্ষরের

হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ চলিতেছে। শূন্যপুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোক হইতেও তাহা প্রমাণ হয়,—

পশ্চিম দুয়ারে | দানপতি রায়

সোনার জাঙ্গালে | পথ বায়

কিন্তু ইহা হইতে যেন কেহ এ ধারণা না করেন যে, বাংলা ছন্দে অক্ষরের মাত্রা সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। নিয়ম আছে; অন্যত্র সে নিয়মের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে শুধু এইটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতিতে কোনও অক্ষরের মাত্রার দিক্ দিয়া একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই, সুতরাং ছন্দের আবশ্যকমত মাত্রার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

ইহার কারণ বুঝিতে গেলে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা দরকার। বর্ত্তমানে বাঙালীদের আদিপুরুষের খবর ভাল করিয়া জানা নাই। খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকে যাঁহারা বাংলায় বাস করিতেন, তাঁহাদের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নাই। তবে তাঁহারা যে আর্য্য ছিলেন না এবং তাঁহাদের ভাষাও যে আর্য্য-ভাষা ছিল না, তাহা বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ী ও কোলদিগের ভাষার সহিত তাঁহাদের ভাষার নিকট সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে যখন আর্য্য-ভাষা বাংলায় প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করিল, তখন নূতন নূতন আর্য্য কথার চল হইলেও আর্য্যাবর্ত্তের উচ্চারণ বাংলায় ঠিক চলিল না। কতক পরিমাণে হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ চলিল বটে, কিন্তু বাঁধা-ধরা নিয়ম করা গেল না, ছন্দে খাঁটি দেশী রীতি অর্থাৎ সমান ওজনের শ্বাস-বিভাগের পুনরাবৃত্তি করার রীতি রহিয়া গেল।

(২য়)

কথা বলার সময় আমরা অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি না, ফুসফুসে বাতাস কমিয়া গেলেই ফুসফুসের সঙ্কোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে সেই সঙ্কোচনের জন্য কম বা বেশী আয়াস বোধ হয়। সেই জন্য কিছু সময় পরেই পুনশ্চ নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য বলার বিরতি আবশ্যক হইয়া পড়ে। নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় শব্দোচ্চারণ করা যায় না। যখন উত্তেজক ভাবের জন্য ফুসফুসের পার্শ্ববর্ত্তী পেশীসমূহের সাময়িক উত্তেজনা ঘটে, তখন সঙ্কোচন-জনিত আয়াস

কম বোধ হয়, এবং সেই জন্য তত শীঘ্র বিরতির আবশ্যক হয় না। সেই জন্য উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা বা কবিতায় বিরতি তত শীঘ্র শীঘ্র দেখা যায় না।

সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে এ রকম বিরতির নাম যতি ("যতির্বিচ্ছেদঃ)। আমরা ইহাকে 'বিচ্ছেদযতি' বা শুধু 'ছেদ' বলিব। কারণ বাংলায় আর এক রকমের যতির ব্যবহার আছে, এবং বাংলা ছন্দে সেই যতিরই প্রয়োজনীয়তা অধিক। সে সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে।

খানিকটা উক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ থাকার জন্য তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। প্রত্যেক অংশ একটি পূর্ণ breath-group বা শ্বাস-বিভাগ এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া breath-pause বা ছেদ আছে। ব্যাকরণ অনুযায়ী প্রত্যেক sentence বা বাক্যই পূর্ণ একটি শ্বাসবিভাগ বা কয়েকটি শ্বাসবিভাগের সমষ্টি। বাক্যের শেষের ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, এবং ইহাকে major breath-pause অর্থাৎ পূর্ণচ্ছেদ বলা যাইতে পারে। বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন phrase বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টির মধ্যে সামান্য একটু ছেদ থাকে, তাহাকে minor breath-pause বা উপচ্ছেদ বলা যায়। প্রত্যেক শ্বাসবিভাগে কয়েকটি শব্দ থাকিতে পারে, কিন্তু উচ্চারণের সময় একই শ্বাসবিভাগের মধ্যে ধ্বনির গতি অবিরাম চলিতে থাকে।

পূর্ণচ্ছেদের সময়ে স্বর একটু দীর্ঘ কালের জন্য বিরতি লাভ করে। তখন নূতন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করা হয়। ইহাকে শ্বাস-যতিও বলা যাইতে পারে। অধিকন্তু, যেখানেই ছেদ আছে, সেখানেই অর্থের পূর্ণতা ঘটে বলিয়া ইহাকে sense-pause বা ভাব-যতিও বলা যাইতে পারে। উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, সেখানে অর্থবাচক শব্দসমষ্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; উপচ্ছেদ থাকার দরুণ বাক্যের অন্বয় কিরূপে করিতে হইবে, তাহা বুঝা যায়—একটি বাক্য অর্থবাচক নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্।

'রামগিরি হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত* প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া* মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে* জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে**, সেখান হইতে* কেবল বর্ষাকাল নহে*, চিরকালের মতো* আমরা নির্ব্বাসিত হইয়াছি**।" ("মেঘদূত", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

উপরের বাক্যটিতে যেখানে একটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, পড়িবার সময় সেইখানেই একটু থামিতে হয়, সেখানেই একটি উপচ্ছেদ পড়িয়াছে :

এইটুকু না থামিলে কোন্ শব্দের সহিত কোন্ শব্দের অন্বয়, ঠিক বুঝা যায় না। এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই বাক্যটী অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। যেখানে দুইটি তারকা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ বুঝিতে হইবে, সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা হইয়াছে, বাক্যের শেষ হইয়াছে, এবং সেখানে উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং নূতন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করা হয়। কথার মধ্যে ছন্দোবন্ধের জন্য যে ঐক্যসূত্র আবশ্যক, ছেদের অবস্থানই অনেক সময় তাহা নির্দ্দেশ করে। সমপরিমিত কালানন্তরে অথবা কোন নক্সার আদর্শ অনুযায়ী কালানন্তরে ছেদের অবস্থান হইতেই অনেক সময় ছন্দোবোধ জন্মে। বাংলা পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি সাধারণ ছন্দে ছেদের অবস্থানই অনেক সময় ছন্দের বিভাগ নির্দ্দেশ করে। যেমন—

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল* | ঈশ্বরী পাটনী ** ||
একা দেখি কুলবধূ* | কে বট আপনি ** || ("অন্নদামঙ্গল", ভারতচন্দ্র)।

গগন-ললাটে* | চূর্ণকায় মেঘ* |
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে** ||
কিরণ মাখিয়া | পবনে উড়িয়া* |
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে** || ("আশাকানন", হেমচন্দ্র)।

উপর্য্যুক্ত দুইটি দৃষ্টান্তে যে ভাবে অর্থবিভাগ, সেই ভাবেই ছন্দোবিভাগ হইয়াছে উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান দিয়াই ছন্দোবোধ জন্মিতেছে।

কিন্তু অনেক সময়েই পদ্যে ছেদের অবস্থান দিয়া ছন্দের ঐক্যসূত্র নির্দ্দিষ্ট হয় না। যে পদ্যে ছেদের আবির্ভাবের কাল অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট, তাহা অত্যন্ত একঘেয়ে ও স্পন্দনহীন বোধ হয়, সুতরাং তাহাতে ভালরূপে মানসিক আবেগের দ্যোতনা হয় না। ইংরাজীতে Pope-এর Heroic Couplet এবং বাংলা ভারতচন্দ্রের পয়ারে এই জন্য একটা বিরক্তিকর একটানা সুর অনুভূত হয়। যে পদ্যের ছন্দঃ সহজেই মনে কোনও বিশেষ ভাবের উদ্দীপনা করে, তাহাতে ছেদের অবস্থান অত নিয়মিত থাকে না। মাইকেল মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছেদের অবস্থানের যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে বলিয়া তাহাতে নানা বিচিত্র সুর অনুভূত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ছন্দের প্রাণ বৈচিত্র্যে, বৈচিত্র্য-হেতু আন্দোলনে, আবেগের সঞ্চারে। ঐক্যসূত্র ছন্দের কাঠাম, বৈচিত্র্য তাহার রূপ। যদি ছেদের অবস্থানের

দ্বারা ছন্দের ঐক্যসূত্র সূচিত হয়, তবে বাক্যের অন্য কোন লক্ষণের দ্বারা বৈচিত্র্যের নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু ধ্বনির বিচ্ছেদই শ্রবণ ও মনকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অভিভূত করে, সুতরাং ছেদ যদি ঐক্যের বন্ধন আনিয়া দেয়, তবে বাক্যের অন্য কোনও লক্ষণের দ্বারা যেটুকু বৈচিত্র্য সূচিত হয়, তাহা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই জন্য ভাবের তীব্রতা যে ছন্দে প্রবল, ছেদ সেখানে বৈচিত্র্যের উপাদান হইয়া থাকে।

কিন্তু ছেদ ছাড়াও বাক্যের অন্যান্য লক্ষণের দ্বারা ঐক্য সূচিত হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির উচ্চারণ-প্রণালীর পার্থক্য অনুসারে বাক্যের কোন একটি লক্ষণ ঐক্যের উপাদান বলিয়া গৃহীত হয়। কোনও জাতির ভাষায় বাক্যের যে লক্ষণ বাগ্‌যন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রয়াসের উপর নির্ভর করে এবং সেই জাতির সমস্ত ব্যক্তির উচ্চারণেই যে লক্ষণটি পূর্ণ ভাবে বজায় থাকে, তাহাই ঐক্যের উপাদানীভূত হইতে পারে।

ইংরাজীতে কোনও কোনও অক্ষরের উচ্চারণের সময় স্বরের গাম্ভীর্য্য বাড়িয়া যায়, তাহাকে accent-ওয়ালা অক্ষর বলা হয়। এই accent-এর অবস্থানই ইংরেজী ছন্দের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। কিন্তু বাংলায় কোনও অক্ষর-বিশেষের উচ্চারণে স্বর-গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধির স্বাভাবিক ও নিত্য রীতি নাই, অর্থাৎ বাংলা অক্ষরের উপর স্বরাঘাতের এমন কোন স্থির রীতি নাই, যাহাকে অবলম্বন করিয়া ছন্দের ঐক্যসূত্র রচনা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জে ডি এণ্ডার্‌সন্‌, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, প্রত্যেক বাংলা শব্দের প্রথমে একটু স্বরাঘাত পড়ে। এই জন্যই বাংলা শব্দের শেষের দিকের অক্ষরগুলিতে স্বর অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং বোধ হয় সেই কারণেই বাংলায় তৎসম বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য 'অ'-কার প্রায়ই উচ্চারিত হয় না। আর্য্যভাষা বাংলায় আসিবার পূর্ব্বে, বঙ্গদেশে যে সমস্ত ভাষার প্রচলন ছিল, তাহাদের উচ্চারণ প্রথা হইতে বোধ হয় এই রীতি আসিয়াছে। এখনকার সাঁওতালী প্রভৃতি ভাষাতেও বোধ হয় অনুরূপ রীতি আছে।

কিন্তু বাংলা শব্দের প্রারম্ভে যেটুকু স্বাভাবিক স্বরাঘাত পড়ে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়,—তাহা শ্রবণ বা মনকে আকৃষ্ট করে না। জিহ্বা নমনীয় ও ক্ষিপ্র বলিয়া এক ঝোঁকে অনেকগুলি শব্দ আমরা উচ্চারণ করিয়া যাই, এবং

সেই জন্য প্রত্যেক শব্দের অক্ষর-বিশেষের উপর বেশী করিয়া স্বরাঘাত দেওয়া আমাদের পক্ষে কিছু দুরূহ। সমান ভাবে সব কয়টি অক্ষর পড়িয়া যাইবার প্রবৃত্তি আমাদের বেশী। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, "গত কয় বৎসর বাঙালা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই পাঠ্যপুস্তক শ্রেণিভুক্ত" (প্রফুল্লচন্দ্র রায়)—এই রকম একটি বাক্য পাঠের সময় প্রত্যেক শব্দে উল্লেখযোগ্য স্বরাঘাত অনুভূত হয় না। কথিত ভাষায় যখন কোন একটি শব্দকে পৃথক্ ভাবে পড়া বা উচ্চারণ করা যায়, তখন শব্দের প্রারম্ভে একটু স্বরাঘাত পড়ে বটে, কিন্তু ইংরেজী শব্দে accent-ওয়ালা অক্ষরের যে রকম প্রাধান্য, বাংলা শব্দের প্রথম অক্ষরের ধ্বনির দিক্ দিয়া সে রকম প্রাধান্য নয়। 'দেখ্‌বি', 'ভেতর' প্রভৃতি শব্দের প্রারম্ভে যে স্বরাঘাত হয়, dist´inctly, rem´ember প্রভৃতি ইংরেজী শব্দের accent-ওয়ালা অক্ষরের উপর স্বরাঘাত তাহার চেয়ে ঢের বেশী।

বাংলা কথায় যে স্বরাঘাত স্পষ্ট অনুভূত হয়, তাহা শব্দ-গত নয়, শব্দসমষ্টি-গত। কয়েকটি শব্দে মিলিয়া যে অর্থবাচক বাক্যাংশ গড়িয়া উঠে, তাহারই প্রথম দিকের কোন শব্দে স্পষ্ট স্বরাঘাত পড়ে। পূর্ব্বে "শ্রীকান্ত" হইতে যে অংশটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার বিভাগগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রতি বিভাগে বা প্রতি বাক্যাংশে মাত্র একটি শব্দের কোনও একটি অক্ষরের উপর সুস্পষ্ট জোর পড়িতেছে। যেমন—'এই´ত চাই ; | কিন্তু আ´স্তে ভাই, | ব্যাটারা ভা´রি পাজী | '। বাক্যাংশের মধ্যে অর্থের ও অবস্থানের দিক্ দিয়া প্রাধান্য পাইলে যে-কোনও শব্দে স্বরাঘাত পড়িতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক ও নিত্য স্বরাঘাত প্রত্যেক শব্দে স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় না। প্রতি বাক্যাংশে যে স্বরাঘাত দেখা যায়, তদ্দ্বারা বাক্যের ছন্দোবিভাগ সহজে প্রতীত হয় এবং ছন্দতরঙ্গের শীর্ষ নির্দ্দিষ্ট হয়। এই স্বরাঘাত ছন্দোবিভাগের ও অর্থবিভাগের ফল, হেতু নহে ; সুতরাং স্বরাঘাত বাংলায় ছন্দোবিভাগের ঐক্যসূত্র নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

(পরিমিত কালানন্তরে বাগ্‌যন্ত্রে নূতন করিয়া শক্তির সঞ্চারই বাংলায় ছন্দোবিভাগের সূত্র।)

বাঙালীর বাগ্‌যন্ত্র খুব ক্ষিপ্র ও নমনীয় বটে, কিন্তু ইহার ক্লান্তিও শীঘ্র ঘটে। নিঃশ্বাস-গ্রহণের পর হইতে পরবর্ত্তী পূর্ণচ্ছেদ না আসা পর্য্যন্ত এক রকম অনর্গল

বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া চলিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে অনেক অক্ষর উচ্চারিত হয়। সুতরাং পূর্ব্বেই কিছু বিশ্রাম বা বিরামের আবশ্যক হইয়া পড়ে। যে সমস্ত ভাষায় দীর্ঘ স্বরের বহুল ব্যবহার আছে, তাহাতে স্বর উচ্চারণের সময় জিহ্বা কিছু বিরাম পায়; সুতরাং ভিন্ন করিয়া "জিহ্বেষ্টবিরামস্থান" নির্দ্দেশ করার দরকার হয় না। কিন্তু বাংলায় দীর্ঘস্বরের ব্যবহার খুবই কম, সুতরাং ছেদ ছাড়াও 'জিহ্বেষ্টবিরামস্থান' রাখিতে হয়। এক এক বারের ঝোকে জিহ্বা কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য এই বিরামের আবশ্যকতা বোধ করে। বিরামের পর আবার এক ঝোঁকে পুনশ্চ কয়েকটি অক্ষরের উচ্চারণ হয়। এই বিরামস্থলকে বিরামযতি বা শুধু 'যতি' নাম দেওয়া যাইতে পারে। যেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি impulse বা ঝোঁকের শেষ এবং তাহার পরে আর একটি ঝোঁকের আরম্ভ।

আমরা ছেদ ও যতি অথবা breath pause অর্থাৎ বিচ্ছেদযতি ও metrical pause বা বিরামযতি এই দুইয়ের পার্থক্য দেখাইতেছি। সংস্কৃতে ছন্দঃশাস্ত্রে এ রকম পার্থক্য স্বীকৃত হয় না। সংস্কৃতে "যতির্জিহ্বেষ্টবিরামস্থানম্" এবং "যতির্বিচ্ছেদঃ" এই দুই রকম সংজ্ঞাই আছে। সংস্কৃত ছন্দোবিদ্‌দের ধারণা ছিল যে, যখন ধ্বনির বিচ্ছেদ ঘটিবে, সেই সময়েই জিহ্বা বিরামলাভ করিবে এবং অন্য সময়ে জিহ্বার ক্রিয়া অবিরাম চলিবে। কিন্তু তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই যে, যখনই দীর্ঘস্বর উচ্চারিত হয়, তখনই জিহ্বা সামান্য কিছু বিরাম পায় এবং পায় বলিয়াই ২৮ মাত্রা বা ৩২ মাত্রার পর ছেদ বসাইলে চলিতে পারে।

যাহা হউক বাংলা ছন্দে ছেদ ও যতি—এই দুই রকম বিভাগস্থল স্বীকার করিতে হইবে। ছেদ যেমন দুই রকম—উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ, যতিও সেইরূপ মাত্রাভেদে দুই রকম—অর্দ্ধযতি ও পূর্ণযতি। ক্ষুদ্রতম ছন্দোবিভাগগুলির পরে অর্দ্ধযতি এবং বৃহত্তর ছন্দোবিভাগগুলির পরে পূর্ণযতি থাকে।

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই বাংলায় ছেদ ও যতি এক সঙ্গেই পড়ে। উপচ্ছেদ ও অর্দ্ধযতি এবং পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি অবিকল মিলিয়া যায়। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এবং হেমচন্দ্রের 'আশাকানন' হইতে পূর্ব্বে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেখানে এইরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় না। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছেদ ও যতির পরস্পর বিয়োগের জন্যই তাহার শক্তি ও

বৈচিত্র্য এত অধিক। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছাড়াও অনেক সময় ছেদ ও যতি ঠিক ঠিক মিলিয়া যায় না ; অথবা পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি মিলিলেও উপচ্ছেদ ও অর্দ্ধযতি মেলে না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

(*, * * এই সঙ্কেত দ্বারা উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং ।, ॥ এই সঙ্কেত দ্বারা অর্দ্ধযতি ও পূর্ণযতি নির্দ্দেশ করিতেছি।

(১) কৈলাস শিখর * | অতি মনোহর * | কোটি শশী পর | কাশ * * ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর * | যক্ষ বিদ্যাধর * | অপ্সরাগণের | বাস * * ॥

(২) আর—ভাষাটাও তা | ছাড়া * মোটে | বেঁকে না * য়য় | খাড়া * * ।
আর—ভাবের মাথায় | লাঠি মারলেও * | দেয় না কো সে | সাড়া ; * * ।
সে—হাজারি পা | দুলাই, * গোঁফে | হাজারি দিই | চাড়া ; * * ।
— ('হাসির গান', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

(৩) একাকিনী শোকাকুলা | অশোক কাননে ॥
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা * | আঁধার কুটীরে ॥
নীরবে। * * দুরন্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়িয়া ॥
ফেরে দূরে, * মত্ত সবে | উৎসব-কৌতুকে ॥ * *
—('মেঘনাদবধ কাব্য', ৪র্থ সর্গ, মধুসূদন)।

(৪) এই | প্রেমগীতিহার * ॥
গাঁথা হয় নরনারী | মিলন মেলায় * * ॥
কেহ দেয় তাঁরে, * কেহ | বঁধুর গলায় ॥ * * —('বৈষ্ণব কবিতা', রবীন্দ্রনাথ)।

যতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের ঐক্যবোধ জন্মে। পরিমিত কালানন্তরে কোন নক্সার আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই। কিন্তু ছেদ সময়ে সময়ে বিচিত্রভাবে ছন্দোবিভাগের মাঝে মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা স্রোতের স্থানে বিচিত্র আন্দোলন সৃষ্টি করে। যখন যতির সহিত ছেদের সংযোগ না হয়, তখন যতিপতনের সময় ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে ; শুধু জিহ্বার ক্রিয়া থাকে না, এবং স্বর একটা drawl বা দীর্ঘ টানে পর্য্যবসিত হয়। আবার জিহ্বা যখন impulse বা ঝোঁকের বেগে চলিতে থাকে, তখনও সহসা ছেদ পড়িয়া থাকে ; তখন মুহূর্ত্তের জন্য ধ্বনি শুদ্ধ হয়, কিন্তু জিহ্বা বিশ্রাম গ্রহণ করে না, ঝোঁকেরও শেষ হয় না, এবং ছেদের পর যখন ধ্বনিপ্রবাহ চলে, তখন আবার নূতন ঝোঁকের আরম্ভ হয় না। ছেদ sense বা অর্থ অনুসারে পড়ে ; সুতরাং ইহা দ্বারা পদ্য অর্থানুযায়ী অংশে বিভক্ত হয়। বাগ্‌যন্ত্রের সামর্থ্যানুসারে যতি পড়ে। ইহার দ্বারা পদ্য পরিমিত ছন্দোবিভাগে বিভক্ত হয়।

প্রত্যেক ছন্দোবিভাগ বাগ্‌যন্ত্রের এক এক বারের ঝোঁকের মাত্রানুসারে হইয়া থাকে। এক এক ঝোঁকে পরিমিত মাত্রার শ্বাস ফুস্‌ফুস্ হইতে বাহির হয়। এই ঝোঁকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের ঐক্যের লক্ষণ।

কেহ কেহ বলেন যে, পরিমিত কালানন্তরে স্বরাঘাতযুক্ত অক্ষর থাকাতেই ছন্দোবিভাগের বোধ জন্মে। কিন্তু এ মত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। অবশ্য যে শব্দ কয়টি লইয়া এক একটি ছন্দোবিভাগ গঠিত হয়, মিলিত ভাবে তাহাদের অনেক সময় একটি sense group বা অর্থবাচক বাক্যাংশ বলা যাইতে পারে, সুতরাং সেই শব্দসমষ্টির প্রথমে একটি স্বরাঘাত পড়িতে পারে। সুতরাং সময় সময় মনে হইতে পারে যে, স্বরাঘাতের অবস্থান হইতেই ছন্দোবিভাগ সূচিত হইতেছে। যথা,—

(১) বাঁশ বাগানে | মাথার উপর | চাঁদ উঠেছে | ঐ ।—(যতীন্দ্র বাগচি)।

(২) বউমা! বউমা! | ঘুমাও না আর।
উঠ অভাগিনি! | দেখ একবার।—("চৈতন্য সন্ন্যাস", শিবনাথ শাস্ত্রী)।

কিন্তু সব সময়েই এ রকম হয় না। অনেক সময়ই ছন্দোবিভাগের শব্দ কয়টি লইয়া কোন অর্থবাচক বাক্যাংশই হয় না। অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের ঠিক্ ঠিক্ মিল হয় না। পূর্ব্বে 'হাসির গান' হইতে যে কয়টি পংক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের কোন মিল নাই। তা' ছাড়া বাক্যাংশের ঠিক্ প্রথম অক্ষরেও সব সময়ে স্বরাঘাত পড়ে না। সর্ব্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়াবিভক্তি ইত্যাদি দিয়া কোন বাক্যাংশ আরম্ভ হইলে, তাহাদের বাদ দিয়া পরবর্ত্তী কোন শব্দে স্বরাঘাত পড়ে। অর্থগৌরব অনুসারে বাক্যাংশের শব্দবিশেষে স্বরাঘাত পড়াই রীতি। তা' ছাড়া পদ্যের চরণে একেবারে স্বরাঘাত-হীন একটি ছন্দোবিভাগ অনেক সময় থাকে, যেমন সঙ্গীতের তালবিভাগে স্বরাঘাত-হীন একটি অঙ্গ (খালি বা ফাঁক) সময়ে সময়ে থাকে। স্বরাঘাতযুক্ত শব্দে যুক্তবর্ণ থাকিলে শব্দের প্রথম অক্ষরে স্বরাঘাত না পড়িয়া যুক্তবর্ণের পূর্ব্ব অক্ষরে পড়িয়া থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

(১) এ যে সঙ্গীত | কোথা হ'তে উঠে
এ যে লাবণ্য | কোথা হ'তে ফুটে
এ যে ক্রন্দন | কোথা হ'তে টুটে

অন্তর বিদা | রণ

(২) শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভুঁই, | আর সবি গেছে | ঋণে
বাবু কহিলেন, | বুঝেছ উপেন, | এ জমি লইব | কিনে"
"কহিলাম আমি | "তুমি ভূস্বামী | ভূমির অন্ত | নাই

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, স্বরাঘাতের অবস্থান দিয়া ছন্দোবিভাগের সূত্র নির্দ্দিষ্ট হয় না।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। বাংলার এক একটি ছন্দোবিভাগ সংস্কৃতের 'পাদ' বা ইংরেজীর foot নয়। সংস্কৃত ছন্দের পাদ মানে একটি শ্লোকের চতুর্থাংশ। তাহার মধ্যে কয়েকটি গণ, একাধিক ছেদ, এবং প্রতি গণে দীর্ঘস্বরের সমাবেশ অনুসারে বিরামস্থল থাকিতে পারে। ইংরেজীতে foot মানে accent অনুসারে অক্ষর-বিন্যাসের একটি আদর্শ মাত্র। ইংরেজীতে foot-র শেষে কোনরূপ যতি বা বিরাম থাকার আবশ্যকতা নাই, শব্দের মধ্যে যেখানে কোনরূপ বিরামের অবকাশ নাই, সেখানেও foot-র শেষ হইতে পারে। বাংলা ছন্দের এক একটি বিভাগ এইরূপ একটি আদর্শ মাত্র নহে। ইংরেজী foot ও বাংলা ছন্দোবিভাগ এক মনে করার দরুণ অনেক সময় দারুণ ভ্রমে পতিত হইতে হয়। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে জনৈক লেখক—

'হায় রে বন্ধু দুঃখ মোর সে বলতে চক্ষে ঝরছে জল'—

চরণটির ছন্দোলিপি এই ভাবে করিয়াছেন,—

/ ⏑ | / ⏑ | / ⏑ | / ⏑ | / ⏑ | / ⏑ | / ⏑ | /
হায় রে | বন্ ধু | দুঃখ | মোর সে | বলতে | চক্ষে | ঝরছে | জল

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যাঁহার বোধ আছে, তিনিই স্বীকার করিবেন যে, ইহার ছন্দোলিপি হইবে—

— ⏑ — ⏑ — ⏑ — ⏑ — ⏑ — ⏑ — ⏑ —
হায় রে বন্ ধু ¦ দুঃ খ মোর সে | বল্‌তে চক্ষে | ঝর্ ছে জল

বাংলায় (অথবা কোন ভাষাতেই) এক চরণের আটটি বিভাগ হয় না। তা' ছাড়া লেখক যে রকম ঘন ঘন স্বরাঘাত দেখাইয়াছেন, বাংলায় তদ্রূপ হইতে পারে না। এক একটি অর্থবাচক বাক্যাংশে মাত্র একটি স্বরাঘাত পড়ে। মাত্র এক অক্ষর ব্যবধানে স্বরাঘাত পড়া বাংলায় সম্ভব নয়। ইংরেজী foot ও বাংলা ছন্দোবিভাগ মিলাইতে গিয়াই লেখক এতাদৃশ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে তালের হিসাবে যাহাকে 'বিভাগ' বলা হয়, তাহার সহিত ছন্দোবিভাগের মিল আছে। সংস্কৃতে যাহাকে 'পর্ব্বন্' বলা যায়, তাহাই বাংলা ছন্দোবিভাগের অনুরূপ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে **পর্ব্ব** শব্দের দ্বারা ছন্দোবিভাগ নির্দ্দেশ করা হইবে। পরিমিত মাত্রার পর্ব্ব দিয়া বাংলা ছন্দ গঠিত হয়। এক এক বারের ঝোঁকে ক্লান্তি বোধ বা বিরামের আবশ্যকতার বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত যতটা উচ্চারণ করা যায়, তাহার নাম পর্ব্ব। পর্ব্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ।

(২ গ)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অক্ষর বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয়। সংস্কৃত, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার ছন্দে প্রত্যেকটি অক্ষরের যেরূপ মর্য্যাদা, বাংলায় তদ্রূপ নহে। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য ছন্দঃশাস্ত্রের লেখকগণের মতে অক্ষর-ই ছন্দের অণু। কিন্তু অন্ততঃ একজন পাশ্চাত্য ছন্দঃশাস্ত্রকারের (Aristotle-এর শিষ্য—Aristoxemus-এর) মত যে, পরিমিত কালবিভাগ অনুসারেই ছন্দোবন্ধ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সমস্ত ভাষার ছন্দঃ সম্বন্ধে অবশ্য এ মত সত্য না হইতে পারে, কিন্তু Aristoxemus সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রীক্ ও তৎসাময়িক প্রাচ্য ভাষায় প্রচলিত ছন্দের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, বাংলায় গদ্য বা পদ্যপাঠের সময় প্রত্যেকটি অক্ষর বা তাহাদের কোন বিশেষ ধর্ম্মের তারতম্য ততটা মনোযোগ আকৃষ্ট করে না বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না। বাঙালীর বাগ্‌যন্ত্রের বা বাঙালীর উচ্চারণের লঘুতা বা তদ্রূপ অন্য কোন গুণের জন্য হয় তো এরূপ হইতে পারে। তবে এটা ঠিক্ যে, শব্দ ও তাহার মাত্রাই আমাদের কাণে স্পষ্ট ধরা দেয়, অক্ষরবিশেষ বা তাহার অন্য কোন ধর্ম্ম গদ্যে বা পদ্যে কোথাও তেমন স্পষ্টরূপে ধরা দেয় না। অক্ষর নয়,—পুরা শব্দই আমাদের ছন্দের মূল উপাদান এবং উচ্চারণের ভিত্তিস্থানীয়।

বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম হইতেও বাংলা ভাষার এই লক্ষণটি বোঝা যায়। বাংলায় শব্দ হইতে inflexion বা পদ-সাধনের সময় প্রায়শঃ শব্দের সঙ্গে আর একটি শব্দ জুড়িয়া দেওয়া হয়। একবচন হইতে বহুবচন সাধনের জন্য, নানা কারক, নানা ল-ক'র, কৃৎ, তদ্ধিত ইত্যাদির জন্য শব্দের সঙ্গে বিভক্তি বা প্রত্যয়সূচক অন্য শব্দ যোগ করাই বিধি; সংস্কৃতের ন্যায় মাত্র আক্ষরিক

পরিবর্ত্তনের দ্বারা বাংলায় এ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। এ দিক্ দিয়া suffix-agglutinating বা 'প্রত্যয়-বাচক শব্দ-সংযোগময়' ভাষাবর্গের সহিত বাংলার ঐক্য আছে।

বাংলার আর একটি রীতি—প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা। বাংলায় দুই সন্নিকটবর্ত্তী অক্ষরের সন্ধি করিয়া একটি অক্ষর-সাধনের প্রথা চলিত নাই। কেবলমাত্র তৎসম শব্দের মধ্যেই এরূপ সন্ধি চলিতে পারে। সমাসবদ্ধ হইলেও বাংলা শব্দের মধ্যে এ ধরণের সন্ধি চলে না, 'কচু', 'আলু', আদা', এই তিনটি শব্দ সমাসবদ্ধ করিলেও 'কচ্বাদা' হইবে না। সেই রকম 'ভেসে-আসা', 'আলো-আঁধার' ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদ হইলেও সেখানেও দুই অক্ষরের সন্ধি করিয়া এক অক্ষর করা হয় নাই, পদের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি শব্দ অযুক্ত আছে। এমন কি তৎসম শব্দকেও খাঁটি বাংলা রীতিতে ব্যবহার করিলে তাহাদেরও সমাসের মধ্যে অযুক্ত রাখা চলে। রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'য় 'স্নেহ-অশ্রু', 'বিচার-আগার' ইত্যাদি সমাস ব্যবহার করিয়াছেন।

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে গেলে বাংলা ভাষার এই রীতিগুলি মনে রাখা একান্ত দরকার। বাংলা ছন্দের এক একটি পর্ব্বকে কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মনে না করিয়া কয়েকটি শব্দের সমষ্টি মনে করিতে হইবে। নতুবা বাংলা ছন্দের মূল সূত্রগুলি ঠিক বুঝা যাইবে না। 'এ কথা জানিতে তুমি' এই পর্ব্বটির মধ্যে ৮টি অক্ষর আছে শুধু তাহাই লক্ষ্য করিলে চলিবে না; ইহা যে, 'এ কথা', 'জানিতে', 'তুমি' এই তিনটি শব্দের সমষ্টি,—তাহাও হিসাব না করিলে বাংলা ছন্দের অনেক তথ্য ধরা যাইবে না।

সাধারণতঃ বাংলা শব্দ দুই বা তিন মাত্রার, কখন কখন এক বা চার মাত্রারও হয়। সমাসবদ্ধ বা বিভক্তিযুক্ত হইলে অবশ্য শব্দ ইহার চেয়ে বড় হইতে পারে, কিন্তু মূল বাংলা শব্দ ইহার চেয়ে বড় হয় না। চার মাত্রার চেয়ে বড় কোনও শব্দ ব্যবহৃত হইলে উচ্চারণের সময় স্বতঃই তাহাকে ভাঙিয়া ছোট করিয়া লওয়া হয়। বাংলা উচ্চারণের এই আর একটি উল্লেখযোগ্য রীতি, এবং ইহার সহিত বাংলা ছন্দের রীতির বিশেষ সম্পর্ক আছে। 'পারাবার' শব্দটি চার মাত্রার, কিন্তু 'পারাবারের' শব্দটি পাঁচ মাত্রার, এ জন্য উচ্চারণের সময় ইহাকে স্বতঃই 'পারা—বারের' এই ভাবে

ভাঙিয়া পড়া হয়। 'চাহিয়াছিল' শব্দটিকে 'চাহিয়া—ছিল' এই ভাবে উচ্চারণ করা হয়।

পর্ব্বের মধ্যে যে কয়টি মূল শব্দ (বা সমুচ্চার্য্য শব্দাংশ) থাকে, তাহারা প্রত্যেকে স্বয়ং বা অপর দু'একটি শব্দের সহযোগে Beat বা পর্ব্বের উপবিভাগ বা অঙ্গ গঠিত করে। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন প্রত্যেকটি বিভাগ কয়েকটি অঙ্গের সমষ্টি, বাংলা ছন্দে তেমনি প্রত্যেকটি পর্ব্ব কয়েকটি অঙ্গের সমষ্টি। 'বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়' এই পংক্তিটির মধ্যে দুইটি পর্ব্ব আছে—'বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে' ও 'ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চ'লে যায়।' প্রথম পর্ব্বটি 'বিদ্যুৎ', 'বিদীর্ণ', 'শূন্য' এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি ; দ্বিতীয় পর্ব্বটি 'ঝাঁকে ঝাঁকে' 'উড়ে চ'লে', 'যায়' এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি। প্রত্যেকটি অঙ্গের প্রারম্ভে স্বরের intensity বা গাম্ভীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অঙ্গের শেষে গাম্ভীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা কম। এই ভাবে স্বর-গাম্ভীর্য্যের উত্থান-পতন অনুসারে অঙ্গবিভাগ বোঝা যায়। এই প্রবন্ধের ২য় পরিচ্ছেদে এক একটি অর্থবিভাগের কোন একটি বিশেষ অক্ষরের উপর যে স্বরাঘাতের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত এই স্বরগাম্ভীর্য্যের ঐক্য নাই। এই স্বরগাম্ভীর্য্যে সে রকম কোন বিশেষ জোর নাই, ভালরূপে লক্ষ্য না করিলে ইহা ধরা যায় না। কিন্তু এই ভাবে অঙ্গবিভাগ হইতেই কবিতার পর্ব্বে ছন্দোলক্ষণ প্রকাশ পায়, পর্ব্বের মধ্যে স্পন্দন বা দোলন অনুভূত হয়। বাংলা ছন্দের বিশিষ্ট নিয়মানুসারে পর্ব্বাঙ্গগুলি না সাজাইলে ছন্দঃপতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পর্ব্বাঙ্গগুলিকে বাংলা ছন্দের উপকরণ বলা যায় না—কারণ ইহাদের সমমাত্রা বা সমভাব হইতে ছন্দের ঐক্যবোধ জন্মে না। পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঙ্গের মাত্রা ইত্যাদির লক্ষণ পৃথক্ হইতে পারে, এবং তজ্জন্য পর্ব্বের মধ্যেই কতকটা বৈচিত্র্যের বোধ হয়।

বাংলা ছন্দের রীতি—যতদূর সম্ভব এক একটি শব্দ সম্পূর্ণভাবে কোন একটি অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। অঙ্গ চারে মাত্রার চেয়ে বড় হয় না সুতরাং চার-মাত্রার চেয়ে বড় শব্দ ভাঙিয়া ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে দিতে হয় ; কিন্তু যদি সম্ভব হয়, শব্দের মূলধাতু না ভাঙিয়া একই অঙ্গের মধ্যে রাখিতে হইবে। আর সময়ে সময়ে যেখানে ছন্দোবন্ধের সূত্র অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট—বিশেষতঃ যে রকম ছন্দে স্বরাঘাতের প্রাধান্য খুব বেশী—সেখানে ছন্দের খাতিরে এই রীতির ব্যত্যয় করা যাইতে পারে।

(৩)

অক্ষরের কোন না কোন এক বিশেষ ধর্ম্মের উপর কোন এক বিশেষ ছন্দঃ পদ্ধতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজী ছন্দঃ মূলতঃ অক্ষরের উপর স্বরাঘাতের সহিত সংশ্লিষ্ট। উৎকৃষ্ট ইংরেজী কবিতায় অবশ্য অক্ষরের দৈর্ঘ্য ও 'রঙ্' ইত্যাদিও ছন্দ-সৌন্দর্য্যের সহায়তা করে, কিন্তু স্বরাঘাতের অবস্থানই ইংরেজী ছন্দে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। বাংলা, সংস্কৃত ইত্যাদি বহু ভাষায় অক্ষরের দৈর্ঘ্য অথবা মাত্রা অনুসারেই ছন্দোরচনা হইয়া থাকে। স্বরাঘাত ইত্যাদি যে বাংলা ছন্দে নাই এমন নহে, কিন্তু ছন্দের ভিত্তি—মাত্রা; স্বরাঘাত বা অন্য কিছু নহে।

মাত্রানুসারী ছন্দের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি হইতে পারে। সংস্কৃতের বৃত্তছন্দে হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সাজাইবার বৈচিত্র্যের উপর ছন্দের

— —⏑———⏑ ⏑—⏑—— ——— —⏑——

উপলব্ধি নির্ভর করে। 'ছা য়া প পে নে ব শ রৎ প্র স ন্নম্' 'যা সৃ ষ্টিঃ স্র ষ্টু রা দ্যা

⏑⏑⏑ ⏑⏑⏑— — ⏑—— ⏑——

ব হ তি বি ধি হু তং যা হ বি র্যা চ হো ত্রী' ইত্যাদি চরণে হ্রস্বের পর হ্রস্ব বা দীর্ঘ এবং দীর্ঘের পর দীর্ঘ বা হ্রস্ব অক্ষর থাকার জন্য প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের বিচিত্র সমাবেশ হেতু নানাভাবে ভাবের বিচিত্র বিলাস অনুভূত হয়। ছন্দের হিসাবে সেখানে প্রতি অক্ষরটির মাত্রা ভাব উৎপাদনের সহায়তা করে, এবং স্পন্দনবৈচিত্র্য আনাই সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। সেখানে ঐক্যবোধ জন্মে প্রতি পাদে অক্ষরের সংখ্যা হইতে। ঐক্যসূত্র সেখানে প্রধান নহে, বৈচিত্র্যই সেখানে প্রধান।

বাংলা ছন্দঃ কিন্তু মাত্রাসমক জাতীয়; অর্থাৎ ইহার প্রত্যেকটি বিভাগে মোটমাট একটা পরিমিত মাত্রা থাকা দরকার। চরণের, পর্ব্বের, ও পর্ব্বাঙ্গের মাত্রাসমষ্টি লইয়াই বাংলায় ছন্দোবিচার। বাংলা ছন্দে সাধারণতঃ বৈচিত্র্য অপেক্ষা ঐক্যের প্রাধান্যই অধিক। পরিমিত মাত্রার ছন্দোবিভাগগুলিকে উপকরণরূপে ব্যবহার করার উপরই ছন্দোবোধ নির্ভর করে। প্রত্যেকটি বিশেষ অক্ষরের মাত্রা বা কোন একটি ছন্দোবিভাগের মধ্যে তাহাদের সমাবেশের পদ্ধতি বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নহে। বাংলা ছন্দে যে সমস্ত জায়গায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশ করা হইয়াছে, সেখানেও দেখা

যাইবে যে, হ্রস্ব ও দীর্ঘের পারম্পর্য্য হইতে ছন্দোবোধ আসিতেছে না। যেমন—

হোথায় কি : আছে | আলয় : তোমার— = (৪ + ২) + (৩ + ৩)

উর্ম্মি : মুখর | সাগরের : পার— = (৩ + ৩) + (৪ + ২)

মেঘ : চুম্বিত | অস্ত : গিরির— = (২ + ৪) + (৩ + ৩)

চরণ : তলে ? = (৩ + ২)

এই কয় পংক্তিতে হ্রস্ব অক্ষরের সহিত দীর্ঘ অক্ষরের সুন্দর সমাবেশ হইলেও প্রতি পর্ব্বে ছয়টি করিয়া মাত্রা থাকার জন্যই ছন্দের উপলব্ধি হইতেছে, হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশ হেতু বৈচিত্র্যের জন্য নহে।

অর্ব্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত এবং উত্তর ভারতীয় সমস্ত তদ্ভব ভাষায় ছন্দের এই প্রধান লক্ষণ। ছন্দের এক একটি বিভাগের শব্দ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তদনুসারেই ছন্দোরচনা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উচ্চারণের এক এক ঝোঁকে যে পরিমাণ শ্বাস ত্যাগ হয়, তাহাই উচ্চারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। ইহাতে ফুস্‌ফুসের দুর্ব্বলতা ও বাগ্‌যন্ত্রের শীঘ্র ক্লান্তি প্রভৃতি কয়েকটি জাতীয় লক্ষণ সূচিত হয়। সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে ভারতীয় জাতিতত্ত্বের কোন দুরূহ সূত্র লুক্কায়িত আছে। আর্য্যেরা ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের উচ্চারণ-পদ্ধতি ও ছন্দের প্রকৃতি একরূপ ছিল; কিন্তু তাঁহারা ভারতে আসার পর তাঁহাদের ভাষা অনার্য্যভাবিত হইতে লাগিল। অনার্য্যের বাগ্‌যন্ত্রের লক্ষণ ও উচ্চারণ রীতি অনুসারে আর্য্য ভাষা ও তদ্ভব ভাষাতে উচ্চারণ ও ছন্দের পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ছন্দের রাজ্যে 'পরের সোণা কাণে দেওয়া' চলে না, এক-এক জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর ইহার রীতি নির্ভর করে।* যাহা হউক, বাঙালীর পক্ষে ঝোঁকে ঝোঁকে প্রশ্বাসত্যাগই উচ্চারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনবলীল ব্যাপার, সুতরাং ইহাকেই ভিত্তি করিয়া বাংলায় ছন্দোরচনা হইয়া থাকে। জিহ্বা ও কণ্ঠনালীর পেশীর আকুঞ্চন ও প্রসারণ ইত্যাদির দ্বারা অক্ষরের উচ্চারণ অত্যন্ত অবলীলায় সম্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং অক্ষরের সংখ্যা কম বা নানা রকমের অক্ষরের বিচিত্র সমাবেশ ছন্দের পক্ষে তেমন প্রধান নহে। প্রশ্বাসের ঝোঁকের মাত্রাই বাঙালীর কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

Symmetry বা প্রতিসমতা বাংলা ছন্দের আর একটি প্রধান গুণ। বাংলায় ছন্দের আদর্শ—জোড়ায় জোড়ায় ছন্দোবিভাগগুলিকে সাজান। এই জন্য দুই বা দুইয়ের গুণিতক চার—এই সংখ্যাগুলিরই ছন্দ-গঠনে অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। ভারতীয় সঙ্গীতের কালবিভাগেও এই রীতি দেখা যায়; প্রতি আবর্ত্তে বিভাগের সংখ্যা এবং প্রতি বিভাগে অঙ্গের সংখ্যা সাধারণতঃ দুই কিম্বা চার হইয়া থাকে। বাংলা কবিতার প্রতি চরণেও দুই বা চার পর্ব্ব থাকে। প্রাচীন সমস্ত ছন্দেরই এই লক্ষণ। আপাততঃ ত্রিপদী ছন্দকে অন্যবিধ মনে হইতে পারে, কিন্তু আসলে ত্রিপদী চৌপদীরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ত্রিপদীর শেষ পর্ব্বটি অপর দুইটি পর্ব্ব অপেক্ষা দীর্ঘ হইয়া থাকে; লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই তৃতীয় পর্ব্বটি প্রথম দুই পর্ব্বের সমান একটি বিভাগ এবং অতিরিক্ত একটি ক্ষুদ্রতর বিভাগের সমষ্টি। এই ক্ষুদ্রতর বিভাগটি চতুর্থ একটি পর্ব্বের প্রচ্ছন্ন প্রতিনিধি। যাঁহারা ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে, লঘু ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে অতি সহজেই একতালায় এবং দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে সহজেই কাওয়ালী-জাতীয় তালে গাওয়া যাইতে পারে। একতালা ও কাওয়ালী, উভয় তালেই প্রতি বিভাগে চারিটি করিয়া অঙ্গ থাকে। সুতরাং ইহা হইতেও ত্রিপদী ছন্দের গূঢ় তত্ত্বটি বোঝা যায়। প্রায় সমস্ত বাংলা কবিতা, ছড়া, পদাবলী, গীত ইত্যাদিতে ছন্দের প্রতিসমতা লক্ষ্য করা যায়।

• • • •

আধুনিক বাংলা কাব্যে অবশ্য প্রতিসমতার আধিপত্য তত বেশী দেখা যায় না। নানা ভাবে লেখকগণ প্রতিসমতার স্থলে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের লক্ষ্য—বিভিন্ন প্রকারের আবেগের দ্যোতনা, এবং সেই জন্য তাঁহারা আবেগসূচক বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের রচিত ছন্দঃ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে কোন কোন দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য থাকিলেও প্রতিসমতা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় হইয়া আছে। যেমন, নূতন ধরণের ত্রিপদীতে অনেক সময় তৃতীয় পর্ব্বটি প্রথম দুইটি পর্ব্ব অপেক্ষা ছোট হইয়া থাকে, সুতরাং এ ধরণের ত্রিপদীকে প্রচ্ছন্ন চৌপদী বলা যায় না এবং তজ্জন্য এখানে প্রতিসমতা নাই মনে হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, এই সব স্থলে ত্রিপদী দ্বিপদীরই রূপান্তর মাত্র, তৃতীয় পর্ব্বটি অতিরিক্ত (hypermetric) পদ মাত্র। উদাহরণ স্বরূপে দেখান যাইতে পারে যে,

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন এক মনে
জপিছেন নাম।
হেন কালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।

এই সব স্থলে চরণের তৃতীয় পর্ব্বটি যেন প্রথম দুই পর্ব্ব হইতে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন এবং প্রথম দুই পর্ব্বের ছন্দঃপ্রবাহের পর সম্পূর্ণ বিরাম আসিবার পূর্ব্বে বাগ্‌যন্ত্রের প্রতিক্রিয়াজনিত একরূপ প্রতিধ্বনি। ইংরেজীতে

Whe're the qu'iet co'loured end' of ‖ even'ing smiles',
Miles' and m'iles
On' the so'lita'ry pas'tures ‖ wh'ere our she'ep
Ha'lf-asle'ep

প্রভৃতি কবিতায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তি যেরূপ প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষ পর্ব্বের প্রতিধ্বনি, এখানেও প্রায় তদ্রূপ।

এতদ্ভিন্ন বাংলা blank verse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও 'বলাকা' প্রভৃতি কবিতার তথাকথিত free verse বা মুক্তবন্ধ ছন্দে প্রতিসমতা ত্যাগ করিয়া ভাবানুরূপ, আদর্শে ছন্দঃ গঠন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর ও মুক্তবন্ধ ছন্দে ছেদের অবস্থান-বৈচিত্র্য এবং অতিরিক্ত পদের সমাবেশ ইত্যাদি কারণে বৈচিত্র্যের ভাব অধিক অনুভূত হইলেও, ছন্দের আসল কাঠামটিতে প্রতিসমতা আছে, অর্থাৎ যতির অবস্থানের দিক্ দিয়া প্রতিসমতা আছে। যথা,—

নিশার স্বপন সম | তোর এ বারতা ‖
রে দূত !* * অমরবৃন্দ | যার ভুজবলে ‖
কাতর, * সে ধনুর্দ্ধরে | রাঘব ভিখারী ‖
বধিল সম্মুখ রণে ? * *

এই কয় পংক্তিতে ছেদের অবস্থান-বৈচিত্র্য থাকিলেও যতির অবস্থানের দিক্ দিয়া প্রতিসমতা আছে।

প্রায় সকল প্রকারের সুকুমার কলায় প্রতিসমতার প্রভাব দেখা যায়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য হইতে নৃত্যকলায় পর্য্যন্ত ইহা লক্ষিত হয়। মানবদেহে

সমযুগ্মভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থানের দরুনই বোধ হয়, ছন্দঃসৃষ্টিতে প্রতিসমতার এত প্রভাব। যাহা হউক, সব ভাষার কবিতাতেই ইহা দেখা যায়। প্রাচীন ইংরেজী কবিতার প্রত্যেক চরণ দুই ভাগে বিভক্ত হইত, আধুনিক ইংরাজীতেও সাধারণতঃ প্রতি চরণের মাঝে একটি করিয়া caesura থাকে। সংস্কৃতে 'পদ্যং চতুষ্পদী' এই সংজ্ঞা হইতেই প্রতিসমতার প্রভাব বুঝা যায়। কিন্তু বাংলার ছন্দঃ ও অন্যান্য ভাষার ছন্দে প্রকৃতিগত পার্থক্য এই যে, বাংলায় প্রতিসমতাবোধ ছন্দোবোধের মূল উপাদান। যতক্ষণ না দুইটি বিভাগের প্রতিসমতার উপলব্ধি হয়, ততক্ষণ বাংলায় ছন্দের ছন্দ-ত্ব প্রতীত হয় না। শুধু 'রাত পোহাল' বলিলে কোনরূপ ছন্দোবোধ হয় না, 'রাত পোহাল ফর্‌সা হ'ল' যতক্ষণ না বলা হয়, ততক্ষণ কোনভাবে ছন্দের উপলব্ধি হয় না। কিন্তু ইংরেজীতে accent-যুক্ত এবং accent-হীন syllable-এর সমাবেশ হইতেই ছন্দোবোধ আসে; বিশেষ স্পন্দন ধর্ম্মবিশিষ্ট এক একটি foot-এর অস্তিত্ব বা accent-এর অবস্থান হইতেই ছন্দোবোধ আসে। When the hounds | of spring ॥ are on win | ter's tra | ces—এই চরণটির মাঝখানে একটি caesura থাকিয়া ইহাকে দুইটি প্রতিসম অংশে ভাগ করিতেছে, কিন্তু ছন্দোবোধের জন্য সমস্ত চরণটি পড়া দরকার হয় না। When the hounds of spring বলিলেই accent-এর অবস্থান হেতু ধ্বনিপ্রবাহে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ছন্দের বোধ জন্মে। সংস্কৃতেও স্রগ্ধরা, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি ছন্দের এক একটি পাদ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই নানাবিধ গণের সমাবেশ-রীতিতে দীর্ঘ ও হ্রস্ব অক্ষরের বিচিত্র পারম্পর্য্য হইতেই ছন্দোবোধ জন্মে, বিশেষ এক ধরণের ভাব জমিয়া উঠে। এই সমস্ত ছন্দের প্রভাব, ভারতীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণীর আলাপের যেরূপ প্রভাব, তাহার অনুরূপ। . . .

এই ধরণের rhythmic variety বা স্পন্দন-বৈচিত্র্য যে বাংলায় একেবারে হয় না, তাহা নয়। তবে তাহা অক্ষরগত নহে, হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাবেশ-বৈচিত্র্যের জন্য তাহা সমুদ্ভূত নহে। কারণ, বাংলায় উচ্চারণ-পদ্ধতি যেরূপ, তাহাতে প্রায় সমস্ত অক্ষরই প্রায় এক রকমের, এক ওজনের বলিয়া বোধ হয়। ইংরেজীতে accented ও unaccented এবং সংস্কৃতে দীর্ঘ ও হ্রস্ব যেরূপ দুই বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হয়, বাংলায় সেরূপ হয় না।

এইখানে এ সম্বন্ধে একটি মত আলোচনা করা আবশ্যক। আধুনিক বাংলার মাত্রিক ছন্দের মধ্যে সংস্কৃতানুরূপ স্পন্দন-বৈচিত্র্য আনা যাইতে পারে, এরূপ কেহ মনে করিতে পারেন; কারণ, বাংলা মাত্রিক ছন্দেও দুই মাত্রার অক্ষরের বহুল ব্যবহার আছে। এ রীতির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ লওয়া যাক্—

হঠাৎ কখন্ | সন্ধ্যে-বেলায়
নাম-হারা ফুল | গ ন্ধ এলায়,
প্রভাত-বেলায় | হেলাভরে করে
অরুণ কিরণে | তুচ্ছ
উ দ্ধ ত য ত | শাখার শিখরে
রডোডেনড্রন্ | গুচ্ছ।

আপাততঃ মনে হইবে যে, এখানে যখন এতগুলি দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে, তখন বাংলায় হ্রস্ব ও দীর্ঘের সমাবেশ-বৈচিত্র্য এবং সংস্কৃতের অনুরূপ ছন্দ আনা যাইবে না কেন? কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শেষ পংক্তিতে যেখানে একটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে ছাড়া আর কোন পর্ব্বেই উপর্য্যুপরি দুইটি দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার নাই, সুতরাং সংস্কৃতে পর পর অনেকগুলি দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহারের জন্য যে মন্থর গম্ভীর উদাত্ত ভাব জমিয়া উঠে এবং মধ্যে মধ্যে হ্রস্ব অক্ষরের ব্যবহারের জন্য ধ্বনি-প্রবাহ দ্রুতবেগে চলিয়া, আবার দীর্ঘ অক্ষরের গায়ে প্রতিহত হইয়া যেরূপ উচ্ছলিত হইতে থাকে, বাংলায় তাহার অনুকরণ করা এক রকম অসম্ভব; কারণ, বাংলায় দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার কম; এবং একই শব্দের মধ্যে বা একই পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে উপর্য্যুপরি দুইটি দ্বিমাত্রিক অক্ষর পাওয়াই কঠিন। দ্বিমাত্রিক অক্ষর-পরম্পরা যদি একই পর্ব্বাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া বিভিন্ন পর্ব্বাঙ্গ বা পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তো যতি ইত্যাদির ব্যবধানের জন্য সেই পারম্পর্য্যের কোন ফল পাওয়া যায় না। সুতরাং বাংলায় স্পন্দন-বৈচিত্র্যের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ।

কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেও চলিত ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে যেটুকু ধ্বনিতরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঠিক ইংরেজী ও সংস্কৃতের অনুরূপ ছন্দস্পন্দন বলা যায় কিনা, খুব সন্দেহের বিষয়। এ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধ্বনির প্রকৃতি একটু সূক্ষ্মরূপে অনুধাবন করা আবশ্যক। বাংলায় সংস্কৃতের ন্যায় মৌলিক দীর্ঘস্বরের ব্যবহার একরূপ নাই। ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে হলন্ত এবং যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া গণনা করা হয়, তাহাদের উচ্চারণের পরিমাণ অন্যান্য অক্ষরের চেয়ে অধিক হয়। কিন্তু যথার্থ ছন্দঃস্পন্দন সৃষ্টি করিতে হইলে, দুই প্রকারের অক্ষর দরকার; এই দুই প্রকারের মধ্যে গুণগত পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। কিন্তু বাংলা ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের দ্বিমাত্রিক অক্ষরের মধ্যে এমন কি কোন গুণ আছে, যাহার জন্য ইহাদের একমাত্রিক অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় বলিয়া মনে হইবে—অর্থাৎ ইহাদের উচ্চারণের জন্য কি বাগ্‌যন্ত্রের স্পষ্ট অতিরিক্ত প্রয়াস করিতে হয়?

পূর্ব্বেই (২ক পরিচ্ছেদে) বলিয়াছি যে, বাংলা উচ্চারণে স্বরের সেরূপ প্রাধান্য নাই, বাংলায় স্বর অন্যান্য বর্ণকে ছাপাইয়া রাখে না। অনেক সময় এত লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে তাহাকে বাদ দেওয়া যায়। উপরের পদ্যাংশে 'অরুণ' শব্দটিকে দুই অক্ষরের বলিয়া দেখান হইয়াছে, কিন্তু যদি তাহাকে তিন অক্ষরের বলিয়া কেহ দেখান অর্থাৎ অ রু ণ এই ভাবে পড়েন, তাহা হইলে ছন্দের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না এবং পরিবর্ত্তন কানেও বিশেষ ধরা পড়িবে না। কিন্তু সংস্কৃত বা ইংরাজীতে এরূপ করিতে গেলে ছন্দঃপতন হইত। বাংলা উচ্চারণে—বিশেষ করিয়া ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের আবৃত্তির সময়—স্বরের খুব লঘুভাবে উচ্চারণ হয়, সুতরাং যথার্থ দীর্ঘ ও হ্রস্ব স্বরের পার্থক্য ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে নাই; কারণ, প্রতি স্বরই অতি লঘু। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে যৌগিক-স্বরান্ত এবং হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া যখন ধরা হয়, তখন সেই অক্ষরগুলি কি দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট নহে? যদিও অনেকেই বলেন যে, ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে বাংলায় হলন্ত ও যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট, তত্রাচ আমার মনে হয় যে, এ বিষয়ে সংস্কৃত ও বাংলা উচ্চারণে পার্থক্য আছে। ২গ পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, বাংলার রীতি—প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটবর্ত্তী শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা। 'অরুণ্ কিরণে' বা 'শাখার্ শিখরে' প্রভৃতিকে আমরা 'অরুণ্‌কিরণে' বা 'শাখার্শিখরে' এই ভাবে পড়ি না।

সংস্কৃতে এই ভাবে পড়িতে হইত। ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত যত দূর সম্ভব, আমরা এড়াইয়া চলিতে চাই। ইহার কারণ হয়তো বাঙালীর ধাতুগত আরাম-প্রিয়তা। যাহা হউক, প্রত্যেক শব্দকে পরবর্ত্তী শব্দ হইতে অযুক্ত রাখার জন্য হলন্ত শব্দের পরে আমরা একটুখানি বিরাম লইয়া পরবর্ত্তী শব্দ আরম্ভ করি। সেই বিরামের কাল লঘু-উচ্চারিত একটি স্বরের সমান ধরা যাইতে পারে। তা' ছাড়া, বাংলায় প্রত্যেক শব্দের প্রথমে যে ঈষৎ একটা স্বরাঘাত পড়ে, তাহার জন্য বাগ্‌যন্ত্রকে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত, বোধ হয়, একটু সময় দিতে হয়, নহিলে আমরা পারিয়া উঠি না। এই জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই পদান্তের হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক হইয়া থাকে। যাহা হউক, বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতিতে 'অরুণ কিরণে' এই শব্দগুচ্ছকে 'অরুন্‌কিরণে=অ+রু+উন্‌+কি+র+ণে' এই ভাবে পড়া হয় না, পড়া হয় 'অ+রুন্‌+( )+কি+র+ণে'। এই জন্য বন্ধনী-নির্দ্দিষ্ট ফাঁকের স্থানে 'অ' স্বরটি বসাইয়া দিলে ছন্দের বা ধ্বনিপ্রবাহের কোন পরিবর্ত্তন হয় না।—এই তো গেল পদান্তের হলন্ত অক্ষরের কথা। কিন্তু আধুনিক মাত্রিক ছন্দে পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরও দ্বিমাত্রিক বলিয়া ধরা হয় কেন? বলা বাহুল্য, বাংলার চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না; এবং আমাদের সাধারণ কথোপকথনের উচ্চারণ-পদ্ধতি বা গদ্যের উচ্চারণ-রীতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যতীত পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে)। চলিত ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে একটু উচ্চারণের কৃত্রিমতা আছে, ইহার ধ্বনিপ্রবাহ বা ধ্বনিতরঙ্গ সাধারণ কথোপকথন বা গদ্যের অনুযায়ী নহে। ইহাতে বর্ণসংঘাত-বিমুখতা একেবারে চরমে আসিয়া উঠিয়াছে, বাগ্‌যন্ত্রের আরামপ্রিয়তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হইয়াছে। এখানে যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগ্‌যন্ত্রকে একটু বিরাম দেওয়া হয়। পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরের উচ্চারণের পরও একটুখানি সময় পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনের ঝঙ্কার বা রেশ থাকিয়া যায়, এবং তাহাতে আর একটি মাত্রা পূরণ হয়। 'সন্ধ্যে বেলায়', 'উদ্ধত যত' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছকে 'সন্‌+(ন্‌)+ধ্যে+বে+লায়্‌+( )' এবং 'উদ্‌+(দ্‌)+ধ+ত+য+ত' এই ভাবে পড়া হয়। যৌগিক স্বরের বেলাতেও তাহা করা হয়, যেমন 'অতি ভৈরব'কে উচ্চারণ করা হয় 'অ+তি+ভৈ+(ই)+র+ব' এই ভাবে।

সুতরাং বাংলা মাত্রিক ছন্দেও সংস্কৃতানুরূপ যথার্থ হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার নাই, যদিও একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার আছে। সুতরাং সংস্কৃতে যেরূপ ছন্দঃস্পন্দন হয়, বাংলায় সেরূপ হয় না। কবি সত্যেন্দ্র দত্তও সেই কথা বুঝিয়া বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত বা হিন্দী বা মারাঠি বা গুজরাটিতে 'দীর্ঘস্বরের দরাজ আওয়াজ বায়ুমণ্ডলে জোয়ার ভাটার যে কুহক সৃষ্টি করে, তা হয়তো বাংলায় সম্ভব হবে না'। মধ্যে মধ্যে একটু বিরাম বা ধ্বনির ঝঙ্কারের জন্য যেটুকু সৌন্দর্য্য হইতে পারে, তাহাই মাত্রিক ছন্দে সম্ভব। কিন্তু সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার ছন্দঃস্পন্দন বাংলায় ঠিক অনুকরণ করা যায় না।

বাংলা স্বরমাত্রিক ছন্দে অবশ্য স্বরের প্রাধান্য অধিক, এবং সেখানে অক্ষর-বিশেষের উপর সুস্পষ্ট স্বরাঘাত পড়ে; সুতরাং সেখানে গুণগত সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুসারে দুই জাতীয় অক্ষরের অস্তিত্ব বেশ বুঝা যায়। কিন্তু বাংলায় স্বরমাত্রিক ছন্দে বৈচিত্র্য একেবারে কম। মাত্র এক ধরণের স্বরমাত্রিক ছন্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়। প্রতি পর্ব্বে চার অক্ষর ও চার মাত্রা, দুই মাত্রার দুইটি পর্ব্বাঙ্গ, এবং প্রথম পর্ব্বাঙ্গে স্বরাঘাত—স্বরমাত্রিক ছন্দের পর্ব্ব-মাত্রেরই মোটামুটি এই লক্ষণ। সুতরাং স্পন্দন-বৈচিত্র্য এ ধরণের ছন্দে দেখান যায় না।

বাংলায় চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে যেখানে যুক্তাক্ষরের সুকৌশলে প্রয়োগ হইয়াছে, সেখানে বরং কতকটা সংস্কৃতের বৃত্ত-ছন্দের অনুরূপ একটা মন্থর, গভীর, উদাত্ত ভাব আসে। এ বিষয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তই বাংলায় সব চেয়ে বড় কৃতী। 'সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে', 'কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে" প্রভৃতি পংক্তিতে এইরূপ একটা ভাব আসে। এ ছন্দে পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না, এবং তাহার পরে কোনরূপ বিরাম বা ঝঙ্কারের অবসর থাকে না। সুতরাং এখানে ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত আছে। সুতরাং সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহার-কৌশলে একটা ধ্বনির তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। অবশ্য এখানেও তরঙ্গের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ; মাঝে মাঝে একটু বিরাম দিতে হয়, তাহাতে ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত আর থাকে না। তা' ছাড়া বর্ণমাত্রিক ছন্দে এক প্রকারের দীর্ঘ টান আছে; সুতরাং এই ছন্দে স্বরের উচ্চারণ তত লঘু না করিলেও চলে এবং ইচ্ছা করিলে স্বরের উপরই জোর দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইখানেই হলন্ত অক্ষরের অন্তর্গত স্বরবর্ণ যথার্থ দীর্ঘ হইতে পারে, যদিও তজ্জন্য হলন্ত

অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া গণ্য হয় না। সুতরাং এই রকমের ছন্দে বরং কতকটা সংস্কৃত বৃত্ত-ছন্দের প্রতিধ্বনি আনা যাইতে পারে ; কারণ, এখানে দুই প্রকারের অক্ষরের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের দুই প্রকারের প্রয়াস আবশ্যক হয়।

কিন্তু সাধারণতঃ বাংলায় যে স্পন্দন-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে, তাহা অক্ষর-গত নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অক্ষরের সমাবেশ হইতে এই বৈচিত্র্য হয় না, ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার শব্দ ও শব্দসমষ্টির সমাবেশ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। বাংলা ছন্দে যতিপতন এবং তজ্জনিত ছন্দোবিভাগের দরুন ঐক্যসূত্র পাওয়া যায় ; কিন্তু বৈচিত্র্য আনা যায়—ছেদের অবস্থান এবং তজ্জনিত শ্বাসবিভাগ বা অর্থ-বিভাগের পারম্পর্য্য হইতে। অমিতাক্ষর ছন্দে এই ভাবেই বৈচিত্র্য আনা হইয়া থাকে। তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে বৈচিত্র্য আনা হয় আর এক ভাবে। সেখানে যতি ও ছেদ প্রায় এক সঙ্গেই পড়িয়া থাকে, কিন্তু পর্ব্বের মাত্রা এবং প্রতি চরণে পর্ব্ব-সংখ্যা খুব বাঁধা-ধরা নয়, আবেগের তীব্রতা অনুসারে বাড়ে বা কমে। অবশ্য এইভাবে বাড়ার বা কমারও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা আছে। তা' ছাড়া, মাঝে মাঝে অতিরিক্ত পদ ব্যবহারের দ্বারাও কিছু বৈচিত্র্য আসে। রবীন্দ্রনাথ ইহার উপরে আবার চরণের মধ্যেই মাঝে মাঝে ছেদ বসাইয়া এবং অন্ত্যানুপ্রাসের বৈচিত্র্য ঘটাইয়া আরও একটু বৈচিত্র্য বাড়াইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গগুলি সাজাইবার কায়দা হইতেও একটু বৈচিত্র্য আসিতে পারে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত ক্ষীণ ; কারণ, ছন্দঃপতন না হইলে অত ছোট ছোট ছন্দ-বিভাগের মাত্রা আমাদের শ্রবণকে বিশেষ আকৃষ্ট করিতে পারে না।

বাংলায় প্রতিসম ছন্দাংশগুলি সাধারণতঃ অবিকল এক ছাঁচের হয় না, কেবলমাত্র তাহাদের মোট মাত্রা সমান থাকে। বাংলা উচ্চারণে সাধারণতঃ খোঁচ-খাঁচ অত্যন্ত কম, সুতরাং কোন একটা বিশেষ ছাঁচে পর্ব্বাঙ্গ বা পর্ব্ব গঠন করিলে, তাহা তেমন চিত্তাকর্ষক হয় না ; এবং বরাবর সেই ছাঁচে লেখার মত শব্দও পাওয়া যায় না। এই জন্য বাংলা ছন্দে ছাঁচের কারিগরি দেখাইবার সুযোগ কম, এবং এ জন্য কবিরা বিশেষ চেষ্টাও করেন নাই। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মাঝে মাঝে একটা বিশেষ ছাঁচের পর্ব্ব অবলম্বন করিয়া কবিতা লেখার চেষ্টা করিতেন। এ দিক্ দিয়া তাঁহার ছন্দহিন্দোল' প্রভৃতি কবিতা উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু তিনিও এই কবিতার দুই এক জায়গায় ছাঁচ বজায় রাখিতে

পারেন নাই, এবং মাত্রাসমকত্ব হিসাব করিয়াই তাঁহাকে ছন্দ-বিভাগগুলি মিলাইতে হইয়াছিল। চল্‌তি ভাষায় অবশ্য ঘন ঘন স্বরাঘাত স্পষ্ট পড়ে এবং হলন্ত অক্ষরের বহুল ব্যবহারের জন্য ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত প্রায়ই ঘটে, এবং সে জন্য অবশ্য স্বরাঘাতযুক্ত ও স্বরাঘাতহীন এবং স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষরের বিন্যাসের দ্বারা বিশেষ রকমের ছাঁচ গড়িয়া ওঠে ও অনেক দূর পর্য্যন্ত সেই ছাঁচ বজায় রাখাও সম্ভব। কিন্তু আবার স্বরাঘাতযুক্ত ছন্দে মাত্র এক ছাঁচের পর্ব্বই বাংলায় চলে। এক ছাঁচে ঢালা কবিতাতেও কিন্তু ছন্দ-বিভাগগুলির মাত্রা-সমষ্টিই আমাদের ছন্দোবোধের পক্ষে প্রধান। ছাঁচ বদ্‌লাইয়া দিলেও মাত্রা সমান থাকিলে বাংলা ছন্দের পক্ষে কিছুমাত্র হানিকর হয় না; এমন কি, পরিবর্ত্তনটাই অনেক সময় কানে ধরা পড়ে না।

মস্‌গুল্ : বুল্‌বুল্ | বন্‌ফুল্ : গন্ধে
বিল্‌কুল্ : অলিকুল্ | গুঞ্জরে : ছন্দে।

এই দুইটি পংক্তিতে পর্ব্বের ছাঁচ বরাবর একরকম নাই, দ্বিতীয় পংক্তিতে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তত্রাচ পড়িবার সময় ছাঁচের পরিবর্ত্তনটা বিশেষ লক্ষ্যীভূত হয় না, পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের সংখ্যা ও মাত্রা সমান আছে বলিয়া বরাবর ছন্দের ঐক্যই বোধ হয়, বৈচিত্র্যের আভাস আসে না।

মানুষের অবয়বে প্রতিসম অঙ্গগুলি যেমন ঠিক এক মাপের হয় না, তেমনি ছন্দের প্রতিসম অংশগুলি মাত্রায় সর্ব্বদা ঠিক্ সমান হয় না। সময়ে সময়ে পূর্ণচ্ছেদের (major breath pause-এর) ঠিক্ পূর্ব্বের বিভাগটি একটু মাত্রায় ছোট হয়, এবং তদ্দ্বারাই পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান পূর্ব্ব হইতেই বুঝা যায়।

এইখানে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্যের কথা একটু বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাংলা ছন্দের উপকরণ—পর্ব্ব, এবং এক এক বারের ঝোঁকে বাক্যের যতটা উচ্চারণ করা হয়, তাহাকেই বলা হয় পর্ব্ব। কিন্তু পর্ব্ববিভাগ বাঙালীর কথন-নীতির একটি লক্ষণ, এবং গদ্যেও এইরূপ পর্ব্ববিভাগ আছে। প্রায়শঃ গদ্যের পর্ব্বগুলিও সমান হইয়া থাকে, কিন্তু গদ্যের পর্ব্বগুলির পারম্পর্য্যের মধ্যে কোন নক্সা বা ছাঁচ দেখা যায় না। নিম্নের উদাহরণ হইতে সাধারণ গদ্যের লক্ষণ বুঝা যাইবে (বন্ধনীভুক্ত সংখ্যার দ্বারা পর্ব্বের মাত্রানির্দ্দেশ করা হইয়াছে)।

হুকড়ি। কি চাই? (৩)।

কাঙালী। আজ্ঞে,(৩)। মশায় হচ্ছেন (৬) | দেশহিতৈষী (৬)।

হুকড়ি। তা' ত (৩)। সকলেই জানে (৬)। কিন্তু (২) | আসল ব্যাপারটা

(৬) | কি? (২)।

কাঙালী। আপান সাধারণের (৮) | হিতের জন্য (৬) | প্রাণপণ—

হুকড়ি। —ক'রে (৬) |

ওকালতি ব্যবসা (৬)। চালাচ্ছি। তাও (৬) |

কারো অবিদিত নেই (৮)।

(হাস্যকৌতুক, রবীন্দ্রনাথ)

দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ বাংলা কথোপকথনের ভাষাতেও বিশেষ এক প্রকারের অর্থাৎ ছয় মাত্রার পর্ব্ব বহুল ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ এইটি বুঝিয়াই তাঁহার কবিতায় ছয়মাত্রার পর্ব্ব খুব বেশী ব্যবহার করিয়াছেন।

ছন্দোলক্ষণাত্মক গদ্যে অনেক সময় সমমাত্রার বা কোন বিশেষ আদর্শানুযায়ী পরিমিত মাত্রার পর্ব্বের সমাবেশ দেখা যায়। নিম্নের উদাহরণে আট মাত্রার পর্ব্বের পারম্পর্য্য পাওয়া যায়।—

তখন | রমণীয় চিত্রকূটে (৮) | অর্ক ও কেতকী পুষ্প (৮) | ফুটিয়া উঠিয়াছিল (৮), | আম্র ও লোধ্র ফল (৮) | পক্ক হইয়া (৬) | শাখাগ্রে দুলিতেছিল (৮) |

(রামায়ণী কথা, দীনেশচন্দ্র সেন)

তবে পদ্যে ও ছন্দোলক্ষণাত্মক গদ্যে তফাৎ কি? গদ্যে পর্ব্ববিভাগ থাকিলেও, বিভাগের সূত্র ঝোঁকের বা ধ্বনির দিক্ দিয়া নহে—সেখানে অর্থের দিক্ দিয়া, প্রত্যেক পর্ব্ব একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগ (Sense Group)। ছন্দঃ সেখানে সম্পূর্ণরূপে অর্থবাচক বিভাগের অধীন। পদ্যে কিন্তু প্রত্যেকটি বিভাগের অর্থ অপেক্ষা ধ্বনিরই প্রাধান্য অধিক, যদিও অনেক সময়ই পদ্যের এক একটি বিভাগ এক একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগের সহিত অভিন্ন। তত্রাচ পদ্যের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস, স্বরাঘাত ইত্যাদির অবস্থান হইতে পদ্যে যে, ধ্বনি অনুসারেই এক একটি বিভাগ হইয়া থাকে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু গদ্য ও পদ্যের বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট প্রতীত হয় যতির অবস্থান হইতে। পদ্যে প্রতি চরণের শেষে যতি থাকিবে, পূর্ণযতি কিম্বা ছেদ না থাকিলেও অন্ততঃ অর্দ্ধযতি থাকিবে।

যতির অবস্থান পদ্যে বিশেষ কোন নক্সা বা আদর্শ অনুসারে নিয়মিত হইয়া থাকে। গদ্যে কিন্তু যতির অবস্থান কোন নিয়ম বা নক্সা অনুযায়ী হয় না; বাক্য বা বাক্যাংশের শেষে অর্থবোধের পূর্ণতা অনুযায়ী ছেদ পড়ে। পদ্যে চার পাঁচটি পর্ব্বের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়া দরকার। গদ্যে আট, দশ বা আরও বেশী সংখ্যক পর্ব্বের পরে পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে। *

মাত্রা

এইবার মাত্রার কথা কিছু বলা আবশ্যক। গানে কবিতায়, উভয়ত্রই মাত্রা অর্থে কাল পরিমাণ বুঝায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাংলা কাব্যে যদিও অক্ষরের মধ্যে মাত্রাভেদ দেখা যায়, তথাপি সে ভেদের দরুণ অক্ষরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিভেদ কল্পনা করা যায় না। সেই জন্য গ্রীক্ iamb, trochee, spondee প্রভৃতি foot, এবং সংস্কৃতে 'য' 'ম' 'ত' 'র' প্রভৃতি গণ, বিভিন্ন গুণের অক্ষরের বিশেষ সমাবেশ বলিয়া—বিশিষ্ট স্পন্দন-ধর্ম্ম যুক্ত; বাংলায় পর্ব্ব বা পর্ব্বাঙ্গ সে রকম কিছু নয়।

ছন্দঃশাস্ত্রে মাত্রা বা কালপরিমাণের আসল তাৎপর্য্য কি, বুঝা দরকার। ছন্দঃ-শাস্ত্রের কাল পদার্থবিদ্যার কাল নহে, অর্থাৎ বিষয়ি-নিরপেক্ষ (objective) নহে, কালমানযন্ত্রে ইহা ঠিক ধরা পড়ে না। পর্ব্বের মাত্রা বা কাল-পরিমাণ বলিতে পর্ব্বের প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ হইতে শেষ অক্ষরের উচ্চারণ পর্য্যন্ত যে নিরপেক্ষ কাল অতিবাহিত হয়, তাহাকে নির্দ্দেশ করা হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে, পর্ব্বের মধ্যে বিরামস্থান, এমন কি—পূর্ণচ্ছেদের ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু মাত্রার হিসাবের সময় বিরাম বা ছেদের কাল যে কোন অক্ষরের উচ্চারণের কাল হইতে দীর্ঘ হইলেও উপেক্ষিত হয়। যেমন—

মৃগেন্দ্র কেশরী, ॥
(ক) কবে, * হে বীর কেশরী | সম্ভাষে শৃগালে ॥
(খ) মিত্র ভাবে? * * অজ্ঞ দাস | বিজ্ঞতম তুমি, ॥
(গ) অবিদিত নহে কিছু | তোমার চরণে। ॥

---

* মৎপ্রণীত Studies in the rhythm of Bengali prose and prose-verse (Journal of the Department of Letters, Cal. Univ. Vol. XXXII) দ্রষ্টব্য।

এই কয়টি পংক্তিতে ছন্দের নিয়মে ক=খ=গ, অথচ কয়টি পর্ব্বের মধ্যে একটিতে কোনরূপ ছেদ নাই, একটিতে উপচ্ছেদ, অপরটিতে পূর্ণচ্ছেদ রহিয়াছে। যদি মাত্র নিরপেক্ষ কাল-পরিমাণের উপর মাত্রা-বিচার নির্ভর করিত, তবে এরূপ হইত না।

ছন্দের কাল বাহ্য জগতের নিরপেক্ষ কাল নহে। অক্ষরের উচ্চারণের নিমিত্ত বাগ্‌যন্ত্রের প্রয়াসের উপর ইহা নির্ভর করে। এই প্রয়াসের পরিমাণ অনুসারে অক্ষরের মাত্রাবোধ জন্মে। পর্ব্বের অন্তর্গত অক্ষরের মাত্রা-সমষ্টির উপরই পর্ব্বের মাত্রা-পরিমাণ নির্ভর করে। সুতরাং ছেদ বা বিরাম পর্ব্বের মধ্যে থাকিলে তাহাতে মাত্রাসংখ্যার ইতর-বিশেষ হয় না। মাত্রার ভিত্তি হইতেছে—বাগ্‌যন্ত্রের প্রয়াস, মাত্রার আদর্শ চিত্তের অনুভূতিতে। বিশেষ বিশেষ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য প্রয়াসের কাল অনুসারে চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার উপলব্ধি হয়,—কোনটি হ্রস্ব, কোনটি দীর্ঘ, কোনটি প্লুত বলিয়া জ্ঞান হয়। কিন্তু এইরূপ মাত্রার কাল, মোটামুটি উচ্চারণ-প্রয়াসের জন্য আবশ্যক নিরপেক্ষ কালের অনুযায়ী হইলেও, ঠিক তাহার অনুপাতের উপর নির্ভর করে না। যদি উচ্চারণের নিরপেক্ষ কাল হিসাব করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর সমান নহে, এবং হ্রস্ব বা একমাত্রিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর সমান নহে; কিম্বা যে কোন দীর্ঘ অক্ষর যে কোন হ্রস্ব অক্ষরের দ্বিগুণ নহে। মাত্রাবোধের জন্য ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতি, ছন্দের রীতি ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি থাকা দরকার। কোন বিশেষ স্থলে একটি অক্ষরের অবস্থান, শব্দের অর্থগৌরব ইত্যাদিতেও ছন্দোরসিকের মাত্রাজ্ঞান জন্মে।

শুধু বাংলা নহে, সমস্ত ভাষাতেই ছন্দে অক্ষরের মাত্রার এই তাৎপর্য্য। এই উপলক্ষে ইংরেজী ছন্দের long ও short সম্বন্ধে Professor Saintsbury-র মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। "They (long and short) represent two values which, though no doubt by no means always identical in themselves, are invariably, unmistakably, and at once, distinguished by the ear,—it is partly, and in English rather largely, created by the poet, but that this creation is conditioned by certain conventions of the language, of which accent is one, but only one."

যাহা হউক, বাংলাতেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অক্ষরের মাত্রা পূর্ব্বনির্দিষ্ট হয় না। ইংরেজীতে যেমন বেশীর ভাগ অক্ষর Common Syllable অর্থাৎ অবস্থা অনুসারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইতে পারে, বাংলাতেও তদ্রূপ। বাংলাতেও অনেক অক্ষরকেই ইচ্ছামত হ্রস্ব বা দীর্ঘ করা যাইতে পারে। বাংলা উচ্চারণে যে এইরূপ হইয়া থাকে, তাহার উদাহরণ পূর্ব্বেই দিয়াছি। স্বেচ্ছায় অক্ষরের হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণের রীতি বাংলা ছন্দের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার ছন্দের তুলনায় বাংলা ছন্দের এই একটি প্রধান সুবিধা কিংবা এই একটি প্রধান দুর্ব্বলতা—উভয়ই বলা যাইতে পারে।

অধিকন্তু বাংলায় মাত্রা আপেক্ষিক; অর্থাৎ সন্নিহিত অন্যান্য অক্ষরের তুলনাতেই কোন অক্ষরকে দীর্ঘ বলা হয়, নিরপেক্ষ মিনিট সেকেণ্ড হিসাবে নহে। উচ্চারণে সেই সময় লাগিলেও অন্যত্র সেই অক্ষরই সন্নিহিত অক্ষরের তুলনায় হ্রস্ব বলা যাইতে পারে। যেমন,

'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব | বিবিধ রতন'

এই পংক্তিতে 'বঙ্' একটি হ্রস্ব অক্ষর, আবার

'জননি বঙ্গ | ভাষা এ জীবনে | চাহিনা অর্থ | চাহিনা মান'

এই পংক্তিতে 'বঙ্' একটি দীর্ঘ অক্ষর। এই জায়গাতে ঠিক 'বঙ্' অক্ষরটির উচ্চারণে যে কালের বেশী তারতম্য হয়, তাহা নহে। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে সমস্ত চরণটি একটু সুর করিয়া বা টানিয়া পড়া হয় এবং সুতরাং প্রত্যেকটি অক্ষরকেই প্রায় সমান করিয়া তোলা হয়। সুতরাং পরস্পরের সহিত সমান বলিয়া প্রত্যেক অক্ষরটিকেই হ্রস্ব বলা যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খুব লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় বলিয়া হলন্ত 'বঙ্' অক্ষরটির উচ্চারণের কাল অপেক্ষা নিকটের অন্য অক্ষরের উচ্চারণের কাল কম বলিয়া স্পষ্ট অনুভূত হয়; সুতরাং এখানে 'বঙ্' অক্ষরটিকে দীর্ঘ বলা হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সাধারণ উচ্চারণে বিভিন্ন অক্ষরের মাত্রার বহু বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। একই অক্ষরেরও উচ্চারণে একই মাত্রা সব সময় বজায় রাখা যায় না, কিছু কিছু ইতর-বিশেষ সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। ধ্বনিবিজ্ঞানে সাধারণতঃ হ্রস্ব, নাতিদীর্ঘ, দীর্ঘ—অক্ষরের এই তিন শ্রেণী করা হইয়া থাকে। ছন্দঃশাস্ত্রে কিন্তু একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক—এই দুই শ্রেণীরই অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, যদিও উচ্চারণের জন্য এক মাত্রা ও দুই মাত্রার মধ্যবর্ত্তী

যে কোন ভগ্নাংশ-পরিমিত কালের আবশ্যক হইতে পারে। কারণ, আসলে ছন্দের মাত্রা নির্ণয় হয় চিত্তের অনুভূতিতে, বৈজ্ঞানিকের কালমান-যন্ত্রে নহে।

বাংলা ছন্দে কদাচ কোন অক্ষরকে ছন্দের খাতিরে ত্রিমাত্রিক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে।

এই স্থলে কাব্যছন্দের মাত্রা ও সঙ্গীতের মাত্রার মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করা উচিত। সঙ্গীতের মাত্রার একটি নির্দ্দিষ্ট নিরপেক্ষ কালপরিমাণ আছে; ঘড়ির দোলকের একদিক্ হইতে আর এক দিকে গতির কাল অথবা এইরূপ অন্য কোন নিরপেক্ষ কালাঙ্ক ইহার আদর্শ। সঙ্গীতে তাল-বিভাগের কালপরিমাণ ঠিক ঠিক বজায় রাখার জন্য উচ্চারণের ইতর-বিশেষ করা হইয়া থাকে। কাব্যছন্দে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় মাত্রার কালাঙ্ক বিভিন্ন হইয়া থাকে; এমন কি, এক কবিতারই ভিন্ন ভিন্ন চরণে লয়ের পরিবর্ত্তন ও মাত্রার কালাঙ্কের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। লয়ের পরিবর্ত্তন দ্বারাই কবিতাতে অনেক সময়ে আবেগের হ্রাসবৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন বুঝা যায়। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতার যথাযথ আবৃত্তি শুনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, কি সুকৌশলে লয়ের পরিবর্ত্তনের দ্বারা আসন্ন ঝটিকার ভয়ালতা, বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ঝঞ্ঝার মত্ততা, বায়ুবেগের হ্রাসবৃদ্ধি, এবং ঝটিকার অন্তে স্নিগ্ধ শান্তি,—এই সব রকমের ভাব প্রকাশ করা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কাব্যছন্দে যত দূর সম্ভব, সাধারণ উচ্চারণের মাত্রা বজায় রাখিতে হয়; সঙ্গীতে যেমন যে কোন অক্ষরকে সিকি মাত্রা পর্য্যন্ত হ্রস্ব এবং চার মাত্রা পর্য্যন্ত দীর্ঘ করা যায়, কবিতায় ততটা করা চলে না।

অবশ্য ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত ভারতীয়, তথা বাংলা কাব্য-ছন্দের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ভারতীয় কাব্য ও সঙ্গীতের পদ্ধতি মূলতঃ একই, প্রাচীন সঙ্গীত ও প্রাচীন কবিতার মধ্যে সৌসাদৃশ্য এত বেশী যে, তাহাদের ভিন্ন করিয়া চেনাই কঠিন। বাংলা কবিতায় প্রচলিত ছন্দগুলি যে সঙ্গীতের তালবিভাগ হইতে উৎপন্ন, তাহাও বেশ বুঝা যায়। পরে কিন্তু সঙ্গীত ও কাব্য-ছন্দ ক্রমেই পৃথক্ পৃথক্ পথ অবলম্বন করিয়াছে। সঙ্গীতে সুরের সন্নিবেশের দিক্ দিয়া নানা বৈচিত্র্য আসিয়াছে, কিন্তু তাল-বিভাগের পদ্ধতি বরাবর প্রায় একরূপ আছে। বাংলায় কিন্তু পর্ব্ববিভাগের মধ্যে ক্রমেই বৈচিত্র্য আসিতেছে; বিশেষতঃ blank verse বা অমিতাক্ষর ছন্দে ও তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে নানাভাবে বৈচিত্র্যকেই মূল ভিত্তি করিয়া ছন্দঃ গঠনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

মাত্রাপদ্ধতি

এক হিসাবে বাংলা ছন্দের প্রকৃতি—সংস্কৃত, আরবী, ইংরেজী ছন্দের প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন। অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলায় ছন্দঃ একটা বাঁধা উচ্চারণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় না। বরং এক একটি বিশেষ ছন্দোবন্ধ অনুসারেই বাংলা কাব্যে অনেক সময় উচ্চারণ স্থির হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতির পরিবর্ত্তনশীলতার জন্যই এরূপ হওয়া সম্ভব। অবশ্য বাংলা কবিতার যে কোন চরণে যে কোন ছন্দঃ চাপাইয়া দেওয়া যায় না; কারণ, যতদূর সম্ভব, সাধারণ কথোপকথনের উচ্চারণ কবিতায় বজায় রাখা দরকার। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছন্দোবন্ধ অনুসারেই কবিতায় শব্দের ও অক্ষরের মাত্রা ইত্যাদি স্থির হইয়া থাকে।

(বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে শব্দের যেটুকু উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম syllable বা অক্ষর। অক্ষরই উচ্চারণের মূল উপাদান। প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বরবর্ণ থাকে। অক্ষরের অন্তর্গত স্বরের পূর্ব্বে ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিতে পারে বা না-ও থাকিতে পারে। সূক্ষ্মভাবে বলিতে গেলে, এক একটি অক্ষর syllabic ও non-syllabic-এর সমষ্টি মাত্র। সাধারণতঃ স্বরবর্ণ ই syllabic এবং ব্যঞ্জনবর্ণ non-syllabic হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা ধ্বনিবিজ্ঞানের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, সময়ে সময়ে ব্যঞ্জনবর্ণও syllabic এবং স্বরবর্ণও non-syllabic হইয়া থাকে।)

ছন্দের দিক্ হইতে নিম্নলিখিত ভাবে বাংলা অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে,—

বলা বাহুল্য যে, ছন্দোবিচারের সময়, syllable বা অক্ষর, vowel বা স্বর, consonant বা ব্যঞ্জন, diphthong বা যৌগিক স্বর ইত্যাদি ভাষাতত্ত্বের

ব্যবহৃত অর্থে বুঝিতে হইবে। লিখনপদ্ধতির বা লৌকিক ব্যবহারের চল্‌তি অর্থে বুঝিলে প্রমাদগ্রস্ত হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও বাংলা বর্ণমালায় মাত্র 'ঐ' এবং 'ঔ' এই দুইটি যৌগিক স্বর দেখান হয়, তত্রাচ বাংলায় বাস্তবিক পক্ষে বহু যৌগিক স্বরের ব্যবহার আছে। 'খাই', 'দাও' প্রভৃতি শব্দ বাস্তবিক একাক্ষর ও যৌগিক-স্বরান্ত। তেমনি মনে রাখিতে হইবে যে, বাংলায় মৌলিক স্বর মাত্রেই সাধারণতঃ হ্রস্ব ; 'ঈ,' 'উ,' 'আ,' 'ও,' প্রভৃতির হ্রস্ব উচ্চারণই হইয়া থাকে।

গঠনের দিক্ দিয়া অক্ষরের মধ্যে স্বরই প্রধান। স্বরের পূর্ব্বে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে তদ্দ্বারা স্বরের একটি বিশিষ্ট আকার দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু অক্ষরের মধ্যে যদি স্বরের পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, তবে অক্ষরের দৈর্ঘ্য কিছু বাড়িয়া যায়। প্রায় সকল ভাষাতেই সাধারণতঃ স্বরের দৈর্ঘ্য অনুসারে মাত্রা-নিরূপণ হইয়া থাকে।

নিত্য-দীর্ঘ মৌলিক স্বরবর্ণ বাংলায় নাই। সুতরাং মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর মাত্রই সাধারণতঃ হ্রস্ব বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু হলন্ত অক্ষর ও যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। একই লয়ে একটি যৌগিক-স্বরান্ত ও একটি হলন্ত অক্ষর পড়িলে দেখা যাইবে যে, হলন্ত অক্ষরের উচ্চারণে কিছু সময় বেশী লাগে। কিন্তু কিছু দ্রুতলয়ে হলন্ত অক্ষর পড়িলে মধ্য লয়ের স্বরান্ত অক্ষরের সমান হইতে পারে। ইহাকেই বলে হ্রস্বীকরণ ; বাংলা ছন্দের ইহা একটি বিশেষ গুণ। বাঙালীর বাগ্‌যন্ত্র নমনীয় বলিয়া যে কোন সময়েই হ্রস্বীকরণ চলিতে পারে। যেমন হ্রস্বীকরণ, তেমনি হলন্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণও বাংলায় চলে। বিলম্বিত-লয়ে হলন্ত অক্ষর পড়িলে বা হলন্ত অক্ষরের অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণের পরে একটু বিরাম লইলে, হলন্ত অক্ষর মধ্য লয়ের স্বরান্ত অক্ষরের দ্বিগুণ হইতে পারে। কিন্তু যথেচ্ছ হ্রস্বীকরণ বাংলায় চলে না।

যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর সম্বন্ধেও হলন্ত অক্ষরের অনুরূপ বিধি। যৌগিক স্বরের মধ্যে দুইটি স্বরের উপাদান থাকে। তন্মধ্যে প্রথমটি পূর্ণোচ্চারিত ও প্রধান, দ্বিতীয়টি অপ্রধান, non-syllabic, প্রায় ব্যঞ্জনের সমান (consonantal)। অবশ্য যৌগিক স্বরকে ভাঙিয়া দুইটি পৃথক্ স্পষ্টোচ্চারিত স্বরে পরিবর্ত্তন করা চলে, কিন্তু যখন তাহারা দুইটি পৃথক্ অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'যাও' শব্দটি একাক্ষর যৌগিক-স্বরান্ত ; কিন্তু 'যেও' শব্দটি দ্ব্যক্ষর।

'ঘর থেকে বেরিয়ে যাও' এবং 'আমাদের বাড়ী যেও' এই দুইটি বাক্য তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। যাহা হউক, যথার্থ যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ। সুতরাং ইহাকে হয় হ্রস্বীকরণের দ্বারা একমাত্রিক, না-হয় দীর্ঘীকরণের দ্বারা দ্বিমাত্রিক বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহাদেরও যথেচ্ছ হ্রস্বীকরণ বাংলায় চলে না। প্রতি পর্ব্বাঙ্গে অন্ততঃ একটি লঘু (স্বরান্ত হ্রস্ব বা হলন্ত দীর্ঘ) অক্ষর রাখিতে হইবে—ইহাই মোটামুটি নিয়ম।

অক্ষরের মাত্রা সম্বন্ধে এই কয়টি রীতি লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে—

[১] বাংলায় মৌলিক-স্বরান্ত সমস্ত অক্ষরই হ্রস্ব বা একমাত্রিক।

[১ক] কিন্তু স্থানবিশেষে হ্রস্ব স্বরও আবশ্যক মত দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক হইতে পারে ; যথা—

(অ) Onomatopoeic বা একাক্ষর অনুকার শব্দ এবং interjectional বা আহ্বান আবেগ ইত্যাদিসূচক শব্দ। যথা—

হী হী শবদে | অটবী পূরিছে (ছায়াময়ী, হেমচন্দ্র)

না—না—না | মানবের তরে (সুখ, কামিনী রায়)

(আ) যে শব্দের অন্ত্য অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার শেষ অক্ষর। যথা—

নাচ' ত : সীতারাম | কাঁকাল : বেঁকিয়ে (গ্রাম্য ছড়া)

(ই) তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কৃত-মতে দীর্ঘ, যথা—

ভীত বদনা | পৃথিবী হেরিছে (ছায়াময়ী, হেমচন্দ্র)

[২] হলন্ত অক্ষর অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরা যাইতে পারে, এবং ইচ্ছা করিলে হ্রস্বও ধরা যাইতে পারে।

[২ক] শব্দের অন্তে হলন্ত অক্ষর থাকিলে তাহাকে দীর্ঘ ধরাই সাধারণ রীতি।

উপরি-লিখিত নিয়মগুলিতে মাত্র একটা সাধারণ প্রথা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ছন্দের আবশ্যক মতই শেষ পর্য্যন্ত অক্ষরের মাত্রা স্থির হয়। বিস্তারিত নিয়ম "বাংলা ছন্দের মূলসূত্র" নামক অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ *

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র ছন্দ 'যৌগিক মুক্তক,' 'পলাতকা'র ছন্দ 'স্বরবৃত্ত মুক্তক' এবং 'সাগরিকা'র ছন্দ 'মাত্রাবৃত্ত মুক্তক'। অর্থাৎ তাঁহারা বলিতে চান যে কেবলমাত্র পর্ব্বের মাত্রা বিচারের দিক্ দিয়াই ঐ তিন ধরণের ছন্দে পার্থক্য আছে, নহিলে ছন্দের আদর্শ হিসাবে তাহারা সকলেই একরূপ, সকলেই free verse বা মুক্তক। 'বলাকা'র ছন্দ free verse আখ্যা পাইতে পারে কি না তাহা পরে আলোচনা করিতেছি। কিন্তু 'বলাকা'য় ছন্দের আদর্শ যে 'পলাতকা' বা 'সাগরিকার' ছন্দের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 'বলাকা' 'পলাতকা' বা 'সাগরিকা' সর্ব্বত্রই অবশ্য পংক্তির দৈর্ঘ্য অনিয়মিত। কিন্তু পংক্তির দৈর্ঘ্য মাপিয়া ত ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় না। পংক্তি (printed line) অনেক সময় কেবল মাত্র অন্ত্যানুপ্রাস (rime) নির্দ্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। 'বলাকা'য় পংক্তি এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে। পংক্তি-কে আশ্রয় করিয়া ছন্দের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে যাওয়া চলে না। অনেক স্থলে অবশ্য পংক্তি চরণের (prosodic line or verse) সহিত এক। কিন্তু সে সব স্থলেও পংক্তির বা চরণের দৈর্ঘ্য মাপিয়া ছন্দের প্রকৃতি বুঝা যায় না। বাংলা ছন্দের উপকরণ —পর্ব্ব (measure বা bar), এবং পর্ব্ব এক একটি impulse-group অর্থাৎ এক এক ঝোঁকে উচ্চারিত শব্দসমষ্টি। পর্ব্বের মাত্রা, গঠনপ্রকৃতি ও পরস্পর সমাবেশের রীতির উপর-ই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। দুইটি চরণের দৈর্ঘ্য এক হইয়া যদি পর্ব্বের মাত্রা ও পর্ব্ব-সমাবেশের রীতি বিভিন্ন হয়, তবে ছন্দও পৃথক্ হইয়া যাইবে।

"মনে পড়ে গৃহকোণে মিটি মিটি আলো"
"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেলো খুলি"—

এই দুইটি চরণের দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু পর্ব্ব বিভিন্ন বলিয়া ছন্দ-ও পৃথক্।

এই সাধারণ কথাগুলি স্মরণ রাখিলে কেহ 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র ছন্দের আদর্শ এক—এইরূপ ভ্রম করিবেন না।

---

* কবি সত্যেন্দ্রনাথ vers libre বা free verseর প্রতিশব্দ হিসাবে "মুক্তবন্ধ" শব্দটি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

'পলাতকা' হইতে কয়েকটি পংক্তি লইয়া তাহার ছন্দোলিপি করা যাক্।

পর্ব্বসংখ্যা

মা কেঁদে কয়, | "মঞ্জুলী মোর | ঐ তো কচি | মেয়ে, = ৪
ওরি সঙ্গে | বিয়ে দেবে ? | বয়সে ওর | চেয়ে = ৪
পাঁচ গুণো সে | বড়ো ;— = ২
তাকে দেখে | বাছা আমার | ভয়েই জড় | সড়। = ৪
এমন বিয়ে | ঘট্‌তে দেবো | না কো।" = ৩
বাপ ব'ল্‌লে, | কান্না তোমার | রাখো ; = ৩
পঞ্চাননকে | পাওয়া গেছে | অনেক দিনের | খোঁজে, = ৪
জানো না কি | মস্ত কুলীন | ও-যে ! = ৩
সমাজে তো | উঠ্‌তে হবে | সেটা কি কেউ | ভাবো ?= ৪
ওকে ছাড়্‌লে | পাত্র কোথায় | পাবো ? = ৩

উপরের উদাহরণ হইতেই 'পলাতকা'র ছন্দের পরিচয় পাওয়া যাইবে। দেখা যাইতেছে যে এখানে মাত্র এক প্রকারের পর্ব্ব অর্থাৎ চার মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রতি জোড়া পংক্তির শেষে মিল আছে। প্রতি পংক্তি-ই এক একটি চরণ, অর্থাৎ প্রত্যেক পংক্তির শেষে পূর্ণ যতি। চরণে পর্ব্বসংখ্যা খুব নিয়মিত নয়,—দুই, তিন, চার পর্ব্বের চরণ দেখা যাইতেছে। বাংলা ছন্দের বহু প্রচলিত রীতি অনুসারে শেষ পর্ব্বটি অপূর্ণ। বাংলায় চার মাত্রার ছন্দে সাধারণতঃ প্রতি চরণে তিনটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ—মোট চারটি পর্ব্ব থাকে। উপরের পংক্তিগুলিতে সেই ছন্দেরই অনুকরণ করা হইয়াছে, তবে মাঝে মাঝে এক একটি চরণে একটি বা দুইটি পর্ব্ব কম আছে। অধিকসংখ্যক পর্ব্বের চরণের সহিত অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক পর্ব্বের চরণের সমাবেশ করিয়া স্তবক রচনার দৃষ্টান্ত বাংলায় যথেষ্ট পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ত এই প্রথা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যেমন—

শুধু অকারণ | পুলকে
নদী-জলে-পড়া | আলোর মতন | ছুটে যা ঝলকে | ঝলকে।
ধরণীর পরে | শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ | করিস্ যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে | শিশির যেমন | শিরীষ ফুলের | অলকে।
মর্ম্মর তানে | ভরে ওঠ্ গানে | শুধু অকারণ | পুলকে॥

(ক্ষণিকা—রবীন্দ্রনাথ)

এই চরণস্তবক-কে অবশ্য কেহই free verse বলিবেন না। কিন্তু এখানে পর্ব্বসমাবেশের যে আদর্শ, 'পলাতকা' হইতে উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতেও মূলতঃ তাই। অবশ্য 'ক্ষণিকা' হইতে উদ্ধৃত কবিতাটিতে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চরণের সমাবেশে স্তবক (stanza) গড়িবার একটি সুদৃঢ় আদর্শ আছে। 'পলাতকা'য় সেরূপ কোন সুদৃঢ় আদর্শ নাই; দেখা যায় যে এক একটি চরণ কখন হ্রস্ব, কখন দীর্ঘ হইতেছে। (কিন্তু পাঁচ পর্ব্বের বেশী দীর্ঘ চরণ নাই, তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক পর্ব্বের চরণ বাংলায় চলে না।) কিন্তু চরণে চরণে মিল রাখিয়া তাহাদের মধ্যে একরূপ সংশ্লেষ রাখা হইয়াছে। মাঝে মাঝে কয়েকটি চরণ-পরম্পরা লইয়া পরিষ্কার স্তবক গঠনের আভাসও যেন আসে; যেমন উদ্ধৃত পংক্তিগুলির শেষ চারিটি চরণ একটি সুপরিচিত আদর্শে গঠিত স্তবক হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, স্তবক গঠনের সুদৃঢ় আদর্শ নাই বলিয়াই কোন কবিতাকে free verse বলা যায় না। কবি Wordsworthর Ode on the Intimations of Immortalityতে ছন্দগঠনের যে আদর্শ, এখানেও সেই আদর্শ।

	Number of feet
There was | a time | when mead | ow, grove, | and stream,	= 5
The earth, | and eve | ry comm | on sight	= 4
To me | did seem	= 2
Appa | relled in | celes | tial light,	= 4
The glo | ry and | the fresh | ness of | a dream.	= 5

এখানে বারবার iambic feet ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রতি lineএ footর সংখ্যা কত তাহা সুনির্দ্দিষ্ট নহে। 'পলাতকা'য় ছন্দের আদর্শ এবং Immortality 'Odeএ' ছন্দের আদর্শ এক। Immortality Odeকে কেহ free versea উদাহরণ বলেন না। বস্তুতঃ যেখানে বরাবর এক প্রকারের উপকরণ লইয়া ছন্দ রচিত হইয়াছে তাহাকে কেহই free verse বলিবেন না। 'পলাতকা'র ছন্দকে free versea উদাহরণ বলা free verse শব্দটির একান্ত অপ-প্রয়োগ।

'সাগরিকা'র ছন্দও অবিকল এইরূপ, তবে সে কবিতাটিতে পাঁচ মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে।

পর্ব্বসংখ্যা

সাগর জলে | সিনান করি' | সজল এলো | চুলে =৪
বসিয়াছিলে | উপল-উপ | কূলে। =৩
শিথিল পীত | বাস =২
মাটির পরে | কুটিল-রেখা | লুটিল চারি | পাশ। =৪
নিরাবরণ | বক্ষে তব, | নিরাভরণ | দেহে =৩
চিকন সোনা- | লিখন উষা | আঁকিয়া দিলো | স্নেহে =৪

এই আদর্শে অন্যান্য কবিরাও কবিতা রচনা করিয়াছেন। নজরুল্ ইস্লামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটিতে ছন্দের এই আদর্শ, তবে সেখানে ছয় মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে।

পর্ব্বসংখ্যা

(বল)—বীর =১
(বল)—উন্নত মম | শির =২
(শির)—নেহারি আমার | নতশির ওই | শিখর হিমা | দ্রির। =৪
(বল)—মহাবিশ্বের | মহাকাশ ফাড়ি =২
চন্দ্র সূর্য্য | গ্রহ তারা ছাড়ি =২
ভূলোক দ্যুলোক | গোলোক ছাড়িয়া =২
খোদার আসন | 'আরশ' ভেদিয়া =২
উঠিয়াছি চির- | বিস্ময় আমি | বিশ্ব-বিধা | তৃর =৪

বন্ধনীভুক্ত শব্দগুলি ছন্দোবন্ধের অতিরিক্ত (hypermetric)

এইরূপে বিশ্লেষণ করিতে পারিলে এই প্রকারের ছন্দের আসল প্রকৃতি ধরা পড়ে; নতুবা এই ছন্দ সাধারণ ছন্দ হইতে পৃথক্ এইরূপ অস্পষ্ট বোধ লইয়া ইহাকে free verse বলিলে প্রমাদ-গ্রস্ত হইতে হয়।

এইবার 'বলাকা'র ছন্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। ইহাকে 'মুক্তক' বলিলে কেবল মাত্র একটা নেতিবাচক (negative) বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়, ইহার পরিচয় প্রদান করা হয় না।

'বলাকা' গ্রন্থটিতে 'নবীন', 'শঙ্খ' প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা সাধারণ চারিমাত্রার ছন্দে এবং সুদৃঢ় আদর্শের স্তবকে রচিত হইয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধে কোনও বিশেষ মন্তব্যের আবশ্যকতা নাই। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি পংক্তির ছন্দোলিপি দিতেছি।

তোমার শঙ্খ | ধুলায় প'ড়ে, | কেমন ক'রে | সইবো ? =৪+৪+৪+২
বাতাস আলো | গেলো ম'রে | এ কী রে দু | দৈব ! =৪+৪+৪+২
লড়্‌বি কে আয় | ধ্বজা বেয়ে =৪+৪
গান আছে যার | ওঠ্‌না গেয়ে =৪+৪
চল্‌বি যারা | চল্‌ রে ধেয়ে, | আয় না রে নিঃ | শঙ্ক. =৪+৪+৪+২
ধুলায় পড়ে | রইলো চেয়ে | ঐ যে অভয় | শঙ্খ। =৪+৪+৪+২

এ রকমের কবিতার মধ্যে কোনরূপ free verseর আভাস নাই।

'বলাকা' গ্রন্থটিতে আর কতকগুলি কবিতায় নূতন এক প্রকারের ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই ছন্দ-কেই সাধারণতঃ 'বলাকার ছন্দ' বলা হয়। পূর্ব্বপ্রচলিত কোন প্রকার ছন্দের সহিত এই ছন্দের সাদৃশ্য দেখা যায় না বলিয়া অনেকে ইহাকে free verse বা vers libre বলিয়া ক্ষান্ত হন। কিন্তু এই ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া এবং এই রকমের কবিতার ছন্দোলিপি করিয়া ইহার যথার্থ প্রকৃতি কেহ ব্যাখ্যা করেন নাই।

'বলাকা'র ছন্দ বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথা প্রথমে স্মরণ রাখা দরকার। 'বলাকা'য় পংক্তি মানেই ছন্দের এক চরণ নহে। চরণ (Prosodic line or verse), মানে, পর্ব্ব অপেক্ষা বৃহত্তর একটি ছন্দোবিভাগ। কয়েকটি পর্ব্বের সংযোগে এরূপ একটা চরণ গঠিত হয়। প্রত্যেক চরণের শেষে পূর্ণযতি থাকে। প্রত্যেকটি চরণ পূর্ণ হওয়া মাত্র পর্ব্ব-সমাবেশের একটি আদর্শের পূর্ণতা ঘটে। সুপ্রচলিত ত্রিপদী ছন্দে এক একটি চরণ ভাঙিয়া সাধারণতঃ দুইটি পংক্তিতে লেখা হয়, তাহাতে পর্ব্ববিভাগ ও অন্ত্যানুপ্রাসের রীতি বুঝিবার সুবিধা হয়। বাংলায় অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার চরণের মধ্যেও দেখা যায় বলিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চরণ ভাঙিয়া বিভিন্ন পংক্তিতে অনেক সময় লেখা হয়। রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'তে তাহাই করিয়াছেন। প্রত্যেক পংক্তির শেষে অনুপ্রাস আছে, কিন্তু এই অন্ত্যানুপ্রাস কেবল মাত্র চরণের শেষ ধ্বনিতে নিবদ্ধ নহে। বিচিত্র ভাবে চরণের মধ্যে ইহার প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং একই স্তবকের অন্তর্গত বিভিন্ন চরণ ইহা দ্বারা সুশৃঙ্খলিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন, ছন্দে যতি ও ছেদের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। এই পার্থক্য না বুঝিলে যে সমস্ত ছন্দ বৈচিত্র্যে গরীয়ান্ তাহাদের প্রকৃতি বুঝা যাইবে না,

নানা রকমের অমিতাক্ষর (blank verse) ছন্দের আসল রহস্যটি অপরিজ্ঞাত রহিয়া যাইবে।

ছেদ ও যতির পার্থক্য আমি পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, "ছেদ" মানে ধ্বনির বিরাম স্থল; অর্থবাচক শব্দ-সমষ্টির (phrase) শেষে উপচ্ছেদ ও বাক্য বা খণ্ডবাক্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ থাকে। যে কোন রকম গদ্যে উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। যতি (metrical pause) অর্থের সম্পূর্ণতার অপেক্ষা করে না, বাগ্‌যন্ত্রের প্রয়াসের মাত্রার উপর নির্ভর করে। যতির অবস্থানের দ্বারাই ছন্দের আদর্শ বুঝা যায়। কাব্যছন্দে পরিমিত কালানন্তরে যতি থাকিবেই। অনেক সময়ই অবশ্য যতি কোন না কোন প্রকার ছেদের সহিত মিলিয়া যায়, সেখানে যতি ধ্বনির বিরতির সহিত এক হইয়া যায়। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় না। সে ক্ষেত্রে স্বরের তীব্রতার বা গাম্ভীর্য্যের হ্রাস অথবা শুধু একটা সুরের টান দিয়া যতির অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। যতি পতনের সময়েই বাগ্‌যন্ত্রের একটি প্রয়াসের শেষ এবং আর একটি প্রয়াসের জন্য শক্তি সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কাব্যছন্দে যতির অবস্থানের দ্বারা ছন্দোবন্ধের আদর্শ সূচিত হয়, ছেদের অবস্থানের দ্বারা তাহার অন্বয় বুঝা যায়। সুতরাং যতি ও ছেদ দুইটি বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কবিতায় স্থান পাইয়া থাকে। যে কোন রকম ছন্দের দ্যোতনাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে ঐক্যের সহিত বৈচিত্র্যের সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। অমিতাক্ষর ছন্দে যতির দ্বারা ঐক্য এবং ছেদের দ্বারা বৈচিত্র্য সূচিত হয়। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রত্যেক পংক্তিই এক একটি চরণ সুতরাং প্রত্যেক পংক্তির শেষে পূর্ণ যতি থাকে। প্রতি পংক্তিতে বা চরণে ৮ মাত্রা ও ৬ মাত্রার দুইটি পর্ব্ব, সুতরাং প্রত্যেক পংক্তিতে ৮ মাত্রার পর একটি অর্দ্ধযতি থাকে। এইরূপে সুদৃঢ় ঐক্যসূত্রে ঐ ছন্দ গ্রথিত। কিন্তু মধুসূদনের ছন্দে ছেদ যতির অনুগামী নহে; নানা বিচিত্র অবস্থানে থাকিয়া ছেদ বৈচিত্র্য উৎপাদন করে। যেখানে পূর্ণচ্ছেদ, সেখানে পূর্ণযতি প্রায়ই থাকে না; অনেক সময়, সে স্থলে কোন যতিই একেবারে থাকে না, পর্ব্বের মধ্যে ছেদের অবস্থান হয়। এইরূপে মধুসূদনের ছন্দ যতি অনুসারে ও ছেদ অনুসারে দুই প্রকার বিভিন্ন উপায়ে বিভক্ত হয়। এই দুই প্রকার বিভাগের সূত্র ধূপছায়া রঙের বস্ত্রখণ্ডের টানা ও পোড়েনের মত পরস্পরের

সহিত বিজড়িত অথচ প্রতিগামী হইয়া রসানুভূতির বিচিত্র বিলাস উৎপাদন করে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের অমিত্রাক্ষর ছন্দ এক রকম মধুসূদনের ছন্দের অনুযায়ী ; অর্থাৎ প্রতি পংক্তি-চরণে ১৪ মাত্রা, এবং প্রত্যেক চরণে ৮ মাত্রা ও ৬ মাত্রার পর যতি। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মধুসূদনের অনুসরণ তিনি কখন করেন নাই, ছেদ ও যতির পরস্পর বিয়োগের যে চরম সীমা মধুসূদনের ছন্দে দেখা যায়—ততদূর রবীন্দ্রনাথ কখনও অগ্রসর হন নাই। বরং নবীন সেন প্রভৃতি কবিগণের ছন্দে অমিত্রাক্ষরের যে মৃদুতর রূপ দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ তাহারই অনুসরণ করিতেন। এক একটি অর্থসূচক বাক্য সমষ্টির মধ্যে যতি স্থাপন অথবা পর্ব্বের মধ্যে ছেদ স্থাপনের রীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনই প্রসন্ন নহেন। তদ্ভিন্ন মিত্রাক্ষরের রীতি তিনি অমিত্রাক্ষরের মধ্যেও চালাইতে পক্ষপাতী। সুতরাং তাঁহার মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম প্রথম বৈচিত্র্যের মনোহারিত্ব তত লক্ষিত হইত না। ক্রমশঃ তিনি প্রত্যেক চরণে ঠিক ৮ মাত্রার পরে যতি স্থাপনের রীতি তুলিয়া দিলেন, আবশ্যকমত ৪, ৬, ১০ মাত্রার পরেও যতি দিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৪ মাত্রার পর পূর্ণযতি রাখিয়া তিনি ছন্দের ঐক্যসূত্র বজায় রাখিলেন। চরণের মধ্যে যতি স্থাপনের নিয়মানুবর্ত্তিতা তুলিয়া দেওয়ার জন্য ছন্দের ঐক্যসূত্র কতকটা শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু 'চরণের অন্তে মিত্রাক্ষর' থাকায় পূর্ণযতিটি ও ঐক্যসূত্রটি সুস্পষ্ট হইতে লাগিল। মিত্রাক্ষরের প্রভাব বলবৎ করিবার জন্য তিনি চরণের অন্তে উপচ্ছেদ প্রায়ই রাখিয়াছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষরে চরণে পর্ব্বের মাত্রার দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু ছেদ ও যতির সম্পর্কের দিক্ দিয়া তত বেশী বৈচিত্র্য নাই। যেখানেই যতি সেখানেই কোন না কোন ছেদ আছে ; তবে পূর্ণযতি পূর্ণচ্ছেদের অনুগামী নহে। তাঁহার ১৮ মাত্রার অমিত্রাক্ষরেও এই এই লক্ষণ বর্ত্তমান। সাধারণতঃ ১৮ মাত্রার ছন্দে প্রতি চরণে ৮ ও ১০ মাত্রার করিয়া দুইটি পর্ব্ব দিয়াছেন, কিন্তু এখানেও অনেক সময় পর্ব্বের মাত্রার দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছেন।

'বলাকা'র কতকগুলি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটু পরিবর্ত্তিত রূপ দেখা যায়। 'বলাকা'র ১৭ সংখ্যক কবিতাটির প্রথম স্তবকটি লওয়া যাক্। মুদ্রিত গ্রন্থে এইভাবে পংক্তিগুলি সজ্জিত হইয়াছে—

হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।
ততক্ষণ
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।

এখানে এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ নহে, প্রত্যেক পংক্তির মধ্যে ছন্দোবন্ধের আদর্শের পূর্ণতা ঘটে নাই। কিন্তু প্রত্যেক পংক্তির শেষে অন্ত্যানুপ্রাস আছে, এবং এই অন্ত্যানুপ্রাসের রীতি-বৈচিত্র্য হিসাবেই বিচিত্র-ভাবে পংক্তিগুলির দৈর্ঘ্য নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক পংক্তির শেষে কোন না কোন প্রকারের ছেদ আছে, সুতরাং ধ্বনির বিরতি ঘটিতেছে। ছেদের সহিত অন্ত্যানুপ্রাসের একত্র অবস্থান হওয়াতে অন্ত্যানুপ্রাসের প্রভাব বলবৎ হইয়াছে, এবং তাহার দ্বারা স্তবকের মধ্যে ছন্দোবিভাগগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু পূর্ণচ্ছেদ বা উপচ্ছেদ কত মাত্রার পরে থাকিবে সে সম্বন্ধে এখানে কোন নিয়ম নাই। সুতরাং এ ছন্দ অমিত্রাক্ষর জাতীয়। কিন্তু অমিতাক্ষর ছন্দেও যতির অবস্থানের দিক্ দিয়া কোন প্রকার আদর্শের বন্ধন থাকিতে পারে। যতির অবস্থান বিবেচনা করিলে এই ছন্দ যে রবীন্দ্রনাথের অমিতা-ক্ষরেরই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত রূপ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

(ক) (ক)
হে ভুবন * আমি যতক্ষণ * তোমারে না

(খ) (ক) (খ)
বেসেছিনু ভালো * * ততক্ষণ * তব আলো *

(ক)
খুঁজে খুঁজে পায় নাই * তার সব ধন। * *

(ক) (ক)
ততক্ষণ * নিখিল গগন * হাতে নিয়ে

(গ)
দীপ তার * শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে। * *

এইভাবে লিখিলে ইহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। ছেদের উপরে সূচী-অক্ষর দিয়া মিত্রাক্ষরের রীতি দর্শিত হইয়াছে। এখানে প্রতি পংক্তিকে এক একটি চরণের অর্থাৎ ছন্দের আদর্শানুযায়ী এক একটি বৃহত্তর বিভাগের সমান করিয়া লেখা হইয়াছে প্রত্যেক চরণের শেষে যতির স্থান আছে, যদিও সর্ব্বদা ছেদ নাই। যেখানে চরণের শেষে ছেদ নাই, সেখানে ধ্বনি প্রবাহের বিরতি ঘটিবে না, কিন্তু জিহ্বার ক্রিয়ার বিরাম ঘটিবে, ধ্বনির তীব্রতার হ্রাস হইবে, শুধু একটা স্বরের টান থাকিবে ; সেই সময়ে বাগ্‌যন্ত্র নূতন করিয়া শক্তির আহরণ করিবে। অন্যান্য অমিতাক্ষর ছন্দের ন্যায় এখানেও চরণের দৈর্ঘ্যের একটা স্থির পরিমাণ আছে। দেখা যাইতেছে যে এস্থলে প্রতি চরণ-ই সাধারণ অমিতাক্ষরের ন্যায় ১৪ মাত্রার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বে অমিতাক্ষর ছন্দে চরণের শেষে মিত্রাক্ষর রাখিতেন। এখানে চরণে শেষে পূর্ণ যতির সঙ্গে সঙ্গে মিত্রাক্ষর না দিয়া এক একটি অর্থসূচক বাক্যাংশের শেষে অর্থাৎ ছেদের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রাক্ষর রাখিয়াছেন,—এই টুকু এ ছন্দের নূতনত্ব। ফলে অবশ্য যতির বন্ধনটি এ ছন্দে তত সুস্পষ্ট নহে। সুতরাং এ ছন্দে ঐক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্যের প্রভাবই অধিক। যাহা হউক, যখন এখানে যতির অবস্থানের দিক্ দিয়া একটা নিয়মের বন্ধন আছে তখন ইহাকে free verse বলা ঠিক সঙ্গত হইবে না। ইহাকে free verse বলিলে 'রাজা ও রাণী'র blank verseকেও free verse বলা উচিত। সেখানেও ছেদের অবস্থানের দিক্ দিয়া কোন ঐক্য সূত্র পাওয়া যায় না, মাত্র একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রার (১৪ মাত্রার) পরে একটা যতি দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে নমুনা দিতেছি—

"আমি এ রাজ্যের রাণী *—তুমি মন্ত্রী বুঝি?" * *
"প্রণাম, জননি। * * দাস আমি, * * কেন মাতঃ *
অন্তঃপুর ছেড়ে আজ * মন্ত্রগৃহে কেন? * *"
"প্রজার ক্রন্দন শুনে * পারি নে তিষ্ঠিতে
অন্তঃপুরে। * * এসেছি করিতে প্রতীকার। * *

এখানেও ছেদ বা উপচ্ছেদের অবস্থানের কোন নিয়ম নাই। চরণের শেষে কেবল একটা যতি আছে,—সঙ্গে সঙ্গে কখন উপচ্ছেদ, কখন পূর্ণচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কখন আবার কোন রকমের ছেদ-ই দেখা যায় না। অধিকন্তু এখানে মিত্রাক্ষর মোটেই নাই। তথাপি পংক্তির শেষে যতি থাকার জন্য ইহাকে সাধারণ blank verse বলিয়া অভিহিত করা হয়, free verse বলা

হয় না। সে হিসাবে 'বলাকা' হইতে উদ্ধৃত পংক্তি কয়টিকে blank verse বা অমিতাক্ষর বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, free verse আখ্যা দিবার আবশ্যক নাই।

'বলাকা'র ছন্দ সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে হইলে আর একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। বাংলা পদ্যে মাঝে মাঝে ছন্দের অতিরিক্ত দুই একটি শব্দ ব্যবহারের রীতি আছে। পূর্ব্বে নজরুল্ ইস্‌লামের 'বিদ্রোহী' কবিতা হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তিতে এইরূপ ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ আছে। নদীর মধ্যে মধ্যে শিলাখণ্ড থাকিলে যেমন স্রোতের প্রবাহ উচ্ছল ও আবর্ত্তময় হইয়া উঠে, ছন্দ-প্রবাহের মধ্যে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ মাঝে মাঝে থাকিলে তদ্রূপ একটা উচ্ছল ভাব ও বৈচিত্র্য আসে। এই জন্যই বাংলা কীর্ত্তনে 'আখর' যোগ দেওয়ার পদ্ধতি আছে। বলা বাহুল্য এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ যোজনা খুব নিয়মিতভাবে করা উচিত নহে, তাহা হইলে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। পর্ব্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে (কখন কখন, পরে) এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ যোজনা করা হয়। ছন্দের বিশ্লেষণ করার সময় এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে হইবে।

'বলাকা'র ছন্দে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ প্রায়ই সন্নিবেশ করা হইয়াছে। ছন্দোবন্ধের অন্তর্ভুক্ত পদের সহিত অতিরিক্ত শব্দসমষ্টির অন্ত্যানুপ্রাস রাখিয়া তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা হইয়াছে। অর্থের দিক্ দিয়াও ছন্দোবন্ধের অন্তর্ভুক্ত পদের সহিত এতাদৃশ অতিরিক্ত পদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের চেনা একটু শক্ত হইতে পারে। কিন্তু যথোচিত আবৃত্তিতে তাহাদের প্রকৃতি স্পষ্ট ধরা যায়। এই অতিরিক্ত পদগুলিকে চিনিয়া ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে পারিলে 'বলাকা'র অনেক কবিতার ছন্দের গঠন সরল বলিয়া প্রতীত হইবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি; মুদ্রিত গ্রন্থের পংক্তির অনুসরণ না করিয়া ছন্দের যথার্থ চরণ অনুসারে পংক্তিগুলি নূতন করিয়া সাজাইতেছি।

১১ সংখ্যক কবিতাটি হইতে নিম্নের অংশটি লইয়া ছন্দোলিপি করিতেছি।

নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে	=১০
তাদের কলুষরক্ত | নয়নের পরে ;	=৮+৬=১৪
শুভ্র নবমল্লিকার বাস	=১০
স্পর্শ করে লালসার | উদ্দীপ্ত নিশ্বাস ;	=৮+৬=১৪

সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা =১০
সপ্তর্ষির পূজা দীপ মালা =১০
তাদের মত্ততা পানে | সারারাত্রি চায়— =৮+৬=১৪
(হে সুন্দর,) তব গায় * ধূলা দিয়ে | যারা চলে যায় ! =৮+৬=১৪

(হে সুন্দর,) তোমার বিচার ঘর | পুষ্পবনে, পুণ্য সমীরণে, =৮+১০=১৮
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গগুঞ্জনে, =১০
বসন্তের বিহঙ্গ-কূজনে, =১০
তরঙ্গ-চুম্বিত তীরে | মর্ম্মরিত পল্লববীজনে। ৮+১০=১৮

অতিরিক্ত পদগুলিকে বাদ দিলে এস্থলে সাধারণ মিতাক্ষর স্তবকের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। ৮, ৬ ও ১০ মাত্রার একটি কি দুইটি পর্ব্ব লইয়া এক একটি চরণ, এবং প্রত্যেক চার চরণে এক একটি স্তবক গঠিত হইয়াছে। সর্ব্বদাই যে চার চরণের স্তবক পাওয়া যাইবে তাহা নয়, কখন কখন দুই, তিন, পাঁচ ইত্যাদি সংখ্যার চরণ লইয়া স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যাইবে।

এ কথা জানিতে তুমি, | ভারত-ঈশ্বর শাজাহান =৮+১০=১৮
কালস্রোতে ভেসে যায় | জীবন যৌবন ধনমান =৮+১০=১৮
শুধু তব অন্তরবেদনা =০+১০=১০
চিরন্তন হয়ে থাক | সম্রাটের ছিল এ সাধনা। =৮+১০=১৮

রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন =০+১০=১০
সন্ধ্যারক্তরাগ সম | তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন, =৮+১০=১৮
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস =০+১০=১০
নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে | সকরুণ করুক আকাশ =৮+১০=১৮
এই তব মনে ছিল আশ। =০+১০=১০

হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা =০+১০=১০
যেন শূন্য দিগন্তের | ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা =৮+১০=১৮
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক্ =০+১০=১০
(শুধু থাক্) একবিন্দু নয়নের জল =০+১০=১০

কালের কপোল তলে | শুভ্র সমুজ্জ্বল =৮+৬=১৪
এ তাজমহল =০+৬=৬

এই সব স্থলেও দেখা যাইতেছে যে চরণের মধ্যে পর্ব্বসমাবেশ এবং চরণের সমাবেশে স্তবক গঠনের বেশ একটা আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে। পূর্ণ চরণ

মাত্রেই দ্বিপর্ব্বিক, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ণ চরণের সমাবেশ করিয়া স্তবকের মধ্যে বৈচিত্র্য আনা হইয়াছে। পূর্ণ-পর্ব্বিক ও অপূর্ণপর্ব্বিক চরণের সমাবেশ করিয়া স্তবকের মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করা রবীন্দ্রনাথের একটি সুপরিচিত কৌশল। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে 'পূরবী' পর্য্যন্ত প্রায় সব কাব্যেই তিনি ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। উপরের উদাহরণে ছন্দের যে আদর্শ, তাহা 'পূরবী'র 'অন্ধকার' প্রভৃতি কবিতাতেও পাওয়া যায়; কেবল মাত্র কখন কখন অতিরিক্ত পদ যোজনা এবং মিত্রাক্ষরের ব্যবহারের দিক্ দিয়া এখানে একটু বিশেষত্ব আছে। কিন্তু নিম্নলিখিত পংক্তিপর্য্যায়কে কি কেহ free verse বলিবেন?

> উদয়াস্ত দুই তটে | অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
> নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।
> প্রভাত-আলোকচ্ছটা | শুভ্র তব আদি শঙ্খধ্বনি
> চিত্তের কন্দরে মোর | বেজেছিলো * একদা যেমনি
> নূতন চেয়েছি আঁখি তুলি';
> সে তব সঙ্কেত মন্ত্র | ধ্বনিয়াছে, হে মৌনী মহান,
> কর্ম্মের তরঙ্গে মোর; | * * স্বপ্ন-উৎস হ'তে মোর গান
> উঠেছে ব্যাকুলি'।

(পূরবী—অন্ধকার)

এখানে ছন্দের যে প্রকৃতি, 'বলাকা'র-'শাজাহান' হইতে উদ্ধৃত পংক্তি-গুলিতেও মূলতঃ তাহাই।

Free verse কাহাকে বলে? যেখানে verse বা পদ্য নিয়মের নিগড় হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাবিহারী ও কেবলমাত্র ভাবতরঙ্গের অনুসারী, সেখানে free verse আছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাকে কি আদৌ verse বা পদ্য বলা যায়? দু'একটি বিষয়ে অন্ততঃ সমস্ত পদ্যকেই নিয়মের অধীন হইতে হইবে। পদ্যের উপকরণ পর্ব্ব; সুতরাং বিশিষ্ট ধ্বনিলক্ষণযুক্ত, যথোচিত রীতি অনুসারে পর্ব্বাঙ্গ সমাবেশে গঠিত পর্ব্ব সমস্ত পদ্যেই থাকিবে। গদ্যে সেরূপ থাকার প্রয়োজন নাই।' অধিকন্তু পদ্যে পর্ব্ব যোজনার দিক্ দিয়া কোন না কোন আদর্শের অনুসরণ করা হয়, এবং তজ্জন্য পর্ব্বপরম্পরার মধ্যে এক প্রকার ঐক্যের বন্ধন লক্ষিত হয়। পর্ব্বের মাত্রার দিক্ দিয়া, অথবা চরণের মাত্রা কিম্বা গঠনের সূত্রের দিক্ দিয়া, অথবা স্তবকের গঠনের সূত্র

দিয়া এই ঐক্যবন্ধন লক্ষিত হয়। সুপ্রচলিত অনেক ছন্দেই এই তিন দিক্ দিয়াই ঐক্য থাকে। কিন্তু সব দিক্ দিয়া ঐক্য থাকার আবশ্যিকতা নাই, এক দিকে ঐক্য থাকিলেই পদ্যের পক্ষে যথেষ্ট। পদ্যের ব্যঞ্জনাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে ঐক্যের সহিত বৈচিত্র্যের যোগ হওয়া দরকার। এজন্য অনেক সময়ই কবিরা উপর্য্যুক্ত কয়েকটি দিকের এক বা ততোধিক দিক্ দিয়া ঐক্য বজায় রাখেন এবং বাকি দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন। এতদ্ভিন্ন অর্দ্ধ-যতি ও পূর্ণযতির সহিত উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের সংযোগ বা বিয়োগ অনুসারে-ও নানারূপে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে কবিরা ঐক্যের দিকেই নজর দিতেন, সুতরাং ছন্দের দ্বারা বিচিত্র ভাববিলাসের ব্যঞ্জনা করা সম্ভব হইত না। মধুসূদন ছন্দের মধ্যে বৈচিত্র্য আনিবার জন্য যতি ও ছেদের বিয়োগ ঘটাইয়া অমিতাক্ষর সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু ছন্দের কাঠামের কোন পরিবর্ত্তন করিলেন না, পর্ব্বের ও চরণের মাত্রার দিক্ দিয়া সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কবিরা মধুসূদনের ন্যায় ছেদ ও যতির বিয়োগ ঘটাইতে ততটা সাহসী হইলেন না। সাধারণ রীতি অনুসারে যতি ও ছেদের মৈত্রী বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই চেষ্টা তাঁহার কাব্যজীবনের প্রথম হইতেই দেখা যায়। ছেদ ও যতির একান্ত বিয়োগ তাঁহার কাছে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক রীতির বিরোধী বলিয়া মনে হয়। সুতরাং তিনি ছন্দে ঐক্য সূত্রের নিগড় শ্লথ করিয়া বৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কিরূপে নানাসময়ে নানাভাবে তিনি ছন্দের মধ্যে কোন কোন এক দিক্ দিয়া ঐক্য রাখিয়া অপরাপর দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন। অমিতাক্ষর ছন্দেও তিনি কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বৈচিত্র্যের জন্য সেখানে ছন্দ ও যতির বিয়োগের উপর নির্ভর না করিয়া পর্ব্বের মাত্রার দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যপন্থী হইলেও বিপ্লবপন্থী নহেন। এ কথা তাঁহার ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যেমন খাটে, তাঁহার ছন্দ সম্বন্ধেও তেমন খাটে। সম্পূর্ণরূপে free verse অর্থাৎ পর্ব্ব, চরণ বা স্তবকের মাত্রা বা গঠন-রীতির দিক্ দিয়া কোন আদর্শের প্রভাব হইতে একান্তভাবে মুক্ত ছন্দ তিনি কখন রচনা করিয়াছেন কি না সন্দেহ। 'বলাকা' হইতে যে কয় রকমের

নমুনা দেওয়া গিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন আদর্শের প্রভাব লক্ষিত হয়। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে 'শাজাহান' প্রভৃতি কবিতায় আদর্শ স্থির নহে, পরিবর্ত্তনশীল। কয়েকটি পংক্তির মধ্যে কোন এক রকমের আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে, পরবর্ত্তী পংক্তিপর্য্যায়ে আবার অন্য এক রকম আদর্শ ফুটিতেছে। কিন্তু এ জন্য ঐ জাতীয় কবিতায় কোন আদর্শের স্থান নাই এ কথা বলা চলে কি?

'বলাকা'র নিম্নলিখিত চরণপরম্পরায় যে ধরণের ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ free verseর কাছাকাছি আসিয়াছেন।

	মাত্রাসংখ্যা	পর্ব্বসংখ্যা
যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে | ক্লান্তিভরে দাঁড়াও থমকি,'	=১০+১০	—২
তখনি চমকি' | উচ্ছি্রয়া উঠিবে বিশ্ব | পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্ব্বতে;	=৬+৮+১০	—৩
পঙ্গু মূক | কবন্ধ বধির আঁধা | স্থূল তনু ভয়ঙ্করী বাধা	=৪+৮+১০	—৩
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে | দাঁড়াইবে পথে ;=৮+৬		—২
অণুতম পরমাণু | আপনার ভারে | সঞ্চয়ের অচল বিকারে	=৮+৬+১০	—৩
বিদ্ধ হবে | আকাশের মর্ম্ম-মূলে | কলুষের বেদনার শূলে	=৪+৮+১০	—৩
ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী | অলক্ষ্য সুন্দরী,	=১০+৬	—২
তব নৃত্য-মন্দাকিনী | নিত্য ঝরি' ঝরি'	=৮ ৬	—২
তুলিতেছে শুচি করি' | মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।	=৮+১০	—২
নিঃশেষ নির্ম্মল নীলে | বিকাশিছে নিখিল গগন।	=৮+১০	—২

তত্রাচ এখানেও চরণে পর্ব্বসংখ্যা বিবেচনা করিলে একপ্রকার আদর্শ অনুযায়ী স্তবক গঠনের আভাস রহিয়াছে। সুতরাং ইহাকেও free verse ঠিক বলা উচিত নয়। Christabel প্রভৃতি কবিতাতে foot বা lineর দৈর্ঘ্যের দিক্ নিয়া নিয়মের নিগড় নাই, কিন্তু তাহাকে free verse বলা হয় না, কারণ সেখানেও আদর্শের বন্ধন আছে। তবে free verse কথাটি তত সূক্ষ্ম অর্থে না ধরিলে এ রকম ছন্দকে free verse বলা চলিতে পারে, কারণ পর্ব্বের মাত্রা বা চরণের মাত্রার দিক্ দিয়া এখানে কোন আদর্শের অনুসরণ করা হয় নাই। *

গিরিশ ঘোষের নাটকে যে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকেই বরং free

---

* মৎপ্রণীত Studies in Rabindranath's Prosody দ্রষ্টব্য।

verse নাম দেওয়া যাইতে পারে। সেখানে মিত্রাক্ষরের প্রভাব নাই, এক একটি চরণ যেন অপর চরণগুলি হইতে বিযুক্ত হইয়া আছে। পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা স্থির নাই ; চার, ছয়, আট, দশ মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার দেখা যায় ; ভাষা গম্ভীর হইলে আট ও দশ মাত্রার, এবং সহজ কথোপকথনের ভাষা হইলে ছয় ও চার মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়। অবশ্য প্রত্যেক চরণে সাধারণতঃ দুইটি করিয়া মাত্র পর্ব্ব আছে, কিন্তু কেবল সে জন্যই একটা আদর্শের বন্ধন আছে বলা যায় না ; কারণ পর পর চরণ সহযোগে কোনরূপ স্তবক গঠনের আভাস নাই।

এই রকম ছন্দ, যাহাকে prose-verse বলা হয় তাহা হইতে বিভিন্ন। free verseএ পদ্যছন্দের উপকরণ আছে, কিন্তু উপকরণের সমাবেশের দিক দিয়া পদ্যের আদর্শের বন্ধন নাই। Prose-verseএ পদ্যছন্দের উপকরণ অর্থাৎ পর্ব্ব নাই। এক একটি phrase বা অর্থসূচক শব্দসমষ্টি prose-verseর উপাদান। সুতরাং prose-verseএ যতি ও ছেদের বিয়োগের কথা উঠিতে পারে না। Prose-verseর এক একটি উপকরণের পরিচয় মাত্রা বা অন্য কোনরূপ ধ্বনিগত লক্ষণের দিক্ দিয়া নহে। কিন্তু prose-verseএ পদ্যছন্দের উপকরণ নাই, কিন্তু পদ্যছন্দের আদর্শ আছে। উদাহরণস্বরূপ Walt Whitman হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

All the past | we leave behind,
We debouch | upon a newer | mightier world, | varied world,
Fresh and strong | the world we seize, |
world of labour | and the march,
Pioneers ! | O Pioneers !

We detachments | steady throwing, |
Down the edges, | through the passes, | up the mountains | steep
Conquering, holding | daring, venturing | as we go |
the unknown ways,
Pioneers ! | O Pioneers !

এখানে প্রথম চারিটি পংক্তি লইয়া একটি এবং শেষে চারিটি পংক্তি লইয়া আর একটি পদ্যছন্দের আদর্শানুযায়ী স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে। প্রথম পংক্তিতে

দুইটি, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ে চারিটি করিয়া এবং চতুর্থে দুইটি phrase ব্যবহৃত হইয়াছে। এক একটি phraseএ কম বেশী চার syllable থাকিলেও, কোন ধ্বনিগত ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া এক একটি বিভাগ করা হয় নাই। এইরূপ prose-verse রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা'য় ব্যবহার করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েক ছত্রের ছন্দোলিপি দিতেছি—

এখানে নাম্‌লো সন্ধ্যা
সূর্য্যদেব, | কোন দেশে | কোন সমুদ্র পারে | তোমার প্রভাত হলো?

অন্ধকারে (এখানে) | কেঁপে উঠ্‌ছে | রজনীগন্ধা
বাসর ঘরের | দ্বারের কাছে | অবগুন্ঠিতা | নব বধূর মতো:
কোনখানে (ফুট্‌লো) | ভোর বেলাকার | কনক-চাঁপা?

জাগ্‌লো কে?
নিবিয়ে দিলো | সন্ধ্যায় জ্বালান দীপ
ফেলে দিলো | রাত্রে গাঁথা | সেঁউতি ফুলের মালা।

কিন্তু Whitman-র prose-verse বা 'লিপিকা'র ছন্দ ছাড়া আরও অন্য প্রকারের ছন্দ গদ্যে ব্যবহৃত হয়। Prose-verseএ গদ্য পদ্যের আদর্শের অধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু এমন অনেক গদ্য আছে যাহাতে পদ্যের উপকরণ বা পদ্যের আদর্শ কিছুই নাই, অথচ নূতন এক প্রকারের ছন্দ-স্পন্দন অনুভূত হয়, নূতন এক প্রকৃতির রস মনে সঞ্চারিত হয়। ইংরাজীতে Gibbon, De Quincey, Ruskin, Carlyle প্রভৃতির রচনায় এই যথার্থ গদ্যছন্দের উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। বাংলাতেও বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র ইত্যাদি অনেক সুলেখকের রচনায় গদ্যছন্দ দেখা যায়। নমুনা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ হইতে কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো! সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি-যোজন-ব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে—তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।"

গদ্যছন্দের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিতে গেলে আর একটি প্রবন্ধ সূচনা করা আবশ্যক। সুতরাং এ প্রবন্ধে শুধু তৎসম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়াই নিরস্ত হইলাম।

কৌতূহলী পাঠক মৎপ্রণীত The Rhythm of Bengali Prose and Prose-Verse (Cal. Univ. Journ. Letters, XXXII) পাঠ করিতে পারেন। যাহা হউক্, ঐক্যপ্রধান পদ্যছন্দের ও বিশিষ্ট গদ্যছন্দের মধ্যে নানা আদর্শের ছন্দ আছে তাহা লক্ষ্য করা দরকার। তাহারা সাধারণ ঐক্যপ্রধান পদ্যছন্দের অনুরূপ নহে বলিয়াই তাহাদের শুধু 'মুক্তক' বলিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না।

বাংলায় ইংরাজী ছন্দ

কাহারও কাহারও মতে বাংলায় ইংরাজী ছন্দ বেশ চালান যাইতে পারে, এমন কি কোন কোন কবি না কি ইংরাজী ছন্দে কোন কোন কবিতা রচনাও করিয়াছেন। ইংরাজী ছন্দের মূলতত্ত্বগুলি একটু অনুধাবন পূর্ব্বক আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে এ মত আদৌ বিচারসহ নহে।

প্রত্যেক ভাষার ছন্দপদ্ধতি অক্ষরের কোন একটি লক্ষণকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া ওঠে। অক্ষরের দৈর্ঘ্য বা মাত্রা-ই যে বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য বাংলা ছন্দ-কে quantitative বা মাত্রাগত বলা হয়। বাংলা ছন্দের উপকরণ এক একটি পর্ব্ব, এবং পর্ব্বের পরিচয় ইহার মাত্রা-সমষ্টিতে। বাংলা ছন্দের বিচার বা বিশ্লেষণের সময় আমরা দেখি এক একটি অক্ষরের মাত্রা কি —তাহা হ্রস্ব না দীর্ঘ, এক মাত্রার না দুই মাত্রার; এবং তাহাদের সমাবেশে যে পর্ব্বাঙ্গ ও পর্ব্বগুলি গঠিত হইয়াছে তাহাদের মোট মাত্রাসংখ্যা কত। সমান সমান বা নিয়মিত মাত্রার পর্ব্ব লইয়াই বাংলা পদ্যের এক একটি চরণ রচিত হয়।

ইংরাজী ছন্দের মূল তথ্যই বিভিন্ন। ইংরাজী ছন্দ qualitative বা অক্ষরের গুণগত। Accent অর্থাৎ উচ্চারণের সময় অক্ষরের আপেক্ষিক গাম্ভীর্য্যের উপরই ইহার ভিত্তি। ইংরাজী ছন্দের উপকরণ এক একটি foot বা গণ, এবং foot-এর পরিচয় accented ও unaccented অক্ষরের সমাবেশ-রীতিতে। কোন একটি বিশেষ ছাঁচ অনুসারে ইংরাজী ছন্দের এক একটি foot গঠিত হয় এবং তদনুসারে প্রতি footএ accented ও unaccented অক্ষর সাজান হয়। সেই ছাঁচেই ইংরাজী foot-এর পরিচয়। ইংরাজী ছন্দের বিশ্লেষণের সময় আমরা দেখি কোন্ কোন্ অক্ষরে accent পড়িয়াছে এবং কোন্ কোন্ অক্ষরে পড়ে নাই, এবং কি রীতিতে তাহাদের পর পর সাজান হইয়াছে। সুতরাং ইংরাজী ছন্দ যে বাংলায় অচল তাহা সহজেই প্রতীত হয়।

তত্রাচ কোন কোন লেখক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বাংলা স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধ ইংরাজী ছন্দের প্রতিনিধি-স্থানীয়, এবং সেই

ছন্দোবন্ধে ইংরাজী ছন্দের যথেচ্ছ অনুকরণ করা যাইতে পারে। তাঁহাদের ধারণা যে বাংলা ছন্দের স্বরাঘাত এবং ইংরাজী ছন্দের accent একই জিনিষ, সুতরাং ছন্দে যথেষ্ট সংখ্যক স্বরাঘাত দিয়া বাংলায় ইংরাজী ছন্দের অনুসরণ করার কোন বাধা নাই।

কিন্তু বাস্তবিক ইংরাজীর accent ও বাংলার স্বরাঘাত এক নহে। ইংরাজী accentর স্বরগাম্ভীর্য্য শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণের অনুসরণ করে, কিন্তু বাংলা ছন্দে স্বরাঘাতের স্বরগাম্ভীর্য্য স্বাভাবিক উচ্চারণের অতিরিক্ত একটা ঝোঁক। রবীন্দ্রনাথের

"চিন্তা দিতেম | জলাঞ্জলি | থাক্‌তো নাকো | ত্বরা"

এই চরণটিতে "তেম্" এই অক্ষরটির স্বরগাম্ভীর্য্য সাধারণ উচ্চারণের অনুসারী নহে। "চিন্" অক্ষরটির স্বরগাম্ভীর্য্য অবশ্য পরের অক্ষরটির অপেক্ষা স্বভাবতঃই বেশী, কিন্তু এই চরণটিতে ইহার স্বরগাম্ভীর্য্য স্বরাঘাতের জন্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। "লাঞ্" অক্ষরটির স্বরগাম্ভীর্য্য স্বভাবতঃ পূর্ব্বতন "জ" অক্ষরটির চেয়ে বেশী কি না খুব সন্দেহ, কিন্তু এখানে যে স্বরাঘাতের জন্য তাহা অনেক গুণ বাড়িয়াছে সে বিষয় সন্দেহ নাই। স্বরাঘাতের জন্য কখন কখন অক্ষরের স্বাভাবিক উচ্চারণের পর্য্যন্ত ব্যতিক্রম হয়, যেখানে স্বভাবতঃ স্বরগাম্ভীর্য্য একেবারেই থাকিতে পারে না সেখানেও তীব্র গাম্ভীর্য্য লক্ষিত হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের

রঙ্ যে ফুটে | ওঠে কতো
প্রাণের ব্যাকুল | লতার মতো

এই চরণ দুইটির মধ্যে "ঠে" অক্ষরটির স্বরগাম্ভীর্য্য "ও" অক্ষরটির চেয়ে স্বভাবতঃ কম, কিন্তু স্বরাঘাতের জন্য তাহা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

বাংলা ছন্দের স্বরাঘাতের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সঙ্কোচন ও দ্রুতলয়ে উচ্চারণ হয়। সুতারাং স্বরাঘাতযুক্ত অক্ষর মাত্রেই হ্রস্ব (২০গ সূত্র দ্রষ্টব্য)। ইংরেজী accentর দরুণ কিন্তু অক্ষরের দৈর্ঘ্যের হ্রাস হয় না; বরং দীর্ঘ অক্ষরের উপরই accent প্রায়শঃ পড়ে, এবং ইহার প্রভাবে হ্রস্ব অক্ষর-ও দীর্ঘ অক্ষরের তুল্য হয়।

স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে প্রতি পর্ব্বে ৪ মাত্রা এবং সাধারণতঃ ৪টি করিয়া অক্ষর থাকে। কিন্তু ইংরাজী footর এক একটিতে সাধারণতঃ ২টি বা ৩টি অক্ষর থাকে, তিনের অধিক সংখ্যক অক্ষর লইয়া ইংরাজী ছন্দের foot হয় না; বাংলার পর্ব্বে স্বরাঘাত পড়িলে দুইটী স্বরাঘাত প্রায় থাকে, কিন্তু ইংরাজীর একটি foot-এ সাধারণতঃ মাত্র একটি accent থাকিতে পারে; সুতরাং বাংলার পর্ব্ব-কে ইংরাজী footর অনুরূপ বলা যায় না। প্রতি পর্ব্বের মধ্যে কয়েকটি গোটা শব্দ রাখাই বাংলা ছন্দের সাধারণ নীতি, কিন্তু ইংরাজী foot-এ তদ্রূপ কিছু করার কোন আবশ্যকতা নাই। যদি বাংলা ছন্দের পর্ব্বাঙ্গই ইংরাজী footর অনুরূপ মনে করা হয়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে বাস্তবিক ইংরাজীর foot ও বাংলা স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধের পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে বাস্তবিক কোন সাদৃশ্য নাই। এইরূপ পর্ব্বাঙ্গের প্রত্যেকটিতে স্বরাঘাত না থাকিতে পারে, এবং পর পর পর্ব্বাঙ্গগুলিতে স্বরাঘাতের অবস্থান এক না হইতেও পারে। পূর্ব্বে যে দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, ইংরাজী মতে তাহাদের ছন্দোলিপি হইত—

চিন্তা | দিতেম | জলা | ঞ্জলি | থাকতো | নাকো | ত্ব রা

রঙ যে | ফুটে | ওঠে | কতো

ছন্দের এরূপ বিভাগ ও গতি ইংরাজীতে অচল। ইংরাজীতে anapaest প্রভৃতি তিন অক্ষরের foot দিয়াই পদ্যের চরণ গঠিত হইতে পারে, কিন্তু বাংলায় স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে বরাবর তদ্রূপ পর্ব্বাঙ্গ ব্যবহার করা অসম্ভব। বাংলায় স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে প্রতি পর্ব্বের পর একটি ছেদ থাকে, ইংরাজীতে সেরূপ থাকার কোন প্রয়োজন নাই, প্রতি foot বা যুগ্ম দুইটি footর পরে যে ছেদ থাকিবে এমন কোন কথা নাই। ইংরাজীতে একটি footর মধ্যেই একটি পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে, কিন্তু বাংলায় পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে না। বাংলায় স্বরাঘাত প্রধান ছন্দের কাঠাম বাঁধা, কিন্তু ইংরাজী ছন্দের ছাঁচ যে কতদূর পর্য্যন্ত চাপ ও টান সহ্য করিতে পারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় Coleridgeর Christabel এবং ঐরূপ অন্যান্য কবিতায়। বাংলা স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে যথার্থ অমিতাক্ষর বা blank verse লেখা যায় না, কিন্তু ইংরাজী ছন্দে নানা বিচিত্র ভাবে ছেদের সহিত যতির সম্পর্ক স্থাপিত করা যায়

বলিয়া ইংরাজীতে অমিতাক্ষর ছন্দ বেশ লেখা যায়। Paradise Lost, King Lear অথবা Shelley, Swinburne প্রভৃতির বিখ্যাত কবিতা হইতে কতকগুলি পংক্তি লইয়া বাংলা স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে ফেলিবার চেষ্টা করিলেই এইরূপ প্রয়াসের ব্যর্থতা ও মূঢ়তা প্রতিপন্ন হইবে।

আধুনিক বাংলায় প্রত্যেক হলন্ত অক্ষরকেই দীর্ঘ ধরিয়া লইয়া যে এক প্রকার মাত্রাচ্ছন্দ চলিতেছে, কেহ কেহ মনে করেন যে সেই ছন্দোবন্ধে সব রকম বিদেশী, মায় ইংরাজী ছন্দের অনুকরণ করা যায়। হলন্ত অক্ষরকে ইংরাজী accented এবং স্বরান্ত অক্ষরকে ইংরাজী unaccented অক্ষরের প্রতিনিধি-স্থানীয় মনে করিয়া বাহ্যতঃ অনেক সময় ইংরাজী ছন্দের অনুসরণ করা হইয়াছে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। যে রকম, কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে

বসন্তে | ফুটন্ত | কুসুমটি | প্রায়

এই চরণটি ইংরাজী amphibrachic tetrametera উদাহরণ। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে ইংরাজী amphibracha সহিত ইহার সাদৃশ্য আপাত, যথার্থ নয়। প্রতি পর্ব্বে মোট চার মাত্রা আছে বলিয়াই এখানে ছন্দ বজায় আছে, ইংরাজী কোন foota ছাঁচ অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া নয়।" প্রথমতঃ, ইংরাজী accented অক্ষর ও বাংলা হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর ধ্বনির দিক্ দিয়া এক জিনিষ নয়; accented অক্ষরের সন্নিহিত অক্ষরের তুলনায় যে ধ্বনিগৌরব আছে, বাংলা হলন্ত দীর্ঘ অক্ষরের তাহা নাই। হলন্ত অক্ষর স্বভাবতঃই স্বরান্ত অক্ষর অপেক্ষা দীর্ঘ, তাহাকে দুই মাত্রা ধরার জন্য তাহাতে গুণগত কোন বিশেষত্বের উপলব্ধি হয় না। কেহ কেহ

মহৎ ভয়ের মুরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃ-শ্যামল"

এই চরণ দুইটিকে ইংরাজী Iambic ছন্দোবন্ধের উদাহরণ মনে করেন। 'ম' 'ভ' ইত্যাদিকে তাঁহারা unaccented অক্ষরের এবং 'হৎ' 'য়ের' ইত্যাদিকে accented অক্ষরের প্রতিরূপ মনে করেন। কিন্তু বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতিতে "হৎ", "য়ের" শব্দের অন্তঃস্থ হলন্ত অক্ষর বলিয়া স্বভাবতঃ দীর্ঘ, তাহাদের যে সন্নিহিত অক্ষরের সহিত গুণগত কোন পার্থক্য বা বিশেষ কোন ধ্বনিগৌরব আছে তাহা কেহই বোধ করেন না। বরং বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ

পদ্ধতিতে শব্দের শেষে স্বরগাম্ভীর্য্যের পতন হয় বলিয়া "ভয়ের" "সাগর" প্রভৃতি শব্দের শেষ অক্ষরগুলিকে unstressed syllableর অনুরূপ বলাই উচিত। তদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি লক্ষণ হইতে প্রমাণ করা যায় যে আসলে ইহাদের প্রকৃতি ইংরাজী ছন্দ হইতে বিভিন্ন। 'মহৎ ভয়ের মুরৎ সাগর' কে বদলাইয়া যদি 'মহৎ ভয়েরি মুরতি সাগর', লেখা যায় তবে ইংরাজী ছন্দের ছাঁচ ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু বাংলার ছন্দ ঠিক বজায় থাকে। কারণ আসলে ঐ চরণের ভিত্তি ৬ মাত্রার পর্ব্ব, এবং ইহার ছন্দোলিপি হইবে—

মহৎ ⁝ ভয়ের | মুরৎ ⁝ সাগর

তাহা ছাড়া 'মহৎ' ও 'ভয়ের' মধ্যে যে যতি পড়িয়াছে তাহা অর্দ্ধযতি, এবং 'ভয়ের' শব্দটির পরে একটি পূর্ণযতি পড়িয়াছে তাহা বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই অনুভব করেন। কারণ "মহৎ ভয়ের" এই দুইটি শব্দ লইয়া একটি পর্ব্ব, এবং "মহৎ" একটি পর্ব্বাঙ্গ মাত্র। ইংরাজী ছন্দে ঠিক এইরূপ হওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই। সেইরূপ "বসন্তে | ফুটন্ত | কুসুমটি | প্রায়" এই চরণটিকে যদি বদলাইয়া "বসন্ত | প্রভাতের | কুসুমটি | প্রায়" লিখিলে ছন্দ ঠিক বজায় থাকে, কিন্তু ইংরাজী ছন্দের ছাঁচ ভাঙ্গিয়া যায়। আসল কথা এই যে বাংলায় মাত্রাসমকত্ব-ই ছন্দের ভিত্তি, কোন একটা বিশেষ ছাঁচ নহে। কোন্ একটা ছাঁচ অনুসারে কবিতা লেখার প্রয়াস যাহারা করিয়াছেন তাঁহাদের লেখা হইতেও এ কথা প্রমাণ হয়।

মস্‌গুল্ | বুল্‌বুল্ | বন্‌ফুল্ | গন্ধে
বিল্‌কুল্ | অলিকুল্ | গুঞ্জরে | ছন্দে

এই দুইটি চরণে প্রতি পূর্ণ পর্ব্বে দুইটি হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর রাখিয়া ছন্দ রচনার প্রয়াস হইয়াছে, কিন্তু শেষের চরণটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি কোনরূপ ছন্দের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বোধ হয় না। সেইরূপ

"ভোম্‌রায় | গান্ গায়্ | চর্‌কার্ | শোন্ ভাই"

ইহার বদলে

"ভোম্‌রাতে | গান্ গায়্ | চর্‌কার্ | শোন্ ভাই"

কিম্বা

"ভোম্‌রাতে | গান্ করে | চরকারি | শোন ভাই"

লিখিলে ছন্দের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইংরাজীতে ছন্দ মাত্রাগত না হইয়া গুণগত বলিয়া ছাঁচ-টাই আসল। এই জন্য সমজাতীয় foot বা গণের পরস্পরের বদলে ব্যবহার হইতে পারে, iambusর স্থলে anapaest এবং trocheeর স্থলে dactyl বেশ চলে। বাংলায় যাঁহারা ইংরাজী ছন্দের অনুকরণ করার প্রয়াস করিয়াছেন তাঁহারা সেই চেষ্টা করিলে অবিলম্বে ছন্দোভঙ্গ হইবে। বিখ্যাত ইংরাজ কবি Shelleyর The Cloud কবিতাটি ছন্দোমাধুর্য্যের জন্য সুবিদিত। ইহার প্রথম চারিটি চরণে যে ভাবে accented ও unaccented অক্ষরের বিন্যাস ও ছন্দোবিভাগ হইয়াছে, কেহ বাংলায় তদনুরূপ করিতে গেলে ছন্দোভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।

I bring | fresh showers | for the thirst | ing flowers,
From the seas | and the streams ;
I bear | light shade | for the leaves | when laid
In their noon- | day dreams.

আধুনিক বাংলার সুকবিদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষরূপে কৃতবিদ্য ও ইংরাজী কাব্যের রসগ্রাহী ছিলেন। তাঁহারা কখন ইংরাজী ছন্দেই বাংলা কবিতা লেখা যায় এরূপ মত প্রকাশ করেন নাই, বা সেরূপ চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে যিনি বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রগাঢ় ইংরাজী পণ্ডিত ও ইংরাজী ভাবাপন্ন ছিলেন, তিনি-ও অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদন দত্ত-ও এ চেষ্টা করেন নাই। এমন কি, বাংলা কবিতায় যেখানে ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেখানেও ইংরাজী শব্দ জাতি হারাইয়া বাংলা ছন্দের রীতির অনুসরণ করিয়াছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার

সাত্ত্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝেই ধরল মাংস রকম্বারি
ফাউল বীফ্ আর মটন্ হ্যাম্ ইন্ অ্যাডিশন্ টু বক্‌রি।

এই চরণদ্বয়ের দ্বিতীয়টি প্রায় ইংরাজী শব্দেই রচিত। "আর" বদলাইয়া যদি "and" লেখা যায়, তাহা হইলে সমস্তটাই একটা ইংরাজী ছন্দের লাইন মনে করা যায়। (বক্‌রি অবশ্য হিন্দুস্থানী শব্দ) বাংলায় এই চরণটির ছন্দোলিপি হইবে—

ফাউল্ বীফ্ অ্যাণ্ড | মটন্ হ্যাম্ | ইন্ অ্যাডিশান্ | টু বক্‌রি

= ফাউল্ বীফ্যাণ্ড | মটন্ হ্যাম্ | ইন্যাডিশান্ | টু বক্‌রি

= (৪ + ৪ + ৪ + ৩)

ইংরাজীতে ইহার ছন্দোলিপি হইত অন্যরূপ—

Fowl beef | and mutt | on ham | in ad-di- | tion to Bok | ri

এই দুইটি ছন্দোলিপি পরস্পরের সহিত তুলনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে ইংরাজী ও বাংলার ছন্দপদ্ধতি পরস্পর হইতে বিভিন্ন। Miltonর

Of man's first dis-o-be-dience, and the fruit
-1 -1-1-1 -1-1 -: -: -1 -1-1 -1 -1 -: -1-1

Of that forbidden tree, whose mortal taste
-1 -1-1 -1 -1 -1-1- -1-1 1 -1 -1 -1-1 -1-1 *

প্রভৃতি চরণে মাত্রা ও ধ্বনিগৌরবের বিচিত্র জটিলতায় যে ছন্দের জাল গড়িয়া উঠিয়াছে, বাংলায় তাহার অনুকরণ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

অক্ষরের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য ইংরাজী ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়, তাহা বাস্তবিক বাংলা ছন্দে পাওয়া যায় না। স্বরাঘাতের ব্যবহার হইলে অবশ্য স্বরাঘাতযুক্ত অক্ষর একটি বিশিষ্ট ধ্বনিগৌরব লাভ করে, কিন্তু স্বরাঘাতের ব্যবহার বাংলা ছন্দে যদৃচ্ছাক্রমে করা যায় না, এ সম্বন্ধে কি কি অসুবিধা তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একমাত্রিক লঘু অক্ষরের সন্নিকটে গুরু অক্ষর বসাইলেও অবশ্য একটা গুণগত পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, এবং এইজন্য গুরু অক্ষরের বহুল ব্যবহারের দ্বারাই বাংলায় কবিরা ছন্দের গাম্ভীর্য্য বাড়াইবার চেষ্টা বরাবর করিয়া আসিয়াছেন। "তরঙ্গিত মহাসিন্ধু | মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো" অথবা, "কিম্বা বিম্বাধরা রমা | অম্বুরাশি তলে" প্রভৃতি চরণে ইহার উপলব্ধি হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই পার্থক্য ইংরাজী accented ও unaccentedর পার্থক্যের অনুরূপ নহে, এবং ইহাকেই ছন্দের ভিত্তি করা যায় না। আসলে, পর্ব্বে পর্ব্বে মাত্রাসমকত্বই বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়, অন্য যাহা কিছু গুণ তাহা ছন্দের কচিৎদৃষ্ট বা আকস্মিক অলঙ্কার বা গৌণ লক্ষণ মাত্র।

* এই দুইটি পংক্তির মাত্রালিপি Fox Strangways র নির্দ্দেশ অনুসারে প্রচলিত আকার-মাত্রিক স্বরলিপির চিহ্ন দ্বারা করা হইয়াছে।

বাংলায় সংস্কৃত-ছন্দ

বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার পথে অনেকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, বাংলায় যথার্থ দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার কচিৎ দেখা যায়। আমাদের সাধারণ উচ্চারণের পদ্ধতিতে স্বভাবতঃ সমস্ত স্বরই হ্রস্ব। তবে অবশ্য বাংলায় হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া অনেক সময় ধরা হইয়া থাকে, এবং ইচ্ছামত যে কোন হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ করা যায়। কিন্তু ধ্বনিগুণের দিক্ হইতে বাংলার হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর আর সংস্কৃতের দীর্ঘ অক্ষর এক নহে। বাংলায় শব্দান্তের হলন্ত অক্ষর স্বভাবতঃ দীর্ঘ। কারণ, বাংলায় পর পর শব্দগুলিকে বিযুক্ত রাখাই রীতি, ছন্দেও সংস্কৃত পদ ছাড়া অন্যত্র সন্ধির ব্যবহার সাধারণতঃ হয় না। সুতরাং শব্দান্তের হল্‌বর্ণকে পরবর্ত্তী বর্ণ হইতে বিযুক্ত রাখার জন্য শব্দের শেষে একটু ফাঁক রাখা হয়, সেইজন্য মোটের উপর শব্দান্তের হলন্ত অক্ষর দুই মাত্রার বলিয়া পরিগণিত হয়। যেখানে শব্দের মধ্যে কোন হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া ধরা হয়, সেখানেও এইরূপ ঘটে। শব্দের মধ্যস্থ যুক্তবর্ণকে বিশ্লেষণ করিয়া এবং তাহার ধ্বনিকে টানিয়া হলন্ত অক্ষরকে দুইমাত্রা ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে সন্ধি আবশ্যিক, সেখানে এরূপ বিশ্লেষণ ও ফাঁক বসানো চলে না, সেখানে যথার্থ দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ করিয়াই দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলায় মাত্রাসমকছন্দের নিয়মিত রীতিতে কতকগুলি পর্ব্বের সহযোগে এক একটি চরণ গঠন করিতে হইবে, এবং প্রতি পর্ব্বে সুনির্দ্দিষ্ট রীতিতে পর্ব্বাঙ্গের সমাবেশ করিতে হইবে। দুই একটি বিশেষ স্থল ছাড়া প্রতি পর্ব্বে ও প্রতি পর্ব্বাঙ্গে একটি বা ততোধিক গোটা শব্দ থাকা আবশ্যক। সংস্কৃতে এক একটি চরণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের কোন এক প্রকার বিশিষ্ট ও বিচিত্র সমাবেশ মাত্র; তাহার উপাদান হ্রস্ব বা দীর্ঘ হিসাবে বিশিষ্টলক্ষণান্বিত কতিপয় অক্ষর। এই দীর্ঘ বা হ্রস্ব অক্ষরের পারম্পর্য্য-জনিত এক প্রকার ধ্বনিহিল্লোল-ই সংস্কৃত ছন্দের প্রাণ। যেখানে সংস্কৃত ছন্দের এক একটি চরণের উপকরণ কয়েকটি গণ, সেখানে প্রত্যেকটি গণ কয়েকটি হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের এক প্রকার সমাবেশ মাত্র, শব্দের গঠনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

সংস্কৃতে এমন কতকগুলি ছন্দ আছে যাহার চরণগুলিকে অনায়াসেই সমমাত্রিক কয়েকটি অংশে বিভাগ করা যায়। এইরূপ প্রত্যেক চরণাংশের মাত্রাপারম্পর্য্যের অনুযায়ী মাত্রা রাখিয়া এক একটি শব্দ বা শব্দসমষ্টি প্রয়োগ করিতে পারিলে, বাংলার পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ রীতিও বজায় থাকে এবং ঐ সংস্কৃত ছন্দের পারম্পর্য্যও থাকে। উদাহরণস্বরূপ তোটক ছন্দের কথা বলা যাইতে পারে। তোটকের সঙ্কেত

⏑ ⏑ — ⏑ ⏑ — ⏑ ⏑ — ⏑ ⏑ —

ইহাকে সহজেই চার মাত্রার এক একটি অংশে ভাগ করা যায় :

⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ —

যেমন,

রণনি | জিতদ্বি | জয়দৈ | ত্যপুরং

এখন ইহার অনুকরণে কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

একি) ভাণ্ডারে | লুট করে | ধন কোটা | নো
একি) চাষ দিয়ে | রাশ করে | ফুল ফোটা | নো

এখানে তোটকের মাত্রা-পারম্পর্য্য একরূপ বজায় আছে, যদিও চরণের শেষের অক্ষরটির দীর্ঘ উচ্চারণ একটু কৃত্রিম। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এখানে ছন্দের ভিত্তি চার মাত্রার এক একটি পর্ব্ব, এবং এই মাত্রাসমত্বের জন্যই ছন্দ বজায় আছে। যেখানে হলন্ত অক্ষর দিয়া সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের অনুকরণ করা হইয়াছে সেখানে দুইটি হ্রস্ব অক্ষর দিলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না ; দ্বিতীয় চরণটিকে—

একি) রাশি করে | চাষ দিয়ে | ফুল ফোটা | নো

এইরূপ লিখিলে অবশ্য সংস্কৃত তোটকের রীতির লঙ্ঘন হইত, কিন্তু বাংলা ছন্দের দিক্ হইতে কিছুই ব্যতিক্রম হইয়াছে মনে হইত না। ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে আসলে বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতি ও রীতি বিভিন্ন ; অক্ষর সংখ্যা বা মাত্রার পারম্পর্য্য বাংলা ছন্দের মূল কথা নয়, মূল কথা—এক একটি পর্ব্ব বা পর্ব্বাঙ্গে মোট মাত্রার সংখ্যা। সংস্কৃত কোন ছন্দের পারম্পর্য্যের সহিত

বাংলা ছন্দের কোন একটি চরণের সাদৃশ্য একটা গৌণ ও আকস্মিক লক্ষণ মাত্র। সংস্কৃতজ্ঞ না হইলে কোন ছন্দোরসিকের নিকট এই সাদৃশ্য লক্ষ্যীভূত হয় না। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে সংস্কৃতের দীর্ঘ স্বরগুলি যে ভাবে কাণে লাগে ও যেরূপ ছন্দোবোধ উৎপাদন করে, বাংলার হলন্ত দীর্ঘ অক্ষরগুলি সেরূপ করে না।

এইরূপ তূণক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, পঞ্চচামর, স্রগ্বিণী, সারঙ্গ, মালতী, মদিরা প্রভৃতি যে সমস্ত ছন্দ কোন এক প্রকারের কয়েকটি গণের সংযোগে গঠিত বাংলা ছন্দে তাহাদের এক প্রকারের অনুকরণ করা যাইতে পারে, যদিও ঠিক সংস্কৃতের অনুরূপ ধ্বনিগুণ ও ছন্দহিল্লোল বাংলা ছন্দে আনা খুব দুরূহ। কারণ, যথার্থ দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ বাংলা ছন্দে মাত্র কচিৎ দেখা যায় (সূঃ ১৬ক দ্রষ্টব্য)। বাংলা হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর ঠিক সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের অনুরূপ নহে।

সংস্কৃতে আরও কতকগুলি ছন্দ আছে, সেগুলি ঠিক এক প্রকারের কতকগুলি গণ লইয়া গঠিত না হইলেও সে গুলিকে বাংলার পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ পদ্ধতির সহিত একরূপ খাপ খাওয়ানো যাইতে পারে। যেমন, "মনোহংস" ছন্দের সঙ্কেত

⏑ ⏑ — ⏑ — ⏑ ⏑ — ⏑ — ⏑ ⏑ — ⏑ —

এখানে চরণের মোট মাত্রা সংখ্যা ২১। ইহাকে

⏑⏑— ⁝ ⏑ — ⏑ । ⏑ — ⏑ ⁝ — ⏑ ⏑ । — ⏑ —

এইরূপে ভাগ করিলে ৮ মাত্রার দুইটি পূর্ণ পর্ব্ব এবং ৫ মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব্ব পাওয়া যায়। সুতরাং তূণক বা তোটকের ন্যায় এই ছন্দকেও বাংলায় এক রকম অনুকরণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু এমন অনেক ছন্দ সংস্কৃতে আছে যাহাদের বাংলা পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ পদ্ধতির কাঠামের মধ্যে কিছুতেই ফেলা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ সুপরিচিত 'ইন্দ্রবজ্রা' ছন্দের নাম করা যাইতে পারে।

সংস্কৃত ছন্দ যাঁহারা বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জোর করিয়া বাংলায় সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এমন কি ভারতচন্দ্রও এই দোষ হইতে মুক্ত নহেন। তাঁহার

"ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে"

এই চরণটিতে তিনি তূণক ছন্দের অনুকরণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু

তূণকের রীতিতে এই চরণটি পাঠ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কাহারও হয় না। আসলে এই চরণটি ও তাহার পরবর্ত্তী চরণগুলি ৮+৭ এই সঙ্কেতে বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক রীতিতে রচিত বলিয়াই সকলে পাঠ করিবে। ভারতচন্দ্রের

'ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণী ফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে।"

প্রভৃতি চরণে সংস্কৃত ভুজঙ্গপ্রয়াতের অনুকরণ-ও ঐরূপ ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র হইয়াছে।

আধুনিক কালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অনেক কবি হলন্ত অক্ষরমাত্রকেই দীর্ঘ ধরিয়া লইয়া বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের আমদানি করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আবশ্যক মত হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ করা বাংলায় সম্ভব হইলেও, এই দীর্ঘীকরণ পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গের আবশ্যকতা অনুসারেই হইয়া থাকে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ নয়। সুতরাং সর্ব্বত্র এইরূপ যথেচ্ছ দীর্ঘীকরণ চলে না, চালাইতে গেলে যাহাতে বাংলা ছন্দের পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের মুখ্যতা ও অখণ্ডনীয়তা অব্যাহত থাকে সেদিকে অবহিত থাকিতে হইবে। নহিলে, বাংলা ছন্দের হিসাবে ছন্দপতন ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ, বাংলার হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর যে সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের প্রতিনিধি-স্থানীয় নয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, বাংলায় পর্ব্ব-ও-পর্ব্বাঙ্গ পদ্ধতির জন্য যে ভাবে ছেদ ও যতি রাখিতে হয় তাহাতে সংস্কৃত ছন্দের প্রবাহ অব্যাহত থাকিতে পারে না। যত সুকৌশলেই অক্ষরের মাত্রা নিরূপিত হউক্ না কেন, বাংলায় ছন্দোবন্ধ হইলেই পর্ব্ব, পর্ব্বের মাত্রাসমকত্ব, পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গের বিন্যাস, পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের মাত্রা ও তাহার অনুপাত, ইহাই ছন্দোবোধের ভিত্তি ও মুখ্য বিচার্য্য হইয়া দাঁড়ায়, দীর্ঘ বা হ্রস্বের পারম্পর্য্য অত্যন্ত গৌণ, উপেক্ষণীয় ও যদৃচ্ছাক্রমে পরিবর্ত্তনীয় লক্ষণ মাত্র হইয়া পড়ে।

উদাহরণ স্বরূপ সুকবি সত্যেন্দ্রনাথের একটি প্রচেষ্টার বিচার করা যাক্। সংস্কৃত মালিনী ছন্দের অনুকরণে তিনি লিখিয়াছেন—

উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল্, শূন্যময় স্বর্ণপিঞ্জর,
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন, যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

যদি বাংলা ছন্দের হিসাবে ইহা ছন্দোদুষ্ট না হয়, তবে বলিতে হইবে যে এই

দুইটি চরণ ৬+৪ এই সঙ্কেতে ছয় মাত্রার পর্ব্ব লইয়া গঠিত হইয়াছে। বাংলা ছন্দে ইহার ছন্দোলিপি হইবে

উড়ে চলে গেছে | বুল্ বুল্
শূন্য ময় স্বর্ণ | পিঞ্জর
ফুরায়ে এসেছে | ফাল্গুন্
যৌবনের জীর্ণ | নির্ভর।

যদি ইহাকে সংস্কৃত মালিনী ছন্দের রীতিতে

উ ড়ে চ লে গেছে বুল্‌বুল্ শূ ন্য ময় স্ব র্ণ পিঞ্জর
ফু রা য়ে এ সে ছে ফাল্‌গুন যৌবনের জী র্ণ নি র্ভর

এই ভাবে পাঠ করা যায় তবে বাংলা ছন্দের যাহা ভিত্তিস্থানীয়—পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ—তাহাদেরই মুখ্যতা ও রীতি বজায় থাকে না। চার মাত্রা, পাঁচ মাত্রা বা ছয় মাত্রা—কোন দৈর্ঘ্যের পর্ব্বকেই ইহার ভিত্তি করা যায় না, কোন নিয়মিত প্রথাতে এখানে যতি স্থাপনা করা যায় না, সুতরাং বাংলা ছন্দোবন্ধের পরিধির মধ্যে ইহার স্থান হয় না। পাঠ করিলেই সমস্তটা অস্বাভাবিক, কৃত্রিম, ছন্দোদুষ্ট বলিয়া মনে হয়। ইহার সহিত মালিনী ছন্দের রচিত কোন সংস্কৃত শ্লোক মিলাইয়া দেখিলেই সংস্কৃত মালিনী ছন্দ ও তাহার বাংলা অনুকরণের মধ্যে ধাতুগত পার্থক্যের উপলব্ধি হইবে। 'রঘুবংশে'র

শ শি ন মু প গ তে য়ং কৌমুদী মে ঘ মু ক্তং
জ ল নি ধি ম নু রূ পং জ হ্নু ক ন্যা ব তী র্ণা

প্রভৃতি চরণের ধ্বনি-বৈচিত্র ও ছন্দের প্রবাহ যে কোন বাংলা অনুকরণে থাকিতে পারে না তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়।

বাংলায় যথার্থ দীর্ঘস্বর স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ সম্ভব তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। (সূঃ ১৬ক দ্রষ্টব্য) এই উপলক্ষে হেমচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ পদ্ধতির রীতি বজায় রাখিয়াই তদ্রূপ করা সম্ভব। এইরূপ দীর্ঘস্বরের

ব্যবহার করিতে পারিলে যথার্থ সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ ধ্বনিহিল্লোল পাওয়া যায়। গুরু অক্ষরের ব্যবহারের জন্যও এক প্রকার ধ্বনিবৈচিত্র্য পাওয়া যায়, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যে কোন সংস্কৃত ছন্দের যদৃচ্ছা অনুকরণ বাংলায় সম্ভব নয়।